রশীদ বুক হাউস
৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৩৪৯৩৩১১

ISBN : 984-8604-10-

হাদীস চর্চায় ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহ) এর অবদান

রশীদ বুক হাউস

হাদীস চর্চায়

ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহ)

এর অবদান

মোহাম্মদ আবুল কাসেম ভূঁঞা

হাদীস চর্চায়

ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ) এর অবদান

মোহাম্মদ আবুল কাসেম ভূঁঞা

রশীদ বুক হাউজ
৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

হাদীস চর্চায়
ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ) এর অবদান
মোহাম্মদ আবুল কাসেম ভূঁঞা

প্রকাশক ঃ রশীদ বুক হাউজ
৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০১০ ঈসায়ী
ফাল্গুন ১৪১৬ বাংলা
রবিউল আউয়াল ১৪৩১ হিজরী

বিনিময় ঃ ৯০ টাকা মাত্র।

উৎসর্গ

মুসলিম বিশ্বের
অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিমে দীন
মুফাসসির মুহাদ্দিস
ইতিহাসবিদ সুসাহিত্যিক শিক্ষাবিদ
সীরাতবিদ ও দা'য়ী ইলাল্লাহ
দ্বিতীয় তাহাভী দ্বিতীয় ফারাবী
অলীয়ে কামিল
চৌদ্দশো হিজরী শতকের মুজাদ্দিদ
ফকিহ্-সম্রাট
আল্লামা মুফতি সাইয়েদ মুহাম্মদ
আমিমুল ইহসান মুজাদ্দেদী বরকতী
আল-হানাফী (১৩২৯-১৩৯৪ হি)
রাহমাতুল্লাহে তায়ালা আলাইহি
এর
পুণ্যময় সত্তার পবিত্র স্মরণে।

এই অমর মনীষীর ফিকাহ বিষয়ক কালজয়ী গ্রন্থাবলী

১. কাওয়াইদুল ফিকাহ।
২. ফিকহুস সুনান ওয়াল আছার।
৩. তারীখে ইলমে ফিকাহ।
৪. ফাতাওয়ায়ে বরকতিয়া (২৮ খন্ড)।
৫. মা'লাবুদ্দা লিল ফকিহ।
৬. উসূলুল মাসায়িলুল খিলাফিয়া।
৭. আল-আফছাহ আন নুরুল ইযাহ।
৮. আত-তাম্বিহ লিল ফকিহ।
৯. তাখরিজ মাসায়েলুল মাজাল্লা।
১০. আল-আওযাহ।
১১. এযহারে হক (ফাতাওয়া সংকলন)।
১২. লুব্বুল উসূল।
১৩. আদাবুল মুফতি।
১৪. কিতাবুল মাওকাত।
১৫. তরীকায়ে হজ্ব।
১৬. হাদিয়াতুল মুছাল্লীন।
১৭. মাশকে ফারাইয।
১৮. আরকানে আরবাআ (তিন খন্ড)।
১৯. উসুলুল ইমাম আল-কারখী।
২০. আত-তা'রিফাতুল ফিকহিয়া।
২১. আল-মাসয়ালাতু লি রাফউল গালগালা।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

ভূমিকা

ইমাম আ'যম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যে সময়ে মুসলিম জীবনের সব বিষয়ে ইমামতের দায়িত্ব নিয়ে আবির্ভূত হলেন তখন ইসলামী বিশ্বের অবস্থা ছিল খুবই নাজুক। সাহাবায়ে কিরাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সোনালী যুগের অবসানে দেখা দেয় নানাবিধ ফিতনা-ফাসাদ। বিভিন্ন ফিরকার অনুসারীরা কোরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত শিক্ষা বিবর্জিত নিজ নিজ মতাদর্শ প্রচার করতে থাকে। ফলে মুসলিম উম্মাহর জীবনে নেমে আসে আকিদাগত দুর্দিন। বাতিল মতবাদ ও ভ্রান্ত আকিদায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে মুসলিম উম্মাহ। মুসলমানদের এহেন দুর্দিনে মহামতি ইমাম আবু হানিফা (রাহ) কালজয়ী মহাপুরুষ হিসাবে এগিয়ে আসেন। তিনি পবিত্র কোরআন-হাদীসের আলোকে মুসলিম আকিদা-বিশ্বাস দুরস্ত করার জন্য বেশ কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন। এতে বাতিল আকিদাগুলো নির্মূল হয়ে ইসলামের মূল আকিদা ও ধর্মীয় আচরণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যবস্থা এখনো বলবৎ রয়েছে।

মুসলমানদের ব্যবহারিক জীবনে অর্থাৎ লেনদেন, মোয়ামিলাত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বিচারিক ব্যবস্থাপনা ইসলামের সঠিক পথে পরিচালনার জন্য ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ) পবিত্র কোরআন ও হাদীসের বিস্তারিত অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রের বুনিয়াদ রচনা করেন। এভাবে মুসলিম জীবনে কোরআন ও হাদীসের বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত হয়।

কালাম শাস্ত্র আর ফিকাহ শাস্ত্রেই নয় তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসের বহুল প্রচারের জন্য অসংখ্য প্রবীণ উস্তাদ থেকে মারফু, মুরসাল, মাওকুফ, মাকতু এমন কি বহুভাবে বহুজন কর্তৃক বর্ণিত দুর্বল হাদীসও সংগ্রহ করেন (এরূপ হাদীস আর দুর্বল থাকে না)। এমন সব হাদীস লিখিতভাবে এবং অগণিত ছাত্রদের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে প্রচার করেন। তাঁর চার হাজার উস্তাদ ও চার হাজার শাগরিদ ছিল বলে জীবনী গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এসব মহান উস্তাদ থেকে অসংখ্য হাদীস তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। তাই তো তিনি হলেন ইমামুল মুহাদ্দিসীন এবং শাহানশাহে হাদীস।

ইসলাম ধর্মের ফিকাহ শাস্ত্রের জনক ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহ) আল-কুফী ছিলেন মুজতাহিদ ইমামদের শিরোমণি, তিনি ছিলেন তাবেয়ী (আর কোন মাযহাবী ইমাম তাবেয়ী ছিলেন না)। তিনি বিশ্ববরেণ্য ফিকাহবিদ, ইমামুল হাদীস, হাফিযে হাদীস ও কোরআন এবং যুগের শ্রেষ্ঠতম আলিমে দীন ও অলীয়ে কামিল ছিলেন। সে যুগের প্রচলিত সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল। তিনি জ্ঞানের প্রতিটি বিষয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন করে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। আল্লাহর দেয়া সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা ও প্রখর স্মৃতিশক্তির কারণে সমসাময়িক ইসলামী জ্ঞানীজনের ওপর তাঁর প্রাধান্য ছিল ঈর্ষার বিষয়। তাঁর দূরদর্শিতা, সূক্ষ্মবুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও সর্বজয়ী প্রতিভা তাঁর অনুরাগী ও বিরাগী সকলকে মুগ্ধ করেছিল।

তাছাড়া তিনি ছিলেন এক ভাগ্যবান ও সফল ব্যবসায়ী ও দানশীল ব্যক্তিত্ব এবং একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী তর্কবাগিশ। মানুষের দুঃখে তিনি ছিলেন চরম সহানুভূতিশীল। মানুষের প্রতিটি সমস্যা ও অসুবিধা দূর করার জন্য বিশ্বপতি যেন তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন। অসংখ্য মানুষের সমস্যার তিনি তাৎক্ষণিক সমাধান দিয়েছেন। তাদের অনাগত কালের সমস্যাও অন্তর্দৃষ্টিতে দেখে এর সমাধান রেখে যান। তাই মানুষ তাঁর প্রতি হয়েছে সহযোগিতা-পরায়ণ। তাঁর মাযহাব এজন্য সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে।

ফিকাহ ও হাদীসে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য ইমাম আ'যম অপরিসীম শ্রম স্বীকার করেছেন। তিনি যুগের বড় বড় উস্তাদ ফিকাহবিদ ও হাদীসবিদদের দ্বারস্থ হয়েছেন এবং বহু জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ তাবেয়ীর সান্নিধ্য লাভ করেছেন ও তাঁদের থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন। হাদীসের অপরিসীম ও অপূর্ব চর্চা তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে স্থান দিয়েছিল। তিনি লক্ষ লক্ষ মাসয়ালা বের করেছিলেন অসংখ্য হাদীস ও কোরআনের আয়াত বিচার-বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করেই। ফিকাহর প্রতিটি বিষয় এবং কিয়াসের সব বিষয় তিনি হাদীসের আলোকেই নির্ধারণ করেছিলেন। তাই তাঁর দীনী সিদ্ধান্ত অর্থাৎ মাসয়ালাসমূহ ও রায়সমূহ হাদীসেরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছিল। পবিত্র হাদীসের এরূপ প্রয়োগ আর কোন ইমাম করতে পারেন নি বলে তিনি হলেন ইমামুল মুহাদ্দিসীন, হাদীসবিদদের ইমাম বা নেতা।

নিঃসন্দেহে সাইয়েদোনা ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ) পৃথিবীর বুকে আল্লাহতায়ালার কুদরতের এক মহানিদর্শন এবং সর্বশেষ নবী (ছা)-এর বরকতময় এলেমসমূহের অদ্বিতীয় আমানতদার ছিলেন। যেসব মহামনীষী ন্যায়-নিষ্ঠা এবং দীন ও আমানতদারী অবলম্বন করেছেন, তাঁরা এই ধ্রুব সত্যটিকে স্বীকার করেছেন অবলীলাক্রমে। তৎকালীন ইমামগণ এই মহিমান্বিত ইমাম আ'যমের উচ্চ মর্যাদা ও বুর্যগীর সামনে নতশীর হয়েছেন এবং তাঁর সম্পর্কে শীর্ষ সম্মানের বাণী উচ্চারণ করেছেন।

ইমাম যাহাবী (রাহ) ও তাঁর সমমনা ইতিহাসবিদেরা ইমাম আযমের আলোচনা "আবু হানিফা ইমাম আ'যম" শিরোনাম দিয়ে শুরু করেছেন। তাঁরা তাঁকে আলিমে বা আমল, আবেদ, যাহেদ ও উঁচু স্তরের জ্ঞানের বাহক সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে মুবারক (রাহ) তাঁকে 'আফকাহুন্নাস', 'ইমামুল মুহাদ্দিসীন' ও 'জ্ঞানের শহরের সৌন্দর্য' মনে করতেন। ইমাম শাফেয়ী (রাহ) আলিমদেরকে দীনের এলেমে ইমাম আবু হানিফার সন্তান সাব্যস্ত করতেন। মুহাদ্দিস ইয়াযিদ ইবনে হারুন (রাহ)-এর দৃষ্টিতে তাঁর চেয়ে বেশি আল্লাহ-ভীরু মুত্তাকী সে যুগে অন্য কেউ ছিলেন না। ইমাম আবু দাউদ (রাহ) তাঁকে (হাদীসের) ইমাম বলেছেন। ইমাম শা'রানী (রাহ)-এর দৃষ্টিতে হানাফী ফিকাহর মাঝে নিয়ম মত তল্লাসীর পরও তাঁর কোন মন্তব্য কোরআন ও হাদীসের বিরোধী পাওয়া যায় নি। ইবরাহীম ইবনে মুয়াবিয়া (রাহ) তাঁর প্রতি মহব্বতকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের দলভুক্ত হওয়ার নিদর্শন সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে হাজার মক্কী (রাহ) ও ইমাম সুউতি (রাহ) তাঁকে রাসূলুল্লাহ (ছা)-এর এক মহাসুসংবাদের উদ্দেশ্য মনে করতেন। ইমাম ওকী (রাহ) তাঁর বর্ণনাসমূহকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মন্তব্য করেছেন এবং তা ভরসাযোগ্য মনে করে সে সবের ভিত্তিতে ফাতাওয়া দিয়েছেন। ইমাম মালিক (রাহ) তাঁর পরহিযগারী ও জ্ঞান-গভীরতার

প্রশংসা করেছেন। ইমাম আহমদ (রাহ) তাঁর পরহিযগারী ও তাকওয়া নিয়ে গর্ব করতেন। এরূপ অসংখ্য মন্তব্য জ্ঞানীজনের তরফ থেকে তাঁর প্রতি বর্ষিত হয়েছে।

এই মহাত্মা ইমাম আ'যম সারাজীবন কোরআন ও হাদীসের প্রচার ও সেবা করে গিয়েছেন কয়েকটি পদ্ধতিতে। এর মধ্যে উল্লেখ্য হলো (ক) মুসলমানদের ঈমান আকিদার রক্ষার জন্য এবং বাতিল আকিদা মুকাবিলা করার জন্য কোরআন-হাদীসের সাহায্যে নিপুণ কালাম শাস্ত্র নির্মাণ করেছেন, এর কোন তুলনা নেই। তাঁর অনুসারীরা এ শাস্ত্র আরও উন্নত করেছেন। (খ) কোরআন-হাদীসের আলোকে মুসলমানের ব্যবহারিক জীবন সুবিন্যস্ত করার জন্য ফিকাহ শাস্ত্র নির্মাণ করেছেন। তাঁর অনুসারীরা এই শাস্ত্রকে এক কালজয়ী কাঠামো দান করেছেন। তাবকাতু আহনাফ-ভুক্ত গ্রন্থে হাজার হাজার প্রখ্যাত ফিকাহবিদের জীবনী হতে এই শাস্ত্রের সৌন্দর্য, স্থায়ীত্ব ও কার্যকারিতা সম্পর্কে জানা যায়। (গ) ছাত্র ও শাগরিদদের মাধ্যমে কালাম শাস্ত্র, ফিকাহ শাস্ত্র ও হাদীসের বিস্তার ঘটিয়েছেন। তাঁর ছাত্ররা 'কিতাবুল আছার' ও 'মুসনাদে আবু হানিফা' অপূর্ব দরদ দিয়ে সাজিয়েছেন। এগুলো এখন বিশ্বব্যাপী নানারূপে সমাদৃত হচ্ছে, পঠিত হচ্ছে। আর অসংখ্য 'মানাকিব' জাতীয় গ্রন্থ নির্মিত হয়েছে। সেখানে ইমাম আযমের অনেক বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। এতেও অসংখ্য হাদীস প্রচারিত হয়েছে।

আসলে ইমামুল মুহাদ্দিসীন উস্তাযুল আসাতিযা সাইয়েদোনা ইমাম আযম আবু হানিফা তাবেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যেমন স্বীয় যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকিহ, মুনাযির, মুতাকাল্লিম, মুফতি, কাযী, রাত জাগরণকারী আবেদ, কবর-মুখী, দুনিয়াবিমুখ, অশ্রুপাতকারী ও বিষন্ন-চিন্তিত ছিলেন তেমনি বিজ্ঞ সূফী সাধক ছিলেন। একই সময়ে এলেম ও ফযল, যুহদ ও পরহিযগারী, তাকওয়া ও পবিত্রতা, এবাদতের আধিক্য, অনুসরণীয় উত্তম চরিত্র ও অভ্যাস, তীক্ষ্ণ মেধা ও বিচক্ষণতা এবং সব বিষয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের উচ্চমার্গতা, যোগ্যতা ও সীমাহীন কর্মদক্ষতাকে দেখে কে এমন ব্যক্তি না আছে যে, তাঁর হিংসা ও শত্রুতাকে যথার্থ মনে করবে না। এজন্যই তাঁর সময় থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে এবং তাঁর মাযহাবের বিরুদ্ধে ঈর্ষা, হিংসা, গীবত ও মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে আসছে। এসবের কিছুটা হলেও জবাব গ্রন্থে দিতে আমি চেষ্টা করেছি। আল্লাহ সহায় স্মরণীয় যে, এসব মিথ্যাচারকারী ও গীবতকারী হিংসুকরা মহান দরবারে একদিন জবাবদিহিতার সম্মুখীন হবেই। আরও একটি বিষয় হলো, মাযহাব-বিরোধিতা একটি বড় ধরনের অপরাধ। কারণ এর মাধ্যমে মুসলমানদের ঈমানহীন ও বিপথগামী করার উদ্দেশ্যই প্রবল থাকে। বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানই মাযহাব-পন্থী এবং হাদীসের ঈমামগণ মাযহাব পন্থীই ছিলেন।

খাদিমুল ইবাদ
মোহাম্মদ আবুল কাসেম ভুঁঞা
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

৩ রা ভাদ্র ১৪১৬।
(১৮-০৮-২০০৯)

দিশা

১। ভূমিকা .... ৪ পৃষ্ঠা।

প্রথম অধ্যায়

২। মহাত্মা ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম............৮ পৃষ্ঠা
২.১। ইমাম আ'যমের বংশ তালিকা ও তাঁর আওলাদ................ ১৫ "
২.২। তাঁর রচিত ও সংকলিত গ্রন্থাবলী .... ১৬ "
২.৩। তাঁর সম্পর্কে রচিত গ্রন্থাবলী .... ২১ "

দ্বিতীয় অধ্যায়

৩। হাদীস বর্ণনায় ইমাম আ'যমের অপূর্ব অবদান .... ২৫ "
৩.১। ইমাম আ'যমের হাদীসের এলেম অর্জন .... ২৮ "
৩.২। ফিকাহ শাস্ত্রের বিন্যাসে হাদীসের প্রয়োগ .... ৩৭ "
৩.৩। অসংখ্য ছাত্রের মাধ্যমে হাদীসের প্রচার-প্রসার .... ৪৯ "
৩.৪। গ্রন্থের মাধ্যমে হাদীসের প্রচার-প্রসার .... ৬৫ "
৩.৫। কিতাবুল আছার, ইমাম আ'যমের অমর কীর্তি .... ৭০ "

তৃতীয় অধ্যায়

৪। ঈমাম আ'যম সম্পর্কে বিশ্ব-মনীষী ও ফিকাহ-হাদীসবিদদের অভিমত .... ৭৫ "

চতুর্থ অধ্যায়

৫। ইমাম আ'যমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও অপবাদ আরোপ .... ৮৭ "
৫.১। প্রতিবাদ ও অপবাদের কারণসমূহ ও এসবের ইনসাফ-ভিত্তিক জবাব... ৯৩ "
৬। ইমাম আ'যম (রাহ)-এর আল-ফিকহুল আকবার, মূল বক্তব্য .... ১০৩ "
৭। তথ্য সূত্র .... ১০৯ "
৮। লেখকের গ্রন্থাবলীর তালিকা .... ১১১ "

প্রথম অধ্যায়

মহাত্মা হযরত ইমাম আবু হানিফা (রাহ)

(এক নযরে সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম)

ইমাম আবু হানিফা আল নো'মান ইবনে সাবিত ইবনে যাওতী হিজরী ৮০ বা ৭০০ খ্রিষ্টাব্দে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা যাওতী ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। তিনি ছিলেন অগ্নি উপাসক। ৩৬ হিজরীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং স্ত্রীকে নিয়ে হিজরত করে মক্কার পথে দেশ ত্যাগ করেন। কুফায় পৌঁছে তিনি হযরত আলী রাযিআল্লাহু আনহুর সান্নিধ্য লাভ করেন এবং এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি কাপড়ের ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করেন। ৪০ হিজরীতে যাওতীর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তিনি তাঁর নাম রাখেন সাবিত। বরকতের জন্য তাঁকে হযরত আলী (রা)-এর কাছে নিয়ে এলে তিনি শিশুর মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করে দেন। শিশু ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। কিন্তু বেশি দিন যেতে না যেতেই তাঁর পিতা মারা যান। মায়ের স্নেহে লালিত-পালিত সাবিত পিতার প্রাচুর্য সুখেই দিনাতিপাত করতে থাকেন। তার ৪০ বছর বয়সে ৮০ হিজরীতে তার ঘরে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। জনক-জননী আদর করে নাম রাখেন নো'মান। ইনিই বিশ্ব-বিখ্যাত ইমাম আবু হানীফা। তাঁর জন্ম ৭০ হিজরীতে হয়েছিল বলেও অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়।

এ সময় উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান মুসলিম জাহানের শাসনকর্তা ছিলেন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইরাকের গভর্ণর ছিলেন। তখন পৃথিবীতে অনেক সাহাবী জীবিত ছিলেন। তাঁদের উল্লেখযোগ্য কয়েক জন হলেন,

১। আবদুল্লাহ ইবনে আল-হারিস (রা) ইবনে আলজুয, মৃত্যু-৯৯ হিজরী। ৯৬ হিজরীতে পিতার সাথে প্রথম হজ্ব করতে গিয়ে ইমাম আবু হানিফা কা'বার চত্তরে এই সাহাবীর হাদীসের দরসে শামিল হন এবং তাঁর থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন।
২। আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রা), মৃত্যু-৯৭ হিজরী। তাঁর নিকট থেকে ইমাম আ'যম 'মসজিদ তৈরি' বিষয়ক হাদীসটি সংগ্রহ করেন। ইমাম সুউতি (রাহ) এটাকে মোতাওয়াতির হাদীসরূপে অভিহিত করেন। মোল্লা আলী কারী (রাহ) এই হাদীসের পঞ্চাশটি সনদ সংগ্রহ করে বলেছেন যে, ইমাম আ'যমের সনদটি সর্বোত্তম।
৩। সাহল ইবনে সা'দ আস-সায়েদী (রা), মৃত্যু-৯১ হিজরী।
৪। হাসান ইবনে সা'দ আস-সায়েদী (রা), মৃত্যু-৯৮ হিজরী।
৫। মাহমুদ ইবনে লবীদ আল-আশহালী (রা), মৃত্যু- ৯৬ হিজরী।
৬। আবদুল্লাহ ইবনে ইউছর আল-মাযানী (রা), মৃত্যু-৯৬ হিজরী।
৭। মাহমুদ ইবনে আর-রাবী আনসারী (রা), মৃত্যু-৯৯ হিজরী।
৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা), মৃত্যু-৯৩ হিজরী।
৯। আল-হারমাম ইবনে যিয়াদ আল-বাহেলী (রা), মৃত্যু-১০২ হিজরী।

১০। আবুত তোফায়েল আমির ইবনে ওয়াসিলা আল-কিনানী (রা), মৃত্যু-১১০ হিজরী।
১১। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়দী (রা), মৃত্যু-৯৯ হিজরী।
১২। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা), মৃত্যু-৯৫ হিজরী।
১৩। আ'ছেম ইবনে আদী আবু বাদ্দাহ (রা), মৃত্যু-১০৭ হিজরী।
১৪। আনাস ইবনে মালিক (রা), মৃত্যু-৯৩ (মতান্তরে ৯৯) হিজরী।
১৫। আবদুল্লাহ ইবনে সা'লাবা (রা)।
১৬। আমর ইবনে হুরায়েস (রা)।
১৭। আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা)।
১৮। মা'কেল ইবনে ইয়াসার (রা)।
১৯। আয়েশা বিনতে আজরাদ (রা)।
২০। আবদুল্লাহ ইবনে বিশর (রা)।
২১। ওয়াসিলা ইবনে আসকা (রা)।
২২। আবু উমামা আল-বাহেলী (রা)।

ইমাম আবু হানিফা (রাহ) এঁদের অনেকের সাক্ষাত লাভ করেন এবং কয়েক জনের নিকট থেকে হাদীসের দরস হাসিল করেন। তাই তিনি ছিলেন তাবেয়ী।

ইমাম আবু হানিফা শৈশবে নিজ গৃহে শিক্ষা লাভ করেন। তারপর কুফার মসজিদে আরবী ব্যাকরণ, কবিতা, সাহিত্য, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি শিখেন। তিনি কালাম শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং অন্যদের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হতেন। এ সময় খারেজিয়া, শিয়া, মুরজিয়া, কাদারিয়া, জাবারিয়া, মু'তাযিলা প্রভৃতি ফিরকার আবির্ভাব ঘটেছিল। রাজনৈতিক দিক দিয়ে উমাইয়া শাসনের অবসান ও আব্বাসীয় শাসনের সূচনা হয়। এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে তিনি আবির্ভূত হন। তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সমকালীন সমস্যা সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল হন। ১৬ বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। পিতা ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তাঁর মৃত্যুর পর ব্যবসার দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়েছিল যুবক আবু হানিফাকে। তাঁর অসামান্য দক্ষতা ও নিষ্ঠায় ব্যবসায়ের পাশাপাশি তিনি কাপড় তৈরির এক কারখানা স্থাপন করেন, যা কিছু দিনের মধ্যেই অনন্য হয়ে উঠে। এ সময়ে ৮৬ হিজরীতে খলিফা আবদুল মালিক মারা যান এবং অলীদ ইবনে আবদুল মালিক খলিফা হন। ৯৫ হিজরীতে হাজ্জাজ মারা যান এবং ৯৬ হিজরীতে অলীদও মারা যান। তারপর সোলায়মান ইবনে আবদুল মালিক খলিফা হন। তিনি ৯৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন এবং ওমর ইবনে আবদুল আযীয (মৃ.১০১ হি.) খলিফা হন। তিনি উমাইয়া বংশের মারওয়ানী নীতি পাল্টে দেন। ইনসাফ ও ন্যায় বিচার কায়েম করেন। খুতবায় হযরত আলী (রা) সম্পর্কে যেসব অশোভন উক্তি উদ্ধৃত করা হতো তা আইন করে বন্ধ করে দেন। উমাইয়া খান্দানের লোকেরা বিলাস-বহুল জীবন যাপনের জন্য যে সব সরকারী জায়গীর দখল করেছিল তা তিনি বাজেয়াপ্ত করেন। অসাধু ও অত্যাচারী কর্মকর্তাদের অপসারণ করে সৎ ও যোগ্য লোকদের নিয়োগ প্রদান করেন। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সার্বিক গুরুত্ব আরোপ করেন এবং হাদীস সমূহ সংগ্রহ ও সংকলনের নির্দেশ দেন।

এ যাবৎ ইমাম আবু হানিফা (রাহ) ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। ওমর ইবনে আবদুল আযীযের যামানায় তাঁর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ এলো। একদিন কার্য উপলক্ষে কুফার প্রসিদ্ধ আলিম কাযী শা'বীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, কোথায় যাও? অমুক সওদাগরের কাছে, তিনি বললেন। তখন কাযী সাহেব বললেন, আমি জানতে চেয়েছিলাম, তুমি কার কাছে পড়তে যাচ্ছো। তিনি বললেন, আমিতো কারো কাছে পড়ি না। কাযী শা'বী বললেন, বাছা আমি তোমার মধ্যে অসামান্য যোগ্যতা ও অসাধারণ প্রতিভা লক্ষ্য করছি। তুমি জ্ঞান আহরণ করা শুরু করো। শা'বীর কথায় বালক নো'মানের হৃদয় দারুণভাবে প্রভাবিত হলো। মা'র কাছে এসে সব কথা তিনি বললেন। তাঁর মা ছিলেন একজন বিদ্যোৎসাহী বিদূষী মহিলা। বিদ্যার্জনে পুত্রের আগ্রহ তাকে পুলকিত করলো। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে পুত্রকে নির্দেশ দিলেন, ভালো উস্তাদ তালাশ করে এলেম হাসিল করতে। আগেই তিনি প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তাই এলমে হাদীস ও এলমে ফিকাহর উচ্চতর শিক্ষার জন্য কুফার শ্রেষ্ঠ আলিম ইমাম হাম্মাদ (রাহ)-এর কাছে যান। দু'বছর এখানে তিনি ফিকাহ্ অধ্যয়ন করেন। এ সময় তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও মেধা তাঁকে উস্তাদের আস্থাভাজন করে দেয়।

দু'মাসের জন্য ইমাম হাম্মাদ (রাহ) বসরায় যান। এ সময় তিনি প্রিয় ছাত্র আবু হানিফাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। তিনি দক্ষতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। নিয়মিত শিক্ষাদান ছাড়াও তিনি অগণিত আগন্তুকের নানা ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। এমন সব প্রশ্নের উত্তর তাঁকে দিতে হতো, যা তিনি কখনো তাঁর উস্তাদের কাছে শুনেন নি। ইজতিহাদ করে উত্তর দিতেন। এ ধরনের ৬০টি মাসয়ালার উত্তর তিনি একটি নোটে লেখে রেখেছিলেন। উস্তাদ ফিরে এলে তিনি তা তাঁর সামনে পেশ করেন। হাম্মাদ (রাহ) ৪০ টির উত্তর ঠিক ও ২০ টির জবাব ভুল হয়েছে বলে জানান। এরপর তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি উস্তাদ হাম্মাদ (রাহ)-এর দরবারে ছাত্র হিসাবে কাটান। তাঁর মৃত্যুর পর এখানেই তিনি শিক্ষাদানে নিয়োজিত হন।

ফিকাহ অধ্যয়নের পর তিনি হাদীস শিক্ষার জন্য তদানীন্তন হাদীসবিদদের খিদমতে হাযির হন এবং শিক্ষা লাভ করেন। তখনো কোন প্রণিধানযোগ্য হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয় নি। কোন একজন মুহাদ্দিস সকল হাদীসের হাফিয ছিলেন না। সুতরাং তাঁকে অনেক উস্তাদের কাছে যেতে হয়। প্রথমে তিনি কুফায় অবস্থানরত মুহাদ্দিসদের থেকে হাদীস শিখেন। এদের মধ্যে ছিলেন ১.ইমাম শা'বী (রাহ), যিনি ৫ শতাধিক সাহাবাকে দেখেছিলেন। দীর্ঘ দিন তিনি কুফার কাযী ছিলেন। ১০৪ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। ২. সালামা ইবনে কুহাইল; ৩. মুহাজির ইবনে ওয়াছার; ৪. আবু ইসহাক সাবিয়ী; ৫. আওন ইবনে আবদুল্লাহ; ৬. সিমাক ইবনে হারব; ৭. ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ; ৮. আদী ইবনে সাবিত; ৯. মূসা ইবনে আবু আয়েশা (রাহ)। এঁদের থেকে শিক্ষা গ্রহণের পর ইমাম আবু হানিফা (রাহ) বসরায় যান। সেখানে তিনি প্রথমে হযরত কাতাদা (রাহ)-এর খিদমতে হাযির হন এবং হাদীসের দরস হাসিল করেন। হযরত কাতাদা (রাহ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছা)-এর খাদিম হযরত আনাস (রা)-এর শাগরিদ। হযরত কাতাদা (রাহ) হাদীস বর্ণনায় শব্দ ও অর্থের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করতেন। তারপর ইমাম আবু হানিফা (রাহ) হযরত

শো'বা (রাহ)-এর দরসে যোগ দেন। তাঁকে হাদীস শাস্ত্রে 'আমীরুল মু'মিনীন' বলা হতো। তিনি ইমাম আবু হানিফা (রাহ) সম্পর্কে বলেন, আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, আবু হানিফা ও এলেম দুই বস্তু নয়। বসরায় তিনি এ দু'জন ছাড়া আবু উমাইয়া আবদুল করিম (রাহ) ও আ'ছেম ইবনে সোলায়মান (রাহ)-এর কাছেও হাদীস অধ্যয়ন করেন।

কূফা ও বসরার পর তিনি হারামাইন শরীফাইনের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। প্রথমে তিনি মক্কায় গেলেন। সেখানে তিনি হাদীসবিদ হযরত 'আতা ইবনে আবু রিবাহ্ (রাহ)-এর দরবারে যান এবং শাগরিদির দরখাস্ত পেশ করেন। তিনি নাম ও আকিদা জানতে চান। ইমাম আবু হানিফা (রাহ) বলেন, 'নাম নো'মান, পিতা সাবিত, পূর্বপুরুষদের মন্দ বলি না। গুনাহ্গারকে কাফির মনে করি না। কাযা ও কাদরে বিশ্বাস করি'। জবাব শুনে হযরত আতা (রাহ) তাঁকে দরসে শামিল হতে অনুমতি দিলেন। ১১৪ হিজরীতে হযরত 'আতা (রাহ) ইন্তেকাল করেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি যখনই মক্কায় আসতেন তাঁর খিদমতে হাযির হতেন। এখানে তিনি হযরত ইকরামা (রাহ)-এর কাছ থেকেও হাদীসের সনদ লাভ করেন।

মক্কা থেকে তিনি মদীনায় যান। সেখানে প্রথমে হযরত ইমাম বাকির (রাহ)-এর খিদমতে উপস্থিত হন। ইমাম বাকির (রাহ) নাম শুনেই বলে উঠেন, তুমি কি ওই আবু হানিফা, যে নিজের যুক্তির ভিত্তিতে আমার দাদার হাদীসের বিরোধিতা করে? তিনি বললেন, 'আমার সম্পর্কে এ অসত্য রটান হয়েছে। অনুমতি পেলে কিছু বলতে চাই'। তিনি বললেন, 'বলো'।

আবু হানিফা (রাহ) বললেন, 'পুরুষের তুলনায় নারী দুর্বল। যদি যুক্তির ভিত্তিতে আমি সিদ্ধান্ত দিতাম তাহলে বলতাম যে, উত্তরাধিকারের ব্যাপারে নারীকে অধিক দিতে হবে। কিন্তু আমি তা বলি না। বলি পুরুষ দ্বিগুণ পাবে। অনুরূপভাবে, রোযা অপেক্ষা নামায উত্তম। যুক্তির ভিত্তিতে কথা বললে বলতাম, ঋতুবতী মেয়েলোকের নামাযের কাযা জরুরী। কিন্তু তা বলি না, বরং বলি তার ওপর রোযার কাযা জরুরী'।

ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর এ বক্তব্য শুনে হযরত ইমাম বাকির (রাহ) অভিভূত হলেন এবং উঠে এসে কপালে চুমু দিয়ে দোয়া করলেন ও যতদিন ইচ্ছা তাঁর কাছে থাকতে অনুমতি দিলেন। ১১৪ হিজরীতে তাঁর ইন্তেকাল হয়। তাঁর পুত্র হযরত ইমাম জা'ফর সাদেক তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। আহলে বাইত সম্পর্কে ইমাম আযম বলতেন যে, হাদীস ও ফিকাহ তথা যাবতীয় এলেম আহলে বাইতের বিদ্যালয় থেকে নিঃসৃত। যখনই তিনি মক্কা ও মদীনায় যেতেন, তখন সেখানে আগত মুসলিম জাহানের বিশিষ্ট পন্ডিতবর্গের সাহচর্য লাভ করে তিনি তাঁর জ্ঞান আহরণের অতৃপ্ত আকাঙখা মিটাতে সচেষ্ট হতেন। কথিত আছে, তিনি ৫৫ বার মক্কা ও মদীনাতে হজ্ব -ওমরা ও যিয়ারত উপলক্ষে আগমন করেন।

১২০ হিজরীতে হযরত হাম্মাদ (রাহ) ইন্তেকাল করেন। কুফাবাসী হযরত আবু হানিফা (রাহ)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। তিনি আব্বাসী শাসক মনসুর কর্তৃক ১৪৬ হিজরীতে কারারুদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন। মুসলিম জাহানের সর্বত্র তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। অসংখ্য শিক্ষার্থী তাঁর দরসে শামিল হতে থাকে।

১৪৫ হিজরীতে যায়েদিয়া ইমাম ইব্‌রাহীম ইবনে মুহাম্মদ আব্বাসিয়া খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসরা অবরোধ করেন। মনসুর এ বিদ্রোহ দমন করে বাগদাদ এসে ১৪৬ হিজরীতে ইমাম সাহেবকে তাঁর কাছে ডেকে পাঠান। তাঁর ধারণা জন্মেছিল যে, ইমাম সাহেব যায়েদিয়াদের পক্ষ অবলম্বনকারী। হত্যা করা হবে এ মতলবেই তাঁকে ডেকে আনা হয়। কিন্তু ইমাম রাভীর পরামর্শে আপাতত সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখে তাঁকে কাযীর দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরোধ করা হয়। বারবার অস্বীকার করার পরও মনসুর যখন তার নির্দেশ প্রত্যাহার করলো না, তখন তিনি তা মেনে নিয়ে বিচারকের আসনে বসেন। বিবাদীর কাছে পাওনার দাবিতে একজন বাদী তাঁর কাছে মামলা দায়ের করে। তিনি বিবাদীকে প্রমাণ উপস্থিত না করতে পারায় কছম করতে বলেন। যখন সে মাত্র ' আল্লাহর কছম' উচ্চারণ করলো, তখন ইমাম সাহেব তাকে থামিয়ে দিয়ে বাদীকে তার পাওনা নিজ পকেট থেকে দিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'নাও তোমার প্রাপ্য, কখনো কোন মুসলিমকে কছম করতে বাধ্য করো না'। এ ঘটনায় তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন এবং সরাসরি মনসুরের কাছে গিয়ে বললেন, না, আমি এ কাজ করতে পারবো না। এতে মনসুর খুব ক্রুদ্ধ হলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁকে জেলে পাঠালেন।

কারাগারে কিছু দিন নীরবে অতিবাহিত করার পর তিনি মনসুরকে বললেন, 'আমাকে এখানে দরস চালু করার অনুমতি দিন'। তাঁকে অনুমতি দেয়া হলো। তিনি এখানে পাঁচ বছর পুরাদস্তুর দরস দেন। বন্দীশালায় তাঁর সুখ্যাতি আরও বেড়ে যায়। ইমাম মুহাম্মদ শায়বানী (রাহ) এখানেই ইমাম সাহেবের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। ১৫০ হিজরী বা ৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কারাগারে ইন্তেকাল করেন। কারাগারে আবদ্ধ করার পরও তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় মনসুর ভীত-শঙ্কিত হয়ে বিষ প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করে। ১৫ রজব ১৫০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। বাগদাদের কাযী হাসান ইবনে আম্মারাহ্ (রাহ) তাঁর গোসল দেন ও কাফন পরান। যোহরের পর তাঁর প্রথম নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। অগণিত লোক এতে শরীক হয়। আরও ছয় বার জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয় এবং আসরের নামাযের পর তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী 'খায়যরান' কবর স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। দাফনের পর ২০ দিন পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত মানুষ তাঁর কবরে জানাযার নামায আদায় করেন। ৪৫৯ হিজরীতে সালজুকী সুলতান আলপ আরসালান তাঁর কবরে একটি কুব্বা নির্মাণ করেন এবং এর নিকট একটি মাদ্‌রাসা ও একটি মুসাফিরখানাও তৈরি করেন। আজও বাগদাদে তাঁর মাযার এলাকা ইমামিয়া, আ'যমিয়া ও নো'মানিয়া নামে খ্যাত।

তিনি ছিলেন আপোষহীন ব্যক্তিত্ব। নীতির জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কুফার উমাইয়া গভর্নর ইয়াযিদ ইবনে আমর ইবনে হোবায়রা এবং পরে আব্বাসী খলিফা মনসুর তাঁকে প্রধান কাযীর পদ দান করলে তিনি তা দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। এ কারণে তাঁকে দৈহিক শাস্তি ও কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় এবং অবশেষে বিষপানে প্রাণ ত্যাগ করতে হয়। তিনি নির্যাতন ভোগ করেছেন, কারাগারে জীবন কাটিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত মযলুম অবস্থায় দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়েছেন, তবুও তিনি নীতির প্রশ্নে আপোষ করেন নি। যালিম ও স্বৈরাচারী শক্তির কাছে নতি স্বীকার করেন নি।

ইমাম আবু হানিফা (রাহ) উস্তাদের নামানুসারে তাঁর একমাত্র পুত্রের নাম রাখেন হাম্মাদ। তিনি প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন। পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হাম্মাদ কখনো কোন সরকারী চাকরী করেন নি। শিক্ষাদান করতেন এবং নিজের ব্যবসার আয় দিয়ে জীবন যাপন করতেন। ১৭৬ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং কুফায় তাঁকে দাফন করা হয়।

খলিফা হারুন অর রশীদ একবার ইমাম আবু ইউসুফকে (রাহ) ইমাম আবু হানিফা (রাহ) সম্পর্কে কিছু বলতে বললে তিনি বলেন, ইমাম আবু হানিফা (রাহ) ছিলেন একজন মহান চরিত্রের অধিকারী সম্মানিত ব্যক্তি। শিক্ষাদানের সময় ছাড়া প্রায় সবসময়ই তিনি নিশ্চুপ থাকতেন। তাঁকে দেখলে মনে হতো যেন কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন আছেন। কোন প্রশ্ন করলে উত্তর দিতেন। নইলে চুপ থাকতেন। দানশীল ও হৃদয়বান ইমাম কখনো কারো কাছে কোন কিছু চাইতেন না। দুনিয়াদারদের থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতেন এবং পার্থিব যশ ও গৌরব তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। কখনো কারো নিন্দা করতেন না, আলোচনা এলে শুধু ভালই বলতেন। খুব বড় আলিম ছিলেন। সম্পদের ন্যায় জ্ঞান বিতরণে ছিলেন উদার।

ইমাম আ'যম প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর দীর্ঘক্ষণ তিলাওয়াতে কোরআন ও নির্ধারিত ওযিফা আদায় করতেন। তারপর আগন্তুকদের প্রশ্নের জবাব দিতেন। যোহরের নামাযের পর ঘরে যেতেন। দুপুরের আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেন। আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত লোকদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করতেন ও ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়াদি তদারক করতেন। মাগরিবের পর থেকে এশা পর্যন্ত দরস দিতেন। এশার পর প্রায়ই মসজিদে থাকতেন এবং ফজর পর্যন্ত তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য ওযিফা আদায় করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ। কারো দুঃখ-বেদনায় তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। সাধ্যানুযায়ী মানুষের সাহায্য করতেন। বেশি বেশি কোরআন তিলাওয়াত করতেন। তিলাওয়াতের সময় তাঁর চোখ থাকতো অশ্রুসিক্ত। নামাযে কিংবা নামাযের বাইরে যখনই আযাবের অথবা ধমকের কোন আয়াত তিলাওয়াত করা হতো তখন তাঁর ওপর এমন প্রভাব করতো যে, তিনি কাঁপতে থাকতেন ও চোখ দিয়ে অশ্রু বিগলিত হতো।

আল্লাহ প্রদত্ত মেধা, স্মরণ শক্তি, জ্ঞান আহরণ ক্ষমতা, উত্তম আমল ও আখলাকের পরিপূর্ণতার সাথে অত্যন্ত আবেদ, যাহেদ এবং কোমল হৃদয়ের অধিকারী ইমাম আ'যম (রাহ) তাকওয়া ও যুহদ, আল্লাহর প্রতি চরম আনুগত্যে ও পরিণামদর্শিতায় বিশেষত্ব লাভ করেছিলেন। তিনি মেযাজের ভারসাম্য রক্ষাকারী অকুতোভয় ও সত্যবাদী ছিলেন। তিনি যিকির ও এবাদতে সর্বদা প্রাণবন্ত থাকতেন এবং অত্যন্ত সরল সহজ জীবন যাপন করতেন।

উস্তাদ হাম্মাদ (রাহ) জীবিত থাকাকালীন অবস্থায় ইমাম আ'যম ইজতিহাদের স্তরে উপনীত হলেও তিনি কার্যত তা করেন নি। ১২০ হিজরীতে তাঁর ইন্তেকালের পর তিনি উস্তাদের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে উপলব্ধি করলেন যে, মুসলিম মিল্লাতের জন্য শরীয়তের বিধি-বিধানের একটি সংকলন থাকা আবশ্যক। তখন পর্যন্ত লিখিত আকারে প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণীত হয় নি। তিনি স্থির করলেন যে, কোরআন ও হাদীস থেকে মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের মাসয়ালাসমূহ বের করে

একত্রিত করবেন। যাতে প্রয়োজনের সময় সহজে সমস্যার সমাধানের নির্দেশ লাভ করা যায়। এ কাজ খুব সহজসাধ্য ছিল না। তিনি এ কাজ সম্পন্ন করার দৃঢ় সঙ্কল্প করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মুসলিম মিল্লাতের এ দায়িত্ব পালনের যোগ্য করে প্রস্তুত করেছিলেন।

রিসালাতের যামানা ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যামানা থেকেই ফিকাহ ইসলামীর প্রচলন হয়। কোরআন ও হাদীস থেকে সাহাবায়ে কিরাম ফিকাহর প্রশ্নের উত্তর দিতেন। সাহাবাদের মধ্যে এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিলেন হযরত আলী (রা), হযরত ওসমান (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)। এঁদের মধ্যে হযরত আলী (রা) ছিলেন মাসয়ালা উদ্ভাবনের দিক দিয়ে অগ্রণী। হযরত ওমর (রা) বলেন, "আল্লাহ্ যেন এমন না করেন যে, কোন কঠিন মাসয়ালা আমাদের সামনে আসবে আর আলী (রা) তখন আমাদের মধ্যে থাকবেন না।" হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "কোন মাসয়ালায় আমি হযরত আলী (রা)-এর ফাতাওয়া পেলে অন্য কিছুর প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।"

ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর সময়কাল পর্যন্ত সাহাবায়ে কিরাম ও অন্যান্য ফিকাহবিদদের মাধ্যমে কোরআন ও হাদীস থেকে অনেক মাসয়ালা সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু তা ছিল অবিন্যস্ত ও অলিখিত। ইমাম আবূ হানিফা (রাহ) চাইলেন সালফে সালিহীনের পথ ধরে পূর্ণাঙ্গ ফিকাহ বিন্যস্ত করতে। তিনি এজন্য তাঁর শাগরিদদের মধ্য থেকে কয়েকজন বিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি পরিষদ গঠন করলেন। যাঁদের তিনি এ দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলেন কাযী আবু ইউসুফ (রাহ), দাউদ তায়ী (রাহ), মুহাম্মদ শায়বানী (রাহ) ও যুফার (রাহ)। এঁরা ১২১ হিজরী থেকে কাজ আরম্ভ করেন এবং ১৫০ হিজরীতে ইমাম আযমের মৃত্যু পর্যন্ত তা চালু রাখেন। এ সময়ের মধ্যে ফিকাহর মাসয়ালার এক সুবৃহৎ সংকলন তৈরি হয়ে যায়, যাতে তাহারাতের অধ্যায় থেকে মিরাছের অধ্যায় পর্যন্ত শামিল করা হয়। এতে এবাদতের মাসয়ালা ছাড়াও দিওয়ানী, ফৌজদারী দণ্ডবিধি, লাগান, মালগুযারী, শাহাদাত, চুক্তি, উত্তরাধিকার, অছিয়ত ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় সংক্রান্ত আইন-কানুন সন্নিবেশিত হয়। খলিফা হারুন-অর-রশীদের বিশাল সাম্রাজের সর্বত্র বিচার-আচার এর অনুকরণে করা হতো। তাঁর পরবর্তীকালেও এ পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। হানাফী ফিকাহ, কোরআন-হাদীসের আলোকে মানুষের মনস্তাত্বিক ও ব্যবহারিক প্রয়োজনের নিরিখে প্রণীত বিধায় তা কালজয়ী হয়েছে। তাঁর এই কাজের মাধ্যমে তিনি উম্মতে মুহাম্মদীকে চিরঋণী করে গিয়েছেন। বর্তমানে বিশ্বের মুসলিম জনগোষ্ঠির অর্ধেকের বেশি ফিকাহ হানাফী অনুসরণ করেন। বিশেষ করে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, আফগানিস্তান, চীন, মধ্য এশিয়া, তুরস্ক, ইরাক ও সিরিয়ায় ফিকাহ হানাফী জনপ্রিয়। ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ)-এর কর্ম-জীবনের উল্লেখযোগ্য অবদানের মধ্যে ফিকাহ শাস্ত্রের সংকলন ও বিন্যাস অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। মুসলিম মিল্লাত চিরদিন তাঁর এ অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে।

ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর উস্তাদের মধ্যে কয়েক জন রাসূলুল্লাহ্ (ছা)-এর সাহাবা এবং ৯৩ জন তাবেয়ী ছিলেন। চরিতকারদের মতে তাঁর উস্তাদের সংখ্যা ছিল চার

হাজারেরও অধিক। তাঁর ছাত্রদের সংখ্যাও চার হাজার ছিল। তিনি সে সময়কার যাবতীয় জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। এমন কোন ক্ষেত্র ছিল না, যেখানে তিনি স্বচ্ছন্দে পদচারণা করতে পারতেন না। প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল সর্বোচ্চে। বাগদাদকে মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানীর উপযোগী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান চিরদিন ভাস্বর হয়ে থাকবে। জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের ক্ষেত্রে তিনি যে নযির স্থাপন করে গেছেন, তা রীতিমত বিস্ময়কর। ব্যবহারিক জীবনের জন্য ফিকাহর মাসয়ালা সংগ্রহ-সংকলন করে একদিকে যেমন তিনি মুসলিম মিল্লাতের একটি অভাব পূরণ করেন, ঠিক তেমনি এলমে কালামের ভিত রচনা করে আর একটি প্রয়োজন মিটান। ফিকাহর ক্ষেত্রে তাঁর পদ্ধতি হানাফী মাযহাব এবং কালামের ক্ষেত্রে মাতুরীদিয়া মাযহাব হিসাবে খ্যাত।

ইমাম আ'যম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির বংশ তালিকা নিম্নরূপ

১। হযরত আদম ছাফিউল্লাহ্ আলাইহিস সালাম।
২। হযরত শীশ আলাইহিস সালাম। তাঁর প্রপৌত্রের পৌত্র
৩। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম।
৪। ইয়াফাস, ৫। সাবু সিয়া, সাক্কা, ৬। হরমুয শাহ, ৭। তৈমুর শাহ, ৮। জমশিদ শাহ, ৯। ফরিদুন ফারাদ, ১০। ফারাশিদ, ১১। বাশরাজ, ১২। মনুচ্ছর, ১৩। তাহালিব, ১৪। মালিক-রু, ১৫। মালিক, ১৬। কায়কাবালিদ, ১৭। আদাসাব শাহ, ১৮। রাহেস্তাব, ১৯। ইস্ফান্দিয়ার, ২০। রো ইবনে ইস্ফান্দিয়ার, ২১। বাহমানা, ২২। নাদারাবে, ২৩। আকবর শাহ, ২৪। আওসাত শাহ, ২৫। আসফার শাহ, ২৬। বাবক শাহ, ২৭। উরদুসের, ২৮। শহরশাহ, ২৯। মালিক শাহপুর, ৩০। মালিক হুরমুয, ৩১। মালিক তরসে, ৩২। মালিক হুরমুয সানি, ৩৩। মালিক আসকার, ৩৪। মালিক শাদের, ৩৫। রাওয়াল ইকইয়ান, ৩৬। মালিক বাহরাম, ৩৭। মালিক শাহপুর সানি, ৩৮। মালিক ইয়াযদাজার রুস্তম, ৩৯। মালিক ফিরোয, ৪০। মালিক নওশেরাওয়ান আদেল, ৪১। কেরান, ৪২। হযদেজান, ৪৩। শাহরিয়ার, ৪৪। হুরযবান, ৪৫। হুরমুয, ৪৬। মালিক হুরমুয, ৪৭। মালিক শাহরাম, ৪৮। বাহরাম, ৪৯। মারযাবান (যাওতী বা মাহ্ নামে খ্যাত), ৫০। সাবিত, ৫১। নো'মান (আবু হানিফা)।

ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ) ছিলেন আদেল রাজবংশীয় লোক। তিনি মাঝারী ধরনের হালকা-পাতলা, গৌরবর্ণের দীর্ঘদেহী ও সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যধিক মিষ্টভাষী, দানশীল, সুগন্ধি বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। খুবই সুন্দর ও উত্তম আকৃতির অধিকারী হয়ে তিনি উত্তম ও দামী কাপড় ও জুতা ব্যবহার করতেন। তিনি মানুষের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন (একমাল ফি আসমায়ির রিজাল)।

ইমাম আ'যমের বংশধরগণের পুরোপুরি বিবরণ জানা যায় না। তবে এতোটুকু সঠিকভাবে জানা যায় যে, তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর একমাত্র পুত্র হাম্মাদ ব্যতীত আর কেউ ছিলেন না। হাম্মাদ উচ্চশ্রেণীর ফাযিল ছিলেন। শৈশবে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা অতি যত্নের সাথেই সম্পন্ন হয়েছিল। যখন তিনি সূরা ফাতিহা পড়া শেষ করেন, তখন তাঁর দানশীল

বুযর্গ পিতা উস্তাদকে পাঁচশো দি রহাম নযর দিয়েছিলেন। বড় হওয়ার সাথে সাথে ইমাম আ'যম তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। বিদ্যাবত্তা ও বিচক্ষণতার সাথে সাথে তিনি স্বাবলম্বন ও পরহিযগারীতে পিতার পদাংক অনুসরণ করতেন। হাম্মাদ জীবনে কোন চাকরী গ্রহণ করেন নি। শাহী দরবারের সাথেও তিনি কোনরূপ সংস্রব রাখতেন না। তিনি ১৭৬ হিজরীতে ঝিলকদ মাসে ইন্তেকাল করেন। তিনি চার জন ছেলে সন্তান রেখে যান। এঁরা হলেন ওমর, ইসমাঈল, আবু হায়ান এবং ওসমান। ইসমাঈল (মৃ ২১২ হি) বিদ্যাবত্তায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। খলিফা হারুন-অর-রশীদ তাঁকে রিকার কাযীর পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তিনি এই পদের দায়িত্ব অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে পালন করেন। ভারতীয় উপমহাদেশের বহু স্থানে ইমামে আ'যমের বংশধারা এখনো বর্তমান রয়েছে। তাঁদের মারফত আল্লাহতায়ালার দয়ার বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞান চর্চার ধারা পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। তাছাড়া ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর মানস সন্তানরা তো সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছেন।

ইমাম আ'যমের রচিত ও সংকলিত গ্রন্থাবলী

ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর প্রতি আরোপিত গ্রন্থের সংখ্যা ২০টির অধিক। এর অধিকাংশই পৃথিবীর বিভিন্ন মিউজিয়ামে ও গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত। কয়েকটি মুদ্রিত হয়েছে। কয়েকটির একাধিক শরাহ রচিত হয়েছে। গ্রন্থগুলোর বেশির ভাগই ফিকাহ ও আকাইদ সংক্রান্ত। এসব গ্রন্থের মূল হলো কোরআন ও হাদীস। এগুলোর নাম ও অবস্থান এরূপ,

১. আল-ফিক্হুল আকবার
২. আল-ফিক্হুল আবসাত
৩. কিতাব আল আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম
৪. আল-অছায়া
৫. আর-রিসালা
৬. মুসনাদে আবু হানিফা (হাদীসের বিষয়ে নির্মিত এই কিতাবটি নিয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা হবে)।
৭. অছায়া ইলা ইবনিহি হাম্মাদ
৮. অছায়া ইলা তিলমিযিহি ইউসুফ ইবনে খালিদ
৯. অছায়া ইলা তিলমিযিহি আল-কাযী আবি ইউসুফ
১০. রিসালা ইলা ওসমান আল-বাত্তি
১১. আল-কাসিদা আল-কাফিয়া (আন-নো'মানিয়া)
১২. মুজাদালা লি আহাদিদ দাহরীন
১৩. মা'রিফাতুল মাযাহিব
১৪. আয-যাওয়াবিত আস-সালাসা
১৫. রিসালা ফিল ফারাইয
১৬. দু'আউ আবি হানিফা
১৭. মুখাতাবাতু আবি হানিফা মা'আ জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ

১৮. বা'আয ফাতাওয়া আবি হানিফা
১৯. কিতাবুল মাকসুদ ফিস্ সারফ
২০. কিতাবু মাখারিজ ফিল হিয়াল
২১. কিতাবু আর-রাদ্দু আলাল কাদারিয়া।
২২. আল-ইলমু শারকান ওয়া গারকান ওয়া বাদান ওয়া কারবান।
২৩. কিতাবুল মুজাররাদ।
২৪. কিতাবুর রেহান।

১। আল-ফিক্হুল আক্বার

এ গ্রন্থটির কয়েকটি রিওয়ায়েত রয়েছে। এর মধ্যে দু'টি প্রসিদ্ধ। ১. হাম্মাদ ইবনে আবি হানিফা (রাহ) এবং ২. আবু মুতি আল-হাকাম বলখী। শেষোক্তটি আল-ফিকহুল আব্সাত নামে পরিচিত। ফিক্হুল আকবারের অসংখ্য কপি পৃথিবীতে বড় বড় মিউজিয়ামে ও কুতুবখানায় পাণ্ডুলিপি আকারে আছে। তাছাড়া বিভিন্ন স্থান থেকে বহুবার এটা ছাপা হয়েছে। এর বহু তরজমা ও শরাহ আছে। ১২৮৯ হিজরীতে দিল্লী থেকে এর উর্দু তরজমা এবং ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে লাহোর থেকে এর পাঞ্জাবী তরজমা প্রকাশিত হয়। জার্মান পন্ডিত ভন এস. জে. হেল ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে এর অনুবাদ জার্মান ভাষায় প্রকাশ করেন। এর ১৭টির অধিক শরাহ ও অসংখ্য পাদটীকা সম্বলিত কপি প্রকাশিত হয়েছে। যথা,

১. আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-বযদাবী (মৃ. ৪৮২হি)। এর গ্রন্থটি লর্ড স্টেনলী কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত হয়ে ১৮৬২ সালে লন্ডন হতে প্রকাশিত হয়।
২. আকমালউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ ইবনে আহমদ আল-বাবারতী (মৃ.৭৮৬হি)। তাঁর গ্রন্থটি ইস্তাম্বুল ও কায়রোর প্রসিদ্ধ কুতুবখানা সমূহে পাণ্ডুলিপি হিসাবে সংরক্ষিত আছে।
৩. ইলিয়াস ইবনে ইবরাহীম আস-সিনুবী (মৃ ৮৯১ হি)। তাশখন্দ ও ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত।
৪. আবুল মুনতাহা আহমদ মুহাম্মদ আল মুগনীসুয়ী (মৃ. ৯৩৯ হি)। বার্লিন, লন্ডন, ক্যাম্ব্রিজ, দামেস্ক, কায়রো, ইস্তাম্বুল প্রভৃতি স্থানের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত।
৫. মোল্লা আলী আল-কারী আল হারাভী (মৃ.১০১৪হি)। তাশখন্দে ১৩১২ হি. কায়রোতে ১৩২৩ হি, কানপুরে ১৩২৭ হি. এবং কায়রোতে ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত। পৃথিবীর বড় বড় গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত।
৬. আলাউদ্দীন আলী আল-বোখারী। তিনি গ্রন্থটি উলুগ বেককে উৎসর্গ করেন। (তাঁর শাসনকাল ৮৫০-৮৫৩ হি)। বাঁকীপুর ও রামপুরে সংরক্ষিত।
৭. মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ খতীবজাদা (মৃ. ৯২০ হি)। ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত।
৮. মুহাম্মদ ইবনে বাহাউদ্দীন ইবনে লুৎফুল্লাহ্ আল-বায়রামী (মৃ.৯৫৬হি)। (কায়রো ও ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত)।
৯. আলী ইবনে মুরাদ আল-ওমরী আল-মোসেলী (মৃ.১১৪৭ হি)। লন্ডন ও ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত।
১০. আবুল ফাতাহ্ ওসমান আসা-শাফেয়ী। এশিয়াটিক মিউজিয়াম, বতরুমবুর্গে রক্ষিত।
১১. মুঈনুদ্দীন আবুল হাসান আতাউল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ আল-কারশাতী। কাজান হতে ১৮৯০ ঈসায়ীতে প্রকাশিত।

১২. আবদুল কাদের সালহাতী। ভারতের হায়দরাবাদ হতে ১২৯৮ হিজরীতে প্রকাশিত।
১৩. ইবরাহীম ইবনে হাসান আল-ইশকুদরাভী (মৃ. ১২৬০ হি)। ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত।
১৪. ইবরাহীম ইবনে হুসসাম আল-জারমিয়ানী (মৃ.১০১৬ হি)। ইনি কবিতায় অনুবাদ করেন। ১০৯৯ হিজরীতে মীর অহীদী তা তুর্কী ভাষায় তরজমা করেন এবং পরে তা ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত হয়।
১৫. আবু তায়্যেব হামদান ইবনে হামযা। ইস্তাম্বুল ও প্যারিসে সংরক্ষিত।

২। আল-ফিক্হুল আব্সাত

আবু মুতি আল-হাকাম ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বলখী (মৃ ১৯৯ হি) ছিলেন ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর শাগরিদ। তিনি ইমাম আ'যম থেকে রিওয়ায়েত করেছেন। কায়রো, লাইডেন ও ইস্তাম্বুলে পান্ডুলিপি সংরক্ষিত। কায়রোতে ১৩০৭ ও ১৩২৪ হিজরীতে প্রকাশিত হয়। মুহাম্মদ যাহেদ আল-কাওসারী কর্তৃক ১৩৬৯ হিজরীতে কায়রোতে পুনঃ প্রকাশিত হয়। এর কয়েকটি শরাহ রয়েছে। যেমন,
১. ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল আল-মূলতী (রাহ)-এর লিখিত শরাহ। এটি ইমাম মুহাম্মদ আবুল মনসুর আল-মাতুরীদির প্রতিও আরোপিত। ১৩২১ হিজরীতে হায়দারাবাদে প্রকাশিত হয়। বাঁকীপুর ও ইস্তাম্বুলে পান্ডুলিপি সংরক্ষিত।
২. আতা ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-মুযাজানী (রাহ)-এর লিখিত শরাহ। এটা ৬৮৭ হিজরীর পূর্বে লিখিত এবং ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত।

৩। কিতাবুল আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম

ইমাম আযমের শাগরিদ আবুল মুকাতিল হাফস ইবনে সালেম আল-সমরকান্দী (মৃ. ২০৮ হি) রিওয়ায়েত করেন। কায়রো, রামপুর, ইস্তাম্বুল, লাইডেন ইত্যাদি স্থানে সংরক্ষিত। ১৩৪১ হিজরীতে হায়দারাবাদে প্রকাশিত। আল্লামা মুহাম্মদ যাহেদ আল-কাওসারী (রাহ) ১৩৬৮ হিজরীতে কায়রোতে প্রকাশ করেন। আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে আল-ফুরাক (মৃ. ৪০৬ হি) এর শরাহ লেখেন। এটা ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত।

৪। আল-অছায়া

এ নামের কয়েকটি রচনাই ইমাম আযমের প্রতি আরোপিত। ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্বলিত তাঁর অন্তিম অছিয়ত এতে রয়েছে। দু'টি রিওয়ায়েতে এটি পাওয়া যায়। ইসকুরিয়াল, লাইডেন, লন্ডন, বার্লিন, কায়রো, ইস্তাম্বুল, রামপুর, বাঁকীপুর, কাবুল, হায়দারাবাদ ইত্যাদি স্থানে সংরক্ষিত। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে কায়রোতে প্রকাশিত। ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কী ভাষায় অনূদিত। এর চারটি শরাহ হয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ,
১. মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ আল-বাবারতী (মৃ. ৭৮৬ হি.)-এর লিখিত। গ্রন্থটি মানচেষ্টার, ইস্তাম্বুল, প্যারিস ইত্যাদি স্থানে সংরক্ষিত আছে।
২. মোল্লা হুসাইন ইবনে ইস্কান্দার আর-রুমী আল-হানাফী (মৃ. ১০৮৪ হি) 'আল জাওয়াহিরুল মুনিফা' নামে একটি শরাহ লেখেন। ১৩২১ হিজরীতে হায়দারাবাদে প্রকাশিত। ইস্তাম্বুল, কায়রো ও হায়দরাবাদে সংরক্ষিত।

৩. ইমাম আল-হুসনেয়ী 'যহুরুল আতীয়া' নামে ১০৫৬ হিজরীতে এর একটি শরাহ লেখেন। এটা ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত।
৪. ইবরাহীম ইবনে হাসান (মৃ. ১২৬০ হি)-এর লিখিত শরাহটি ১২৬০ হিজরীতে ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত হয়।

৫। আর-রিসালা

এ নামের কয়েকটি পুস্তক ইমাম আযমের প্রতি আরোপিত। যেমন,
১. রিসালা ইলা ওসমান আল-বাত্তি। এতে ইমাম আযমকে মুরজিয়া বলে অভিযুক্ত করার দোষ খন্ডন করা হয়েছে। ওসমান ইবনে-সোলায়মান ইবনে জুরমুয (মৃ.১৪৩ হি) এ অভিযোগ করলে তার জবাব দেয়া হয় এ রিসালায়। কায়রো, ইস্তাম্বুল ও লাইডেনে সংরক্ষিত। ১৩৬৮ হিজরীতে কায়রোতে আল্লামা মুহাম্মদ যাহেদ কাওসারী (মৃ.১৩৭১ হি.) কর্তৃক প্রকাশিত।
২. রিসালাতুন উখ্রা ইলা ওসমান আল-বাত্তি। ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত।
৩. রিসালা ফিল ফারাইয। এটা ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত।

৬। অছায়া ইলা ইবনিহি হাম্মাদ

ইমাম আযম স্বীয় পুত্র হাম্মাদ (রাহ)-কে এ অছিয়ত লেখেন। ওসমান ইবনে মুস্তাফা ১০৫৭ হিজরীতে 'যুবদাতুন নাসায়েহ্' নামে এর একটি শরাহ লেখেন। বৃটিশ মিউজিয়াম, ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, আল-আযহার ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ কুতুবখানায় এর পান্ডুলিপি বিদ্যমান আছে।

৭। অছায়া ইলা তিলমিযিহী ইউসুফ ইবনে খালিদ আল-বাসারী

এ পুস্তকের শরাহ রচনা করেন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ কিইয়াযারী ১২০০ হিজরীতে। বার্লিন মিউজিয়াম, ইস্তাম্বুল, দামেস্ক, মিউনিখ ও কায়রোতে এর পান্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।

৮। অছায়া ইলা তিলমিযিহি আল-কাযী আবি ইউসুফ ইবনে ইব্রাহীম

পৃথিবীর বিভিন্ন মিউজিয়াম ও কুতুবখানায় এর পান্ডুলিপি মওজুদ আছে। এতে ইমাম আযম আকাইদের অনেক গূঢ় তত্ত্ব সন্নিবেশ করেছেন। ফিক্হী ও নৈতিক নসিহত ছাড়াও এতে অনেক ব্যক্তিগত বক্তব্য রয়েছে।

৯। আল-কাসিদা আল-কাফিয়া (আন-নো'মানিয়া) ফি মাদহিন নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

১২৬৮ হিজরীতে ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত। ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ১২৭৬ হিজরীতে তুর্কী ভাষায় পদ্যে ও গদ্যে অনুবাদ করে ইস্তাম্বুলে প্রকাশ করেন। মুহাম্মদ আ'যম ইবনে মুহাম্মদ ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে 'রাহমাতুর রাহমান' নামে এর উর্দু অনুবাদ দিল্লী থেকে প্রকাশ করেন। কায়রো, ইস্তাম্বুল ও হাইডেলবার্গে এর পান্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।

১০। মুজাদালা লি আহাদিদ দাহ্রীন

ভারতের রামপুরে এবং বতরুমবার্গের মিউজিয়ামে পান্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।

১১। কিতাব মা'রিফাত আল-মাযহাব

ভারতের রামপুরে ও বতরুমবার্গের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

১২। আল- যাওয়াবিত আস-সালাসা

'আল-উসূল ইলাল কানযিল আকবার ওয়া ইলা মাহুয়া আল-আনফা মিন আল কিবরীতিল আহমার' নামক এর একটি শরাহ ইস্তাম্বুলের জারিয়াত কুতুবখানায় সংরক্ষিত আছে। এর রচয়িতার নাম জানা নেই। এটি ফিকাহর ওপর রচিত।

১৩। দু'আউ আবি হানিফা

ভারতের বাঁকীপুরে এর পান্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।

১৪। মুখাতাবাতু আবি হানিফা মা'আ জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ রিযা (মৃ.১৪৮ হি)। মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ার মিউনিসিপ্যাল কুতুবখানায় সংরক্ষিত আছে।

১৫। বা'আয ফাতাওয়ায়ি আবি হানিফা

মুহাম্মদ ইবনে হাসান আস-শায়বানীর রিওয়ায়েতে ইমাম আযম রচিত এ পান্ডুলিপিটি প্যারিসে জাতীয় মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

১৬। কিতাবুল মাখারিজ ফিল হিয়াল

১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে ড. জোসেফ শাখত (১৯০২-৭২খ্রি) ইস্তাম্বুল ও কায়রোতে সংরক্ষিত পান্ডুলিপির ভিত্তিতে লিবতিজ থেকে প্রকাশ করেন। এটি ইমাম মুহাম্মদ শায়বানীর রিওয়ায়েতে বর্ণিত।

১৭। কিতাব আল মাকসূদ ফিস্ সারফ

কার্ল ব্রোকেলমান (১৮৬৮-১৯৫৬) ও ফুওয়াদ সিজগীন উল্লেখ করেন যে, এ পান্ডুলিপিটি ইস্তাম্বুলের বহু কুতুবখানায় সংরক্ষিত আছে। তারা বলেন যে, ইমাম আযমের প্রতি এটি পরবর্তী সময় আরোপিত।

ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহ) ফিকাহ শাস্ত্রের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের পাশাপাশি আকাইদের গ্রন্থ রচনা করেও এর মৌলিক ভিত প্রস্তুত করে যান। তিনি ছিলেন কালাম শাস্ত্রেরও পথিকৃত। পরবর্তীকালে তাঁর অনুসারিগণ এর ওপর ভিত্তি করে এলমে কালামের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটান। ইমাম মুহাম্মদ আবুল মনসুর আল-মাতুরীদি সমরকান্দী (২৬০-৩৩৩ হি) ইমাম আযমের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আকাইদের ক্ষেত্রে কোরআন, হাদীস, প্রজ্ঞা ও যুক্তির মাধ্যমে যে পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, তা যদিও 'মাযহাবে মাতুরীদিয়া' নামে খ্যাত, তবুও প্রকৃতপক্ষে তা ইমাম আযমেরই প্রদর্শিত মাযহাব। ইমাম মাতুরীদি নতুন কিছুই করেন নি। বরং তিনি ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর মত ও পদ্ধতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তা বিন্যস্ত করেছেন। তবে তিনি উগ্রপন্থী মু'তাযিলা, কারামাতিয়া ও বাতিনিয়াদের বাতিল আকিদা খন্ডন করে মুসলিম আকিদার হিফাযত করেন। ইমাম আল-মাতুরীদি (রাহ) তাঁর ১। 'কিতাব আত তাওহীদ' ২। 'কিতাব তাবিলাত আহলে আস-সুন্নাহ, ৩। কিতাব মা'খায আল শরীয়া ফি উসূল আদদীন', ৪। কিতাব আল উসূল, ৫। 'কিতাব আল-মাকালাত', ৬। তাবিলাতুল কোরআন, ৭। আল-জাদল, ৮। বায়ানু ওয়াহমিল মুতাযিলা, ৯। রাদ্দু কিতাবি ওয়াঈদিল ফুসসাক লিল কা'বী, ১০। রাদ্দু উসূলিল খামসাহ লি আবি মুহাম্মদ বাহেলী, ১১। রাদ্দু কিতাবিল ইমাম লিবা'যির রাওয়াফিয, ১২। রাদ্দু আলাল কারমিতাহ, ১৩। রাদ্দু তাহযীবিল জাদল লিল কা'বী, ১৪। 'রাদ্দু আওয়ালিল আদিল্লাহ লিল কা'বী প্রভৃতি গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা (রাহ) কর্তৃক নির্দেশিত আকাইদের বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রদান করে একটি অবকাঠামো নির্মাণ করেন, যা আকাইদের ক্ষেত্রে কালজয়ী মাযহাব হিসাবে স্বীকৃত।

আসলে ইমাম আবু হানিফা (রাহ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিকেই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন ইমাম মাতুরীদি (রাহ)। পরে তাঁর যোগ্য শারগিদ ও তাদের অনুগামীরা এ পথে প্রভূত উৎকর্ষ সাধন করেন। অর্থাৎ পরবর্তীতে অসংখ্য মনীষী ইমাম আবু হানিফার প্রদর্শিত পথে আকাইদ ও ফিকাহর ক্ষেত্রে মুসলিম মিল্লাতের জন্য রেখে গেছেন সীরাতে মুস্তাকিমে চলার সুস্পষ্ট পথ-নিদর্শন। এঁরা সবাই ছিলেন তাঁদের সময়ের বিদ্যা ও জ্ঞানে অতুলনীয়। তবুও তাঁরা ইমাম আযমের নির্দেশিত মূল ভিত্তির বিপরীতে কোন নতুন সংযোজন বা বিয়োজন করেন নি। তাঁরা শুধু যুগোপযোগী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়েছেন।

ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহ) সম্পর্কে লিখিত কয়েকটি বাংলা গ্রন্থ

বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমানই হানাফী মাযহাবের অনুসারী। কিন্তু এ মাযহাবের প্রবর্তক মহাত্মা ইমাম আযম (রাহ) সম্পর্কে বাংলাভাষায় বেশি সংখ্যক গ্রন্থ রচিত হয় নি। তাঁর সম্পর্কে লিখিত কয়েকটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। সেগুলো হলো

১। 'মহাত্মা হযরত ইমাম আবু হানিফা সাহেবের জীবন চরিত' (১৮৯৮)। লেখক, কাজী মৌলভী নওয়াব উদ্দীন আহমদ, বাগেরহাট।

২। 'ইমাম আজম' (১৯২৬)। লেখক, শামসুর রহমান চৌধুরী (১৯০২-১৯৭৭), চম্পকনগর, ব্রাক্ষণবাড়িয়া।

৩। হযরত আবু হানিফা (রাহ) ১৮৯৫। লেখক, ফররোখ আহমদ নেযামপুরী, সীতাকুন্ড।

৪। 'এমাম আবু হানিফা (রাহ)। লেখক, মাওলানা মোয়েজ্জদ্দীন হামিদী (১৮৯৫-১৯৭০), পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

৫। 'ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহ)'। লেখক, সাদেক শিবলী জামান, ১৯৭০ সালে ঢাকা হতে প্রকাশিত।

৬। ইমাম আযম আবু হানিফার রাজনৈতিক চিন্তাধারা। লেখক, আ.জ.ম. শামসুল আলম (জ. ১৯৩৭), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

৭। 'ইমামে আজম হযরত আবু হানিফা (রাহ)' ১৯৭০। লেখক, মাওলানা খন্দকার মো: বশিরউদ্দীন, সিরাজগঞ্জ।

৮। 'ইমাম আবু হানিফা (রাহ)' ১৯৮৭। লেখক, ফজলুর রহমান আনওয়ারী। তাজ কোম্পানী, ঢাকা।

৯। 'ইমাম আবু হানিফা' (১৯৭০)। অনুবাদে মাওলানা আবদুল জলিল (১৯৩৬-৯২)। মূল আল্লামা সাইয়েদ মানাযির আহসান গিলানী (মৃ. ১৯৩৬)। বইটির মূল নাম হলো 'হযরত ইমাম আবু হানিফা কী সিয়াসী যিন্দেগী'। 'ইমাম আবু হানিফার (রাহ) রাজনৈতিক জীবন নামে এই অনুবাদটি ১৯৮৭ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা প্রকাশ করে।

১০। আল্লামা শিবলী নো'মানীর (১৮৫৭-১৯১৫) 'সীরাতে নো'মান' নামে ইমাম আযমের জীবনী মাওলানা নুরুদ্দীন আহমদের (১৯০৬-৮৬) অনুবাদে শর্ষিণা আলিয়া লাইব্রেরী ১৯৫৮ সালে প্রকাশ করে। মাওলানা আবদুল জব্বার সিদ্দিকীর (১৯০৬-৮৯) অনুবাদটি ঢাকার মদীনা পাবলিকেশান্স ২০০৫ সালে প্রকাশ করে।

১১। 'ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহ)'। লেখক, এ.এম.এম সিরাজুল ইসলাম। ইসলামিক ফাইন্ডেশন ২০০১ সালে এই বিশাল তথ্যপূর্ণ গ্রন্থটি প্রকাশ করে।

১২। মাওলানা হাকিম আফসার বাশাহ সাহেবের একটি উর্দু গ্রন্থ মাওলানা যায়েদ সালীমুল্লাহর অনুবাদে ঢাকার নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী ১৪২৭ হিজরীতে প্রকাশ করে। এর নাম 'ইমামুল মুহাদ্দিছীন ইমাম আবু হানিফা (রাহ)'। বাংলাভাষায় এই মহান ইমাম সম্পর্কে রচিত বেশ কয়েকটি শিশু-কিশোর পাঠ্য গ্রন্থ রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা (রাহ) সম্পর্কে লিখিত অন্য ভাষার কয়েকটি গ্রন্থ

১। 'উকুদুল মারজান'। লেখক, ইমাম আবু জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ তাহাভী মিসরী, রাহ (মৃ. ২৩৯-৩২১ হি)।

২। 'রাতদাতুল আলিয়াতুল মুনীফা'। লেখক, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে শোয়ায়েব, রাহ (মৃ.৩৭৫ হি)।

৩। 'মানাকিবুল নো'মান'। বিপুল আয়তনের এ কিতাবটি রচনা করেন শায়খ আবু আবদুল্লাহ কাযী সিমরী হুসাইন ইবনে আলী, রাহ (মৃ. ৪২২ হি)।

৪। 'মানায়েকুন নো'মান ফি মানাকিবুন নো'মান'। লেখক, তাফসীরবিদ আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারী, রাহ (মৃ.৫৩৮ হি)।

৫। 'কাশফুল আছার'। লেখক, ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে হারেসী (রাহ)।

৬। 'মানাকিবুন নো'মান'। লেখক, ইমাম জহিরউদ্দীন মারগিনানী, রাহ (মৃ. ৫০৬ হি)।

৭। 'মানাকিবুন নো'মান। লেখক, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ কারুরী, রাহ (মৃ ৮২৮ হি)। এতে ইমাম আযমের বহু শিষ্যের নাম রয়েছে।

৮। 'আল-মাওয়াহিবুস শরীফা ফি মানাকিবুন নো'মান'। লেখক, শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের কারশী, রাহ (৬৯৬-৭৭৫ হি)।

৯। 'মানাকিবুন নো'মান। লেখক, শাসমুদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ তাওয়াসী, রাহ (তুর্কী ভাষার কাব্যে লিখিত)।

১০। 'ইখতিলাফ আবি হানিফা ওয়া আবি লায়লা'। কৃত ইমাম কাযী আবু ইউসুফ ইবনে ইবরাহীম (রাহ)। আবুল ওয়াফা আফগানীর টীকাসহ গ্রন্থটি ১৩৫৭ হিজরীতে কায়রো হতে প্রকাশিত হয়।

১১। 'রদুদ আ'লা আবি হানিফা' কৃত ইমাম আবু বকর ইবনে আবু শায়বা, রাহ (মৃ. ২৩৫ হি)। মুহাম্মদ যাহেদ আল-কাওসারী ১৩৬৫ হিজরীতে কায়রো হতে এটা প্রকাশ করেন।

১২। 'ফসলুন ফি মানাকিবে আবি হানিফা। কৃত আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে সালত আল-হিমানী, রাহ. (মৃ.৩০২ হি)। (কায়রো হতে প্রকাশিত)। তাঁর লিখিত 'মানাকিবুন নো'মান' একটি বিস্তারিত জীবনী গ্রন্থ রয়েছে।

১৩। 'নবযাতুন মিন মানাকিবে আবি হানিফা'। কৃত আবুল হাসান আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-কুদূরী, রাহ. (৩৬২-৪২৮ হি)। এটা ইস্তাম্বুল হতে প্রকাশিত হয়।

১৪। 'মানাকিবু আবি হানিফা'। কৃত আবু আবদুল্লাহ হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ, রাহ (মৃ ৪৩৬ হি)। এটি কায়রো ও ইস্তাম্বুল হতে প্রকাশিত হয়।

১৫। 'মুখতালাফ বায়না আবি হানিফা ওয়াস শাফী'। কৃত আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে হুমাইদ নাসেহী, রাহ. (মৃ. ৪৪৭ হি)। (ইস্তাম্বুল হতে প্রকাশিত)।

১৬। 'কিতাব আল-বায়ান ওয়াল কোরআন ফি জুমাল মিন ফাযাইল আল-ইমাম আল-আ'যম' কৃত আবু বকর উতাইক ইবনে দাউদ আল-ইয়ামানী, রাহ. (মৃ. ৪৬০ হি)। এটি ইস্তাম্বুল হতে প্রকাশিত হয়।

১৭। 'মানাকিব আল-ইমাম আযম'। কৃত আবু বকর আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবিত আল-খতীব আল-বাগদাদী, রাহ. (৩৯২-৪৬৩ হি)। (ইস্তাম্বুল হতে প্রকাশিত)।

১৮। 'ফাযাইল আবি হানিফা'। কৃত আবুল কাসেম আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আম্ মা'দী (রাহ)। এটা দামেস্ক ও কায়রো হতে প্রকাশিত হয়।

১৯। 'মানাকিবে আল-ইমাম আবি হানিফা'। কৃত আল-মুয়াফফেক ইবনে আহমদ ইবনে ইসহাক আল-মক্কী আল-খাওয়ারিযমী, রাহ (মৃ. ৫৬৮ হি)। (১৩২১ হিজরীতে হায়দ্রাবাদ হতে প্রকাশিত)। তাকিউদ্দীন ইয়াহিয়া ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল-কিরমানী, রাহ. (মৃ. ৮৩৩ হি)-এর সংক্ষেপণ করেন।

২০। 'মানাকিবে আবি হানিফা ওয়া আখবারে আসহাবিহী'। কৃত আবুল হাসান দিনওয়ারী (রাহ)। (কায়রো ও ইস্তাম্বুল হতে প্রকাশিত)।

২১। 'মানাকিবে আবি হানিফা'। কৃত মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ নকীব, রাহ. (মৃ. ৭৪৫ হি)। (বসরা ও ইস্তাম্বুল হতে প্রকাশিত)।

২২। 'মানাকিবে আবি হানিফা'। কৃত শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান যাহাবী, রাহ. (৬৭৩-৭৪৮ হি)। (ভারতের হায়দ্রাবাদ হতে প্রকাশিত)।

২৩। 'মানাকিবু আবি হানিফা'। কৃত মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-কুর্দী আল-বায্যাযী, রাহ. (মৃ. ৮৬৭ হি)। গ্রন্থটি বসরা, ইস্তাম্বুল এবং ১৩২১ হিজরীতে ভারতের হায়দ্রাবাদ হতে প্রকাশিত হয়।

২৪। 'তাবয়িদু আস-সাহিফা ফি মানাকিবে আবি হানিফা'। কৃত আবদুর রহমান ইবনে আবিবকর জালালউদ্দীন আস-সুউতি, রাহ. (৮৪৯-৯১১ হি)। এটা ১৩১৭ হিজরীতে ভারতের হায়দ্রাবাদ হতে প্রকাশিত হয়।

২৫। 'আল-খায়রাতু আল-হিসান ফি মানাকিবিল ঈমাম আল-আযম'। কৃত আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাজার মক্কী আল-হায়ছামী, রাহ. (৯০৯-৯৭৩ হি)। গ্রন্থটি ১৩০৪, ১৩১১ এবং ১৩২৬ হিজরীতে কায়রো হতে প্রকাশিত হয়।

২৬। 'কালায়েদ উকুদ আদ-দুরার...ফি মানাকিব আল-ইমাম আবি হানিফা আন-নো'মান কৃত আবুল কাসেম আবদুল আলিম ইবনে ওসমান আল-হানাফী, রাহ. (মৃ. ৯৭৪ হি)। (দামেস্ক, কায়রো, ইস্তাম্বুল ও মোসেল হতে প্রকাশিত)।

২৭। 'মানাকিবে আল-ইমাম আবি হানিফা'। কৃত আবদুল গফুর ইবনে হুসাইন ইবনে আলী আল-মায়ী (রাহ)। এটা ইস্তাম্বুল হতে প্রকাশিত হয়।

২৮। 'মানাকিবে আবি হানিফা ওয়া সাহিবাহি আবি ইউসুফ ওয়া মুহাম্মদ ইবনে আল-হাসান' কৃত আবুল লাইস মুহাররম ইবনে মুহাম্মদ আল-যায়লায়ী, রাহ. (মৃ. ১০০৭ হি)। এটা ১০১৬ হিজরীতে কায়রো হতে প্রকাশিত হয়।

২৯। 'আল-দুররুল মুনায্যাম ফি মানাকিব আল-ইমাম আল-আ'যম'। কৃত নূহ ইবনে মোস্তফা আর-রুমী, রাহ. (মৃ. ১০৭০ হি)। (ইস্তাম্বুল ও কায়রো হতে প্রকাশিত)।

৩০। 'আল-নাওয়াদির আল মু'নিফা ফি মানাকিব আল ইমাম আবি হানিফা'। কৃত মাওলানা আবদুল আউয়াল জৈনপুরী, রাহ. (মৃ ১৩৩৯ হি.)। গ্রন্থটি ১৩১০ হিজরীতে ভারতের কানপুরে মুদ্রিত হয়।

৩১। 'হায়াত আল-ইমাম আবি হানিফা' কৃত সাইয়েদ আফিফী। এটা ১৩৫০ হিজরীতে কায়রো হতে প্রকাশিত হয়।

৩২। 'আবু হানিফা হায়াতুহু আছারুহ..। কৃত ড. মুহাম্মদ আবু যোহরা মিসরী। এটা ১৯৪৭ সালে কায়রো হতে প্রকাশিত হয়।

৩৩। 'আবু হানিফা ওয়াল কাইয়েম আল-ইনসানিয়া'। কৃত মুহাম্মদ ইউসুফ মুসা। ১৯৫৭ সালে এটা কায়রো হতে প্রকাশিত হয়।

৩৪। 'মানাকিবে আবি হানিফা'। লেখক, সাদরুল আইম্মা মক্কী ইবনে ইবরাহীম (রাহ)।

৩৫। 'মানাকিবুল ইমামুল আ'যম'। লেখক, শায়খ আবু সায়ীদ। (ফারসী ভাষায় লিখিত)।

৩৬। 'মানাকিবুল ইমামুল আযম'। লেখক, মাওলানা মোহাম্মদ কামী আফেন্দী, রাহ (তুর্কী ভাষায় লিখিত)।

'মানাকিব' নামে আরও অনেক গ্রন্থ রয়েছে। উর্দুসহ বিশ্বের বহু ভাষায় লিখিত গ্রন্থে ইমাম আ'যমের (রাহ)-এর জীবনী প্রকাশিত হয়েছে। এমনিভাবে বিশ্বের অসংখ্য মনীষী ও ফকিহ-মুহাদ্দিস ও ইসলামী চিন্তাবিদ ইমামুল মুহাদ্দিসীন ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহ) সম্পর্কে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইসলামের অন্য কোন ব্যক্তিত্বের এতো বেশি জীবনী গ্রন্থ লিখিত হয় নি। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, ইমাম খতীব বাগদাদী, হাফিয ইমাম নওয়াবী, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, হাফিয ইবনে হাজার মক্কী, ইমাম সুউতি, ইমাম ইয়াফেয়ী, ইমাম ইবনে ইউসুফ সালেহানী শাফেয়ী, শায়খ ইমাম আবদুল ওয়াহহাব শা'রানী (রাহমাতুল্লাহ আলাইহিম) প্রমুখ এই মহামতি ইমাম আযমের পবিত্র জীবনী ও তাঁর হাদীস চর্চা সম্বন্ধে তাঁদের লিখিত গ্রন্থে অতীব যত্নের সাথে আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হাদীস চর্চায় ইমাম আ'যম (রাহ)-এর অপূর্ব অবদান

ইমামুল মুহাদ্দিসীন ইমাম আবু হানিফা (রাহ) পবিত্র হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন সাহাবী (রা), তাবেয়ী (রাহ) ও তাবে-তাবেয়ীদের নিকট থেকে। প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর এসব মান্যবর উস্তাদের নিকট হতে হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন তিনি। আল্লামা আবুল মাহাসিন জামালউদ্দীন (রাহ) তাঁর নিরানব্বই জন হাদীসের উস্তাদের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লামা আবু হাফ্স কবীর (রাহ) বলেছেন, চার হাজার। 'মুজামুল মুসান্নিফীন' এর গ্রন্থকার তাঁর হাদীসের উস্তাদগণের সংখ্যা তিন শতের অধিক উল্লেখ করে তালিকা পেশ করেছেন। 'খায়রাতুল হিসান' গ্রন্থের লেখক আল্লামা ইবনে হাজার হায়ছামী শাফিয়ী (রাহ) বলেছেন, "ইমাম আবু হানিফার উস্তাদগণের সংখ্যা এতো অধিক যে, তা সংক্ষেপে বর্ণনা করা সহজসাধ্য নয়। ইমাম আবু হাফ্স কবীর তাঁদের সংখ্যা চার হাজার বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যরা বলেছেন, তাবেয়িগণের মধ্যে তাঁর চার হাজার উস্তাদ ছিলেন। তাঁদের পরবর্তীগণের কথা আর কি বলবো ('তারীখে ইলমে ফিকাহ' কৃত আল্লামা মুফতি সাইয়েদ মুহাম্মদ আমিমুল ইহসান মুজাদ্দেদী, রাহ)।

ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ) তাবেয়ী ছিলেন। এ সুবাদে তিনি সাহাবী (রা) হতে ফিকাহ ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন করতে সমর্থ হন। মুজতাহিদ ইমাম ও মুহাদ্দিসদের মধ্যে একমাত্র তিনিই তাবেয়ী হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেছিলেন। আর কোন মাযহাবী ইমাম বা মুহাদ্দিস এ যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন নি। এটা তাঁর একক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও গুণপণা। তাছাড়া সমকালীন বিভিন্ন মতের উলামায়ে কিরামের নিকট হতেও তিনি সাহাবায়ে কিরামের ফাতাওয়া পর্যন্ত জানার সুযোগ পেয়েছিলেন। জীবিত অবস্থায় কয়েক জন সাহাবী (রা)-এর দর্শন লাভ করেই তিনি তাবেয়ী হয়েছিলেন।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত ফকিহ মুহাদ্দিস ও ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আবদুল আউয়াল জৈনপুরী (রাহ), তাঁর রচিত গ্রন্থ 'আল-নাওয়াদির, আল-মুনিফা ফি মানাকিব আল-ইমাম আবি হানিফা' এ উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রাহ) সাহাবাগণকে দেখেছেন এবং তাঁদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। আবু আবদুল্লাহ শামসুদ্দীন যাহাবী (রাহ) বলেন, ইমাম আবু হানিফা (রাহ) ছোট বেলায় হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) কে দেখেছিলেন। ইমাম আবু হানিফা বলতেন, 'আনাস ইবনে মালিক (রা) কুফায় এসে নাখায় অবস্থান করতেন। তিনি লাল খেযাব লাগাতেন, আমি তাঁকে অনেক বার দেখেছি'। শায়খুল ইসলাম আবুল ফযল আহমদ (রাহ) বলেন, 'ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ) একদল সাহাবীকে দেখেছেন। কারণ তিনি কুফায় ৮০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তখন সেখানে সাহাবীদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফাও ছিলেন।

ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ)-এর সমসাময়িক ইমামদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন সিরিয়ার আওযায়ী (রাহ), বসরার হাম্মাদ ইবনে সালামা (রাহ). কুফার সুফিয়ান সাওরী (রাহ), মদীনার ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রাহ), মিসরের ইমাম লাইস ইবনে সা'দ,রাহ (৯৪-১৭৫হি)। এঁদের কেউ সাহাবীদের দেখেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। ইমাম আ'যম

আবু হানিফার প্রশংসায় যাঁরা গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁদের অনেকেই বলেছেন যে, ইমাম আযম ৮ জন সাহাবী ও একজন সাহাবিয়াকে দেখেছেন। অন্য সূত্রে বলা হয়েছে যে, ইমাম আ'যম ১৫ জন সাহাবী ও একজন সাহাবিয়াকে দেখেছেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিযুল হাদীস ইমাম মুযানী (রাহ)-এর বর্ণনায় ইমাম আবু হানিফা (রাহ) অন্যুন ৭২ জন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছেন (মুজামুল মুসান্নিফীন)। ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রাহ) তাঁর রচিত কবিতায় বলেছেন, "নো'মান (আবু হানিফা)-এর পক্ষে গর্ব করার মত এতোটুকুই যথেষ্ট যে তিনি সাহাবীদের থেকে বর্ণনা করেছেন"। ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (১৬৮-২৩০হি) রাহ. লেখেছেন যে, ইমাম আ'যম আবু হানিফা হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)কে দেখেছেন। কেননা তিনি বসরায় ৯৯ হিজরীতে (ইবনে আবদুল বার-এর মতে) ইন্তেকাল করেছেন। তাছাড়া সাহাবী সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাহ) মদীনায় এবং সাহাবী আবুত তোফায়েল আমির ইবনে ওয়াসিলা আল-কিনানী (রাহ) মক্কা নগরে বসবাস করতেন। এই দুই পবিত্র শহরে ইমাম আ'যম অসংখ্য বার গিয়েছেন এবং বহু দিন অবস্থান করেছেন। সুতরাং কোন সাহাবীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ অসম্ভব নয়।

আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী (রাহ) হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ)-এর ফাতাওয়ার ভিত্তিতে লেখেছেন, "নিশ্চয় তিনি (ইমাম আবু হানিফা) সাহাবাদের এক জামাতকে দেখতে পেয়েছেন, যারা কুফা নগরে থাকতেন। কারণ তিনি ৮০ হিজরীতে তথায় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর সমকালীন সিরিয়ার ইমাম আওযায়ী (৮৮-১৫৬হি), বসরার হাম্মাদ ইবনে সালামা ও হাম্মাদ ইবনে যায়িদ, কুফার সুফিয়ান সাওরী, মদীনার ইমাম মালিক এবং মিসরের লাইস ইবনে সা'দ রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখ ইমামগণ এ মর্যাদা লাভ করেন নি অর্থাৎ তাদের কেউ তাবেয়ী নন"। ইবনে হাজার মক্কী (রাহ) আরও লেখেন, "ইমাম আ'যম (রাহ) আট জন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। এর মধ্যে আনাস ইবনে মালিক (রা), আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা), সাহল ইবনে সা'দ (রা) এবং আবুত তোফায়েল (রা) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য"।

আল্লামা আলাউদ্দীন (রাহ) 'দুররুল মুখতার' গ্রন্থের মোকদ্দমায় উল্লেখ করেছেন, "বয়সের হিসাব অনুযায়ী তিনি প্রায় বিশজন সাহাবীকে দেখতে পেয়েছেন। 'মুনিয়াতুল মুফতী' গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে তিনি আরও বলেছেন, "ইমাম আবু হানিফা সাত জন সাহাবীর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন, এ কথা প্রমাণিত সত্য"। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রাহ) লেখেছেন, "সব দিক বিবেচনায় ইমাম আবু হানিফা (রাহ) তাবেয়ী ছিলেন। হাফিয যাহাবী ও হাফিয আসকালানী (রাহ) তা দৃঢ়তা সহকারেই ঘোষণা করেছেন"। উপমহাদেশের প্রখ্যাত গবেষক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, রাহ (১৯১৮-৮৭) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'হাদীস সংকলনের ইতিহাস' (১৯৭০)-এ দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, "ইমাম আবু হানিফা (রাহ) তাবেয়ী ছিলেন"। উল্লেখ্য যে, সাহাবীদের যুগ শেষ হয় ১১০ হিজরীতে, তাবেয়ীদের যুগ শেষ হয় ১৭০ হিজরীতে আর তাবে-তাবেয়ীদের যুগ শেষ হয় ২২০ হিজরীতে (মিরকাত শরহে মিশকাত, পঞ্চম খন্ড)।

ইমাম আবু হানিফা (রাহ) তাবেয়ীর মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিলেন বলেই তাঁর জীবনীকারদের অনেকে বলেছেন যে, তিনি সাহাবীদের থেকে হাদীস শুনেছেন এবং তা

সংরক্ষিত করেছেন। কিছু সংখ্যক উলামায়ে কিরামও বলেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রাহ) সাহাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনার গৌরব অর্জন করেছেন। তাঁরা বর্ণিত হাদীসগুলোও উপস্থাপন করেছেন। যেমন (১) 'যে আল্লাহর জন্য মসজিদ তৈরি করে.....তার জন্য জান্নাতে ঘর তৈরি হবে'। (২) 'বিদ্যার্জন সব মুসলিমের জন্যই ফরয'। (৩) 'যে ব্যক্তি আল্লাহর দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনে আত্মনিয়োগ করে.... তাকে কল্পনাতীত উৎস হতে রিযিক দেয়া হয়' ইত্যাদি। এসব হাদীস তো বহু শক্তিশালী সনদে বর্ণিত। তিনি যে সাত জন সাহাবী (রা)-এর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন তা আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ ইবনে মুহাম্মদ খাওয়ারিযমী, রাহ. (মৃ ৬৬৫ হি)-এর লিখিত 'জামেউ মাসানীদিল ইমামিল আ'যম' (১৩৩২ হিজরীতে ভারতের হায়দারাবাদ হতে প্রকাশিত) গ্রন্থে প্রমাণিত রয়েছে। এর মধ্যে ছয় জন সাহাবী ও একজন সাহাবিয়া রয়েছেন। সে সব রিওয়ায়েত এরূপ

(১) আন আবি হানিফা আন আনাস বিন মালিক রাযি আল্লাহু আনহু আন রাসূলিল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
(২) আন আবি হানিফা আন আবদিল্লাহ বিন উনাইস (রা) আন রাসূলিল্লাহ (ছা)।
(৩) আন আবি হানিফা আন আবদিল্লাহ বিন হারিস (রা) আন রাসূলিল্লাহ (ছা)।
(৪) আন আবি হানিফা আন জাবির বিন আবদিল্লাহ (রা) আন রাসূলিল্লাহ (ছা)।
(৫) আন আবি হানিফা আন আবদিল্লাহ বিন আবি আওফা (রা) আন রাসূলিল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
(৬) আল আবি হানিফা আন ওয়াসিলা বিন আসকা (রা) আন রাসূলিল্লাহ (ছা)।
(৭) আন আবি হানিফা আন আয়েশা বিনতে আজরাদ (রা) আন রাসূলিল্লাহ (ছা)।

হাদীসের এসব রিওয়ায়েতের মধ্যে আবু হানিফা (রাহ)-এর ও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে শুধু একজন রাবীর (সাহাবীর) মধ্যস্থতা বিদ্যমান। এতে প্রমাণিত হলো যে, ইমাম আ'যম স্বয়ং সাহাবী থেকে শুনেছেন এবং সাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছা) থেকে শুনেছেন। হাদীস বর্ণনার এরূপ উঁচু প্রকারের মধ্যে সাইয়েদোনা ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ) সমস্ত আইম্মায়ে মুহাদ্দিসীনের মাঝে বৈশিষ্টমন্ডিত ও একক মর্যাদার অধিকারী। সমস্ত মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদের মধ্য হতে কোন এক জনেরও এরূপ উঁচু সনদের মর্যাদা নসিব হয় নি। ইমাম আ'যমের সাথে সাহাবীদের সাক্ষাতের ফলেই তাঁর এ মর্যাদা হাসিল হয়েছে।

সাহাবিগণ সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, এতে ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর তাবেয়ী হওয়া একটি স্বীকৃত ও অনস্বীকার্য বাস্তবতা। আল্লামা সুউতি (রাহ) তাঁর 'তাবয়িদুস সাহিফা বি মানাকিবি আবি হানিফা' নামক গ্রন্থে কিছু বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। সেসব বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ইমাম আবু হানিফা (রাহ) হযরত আনাস (রা), আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা), আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে আলজুয (রা), আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা), ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা) এবং আয়েশা বিনতে আজরাদ (রা) থেকে একাধিক বর্ণনা শুনেছেন। হাফিয আবু মা'শার আবদুল করিম ইবনে আবদুস সামাদ আত-তাবারী এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা লেখেছেন। এতে তিনি ইমাম আবু হানিফার সেসব বর্ণনা সংকলন

করেছেন, যেগুলো তিনি সরাসরি সাহাবায়ে কিরাম থেকে শুনেছেন। উক্ত গ্রন্থে অন্যান্য সাহাবা ছাড়াও জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) ও মা'কেল ইবনে ইয়াসার (রা)-এর কাছ থেকেও ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর হাদীস শ্রবণ করার বিষয় প্রমাণ করা হয়েছে। আল্লামা সুউতি (রাহ) তাঁর উক্ত গ্রন্থে হাফিয আবু মা'শারের সূত্রে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন এভাবে,

"আবু হানিফা (রাহ) আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আনাস (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছা)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের ওপর এলেম (জ্ঞান) অর্জন করা ফরয"। এ বর্ণনার ব্যাপারে আল্লামা জালাল উদ্দীন সুউতি (রাহ) বলেন, 'এটি সহীহ-এর সমপর্যায়ের'। হাফিয মিয্যী (রাহ)-এর মন্তব্য হলো, এ বর্ণনা বহুবিধ সূত্রের ভিত্তিতে 'হাসান' হাদীসের স্তরে এসে পড়েছে। এতে আর কোন সন্দেহ থাকে না যে, ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর সাহাবীদের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ প্রমাণিত নয়। যদি ধরে নেয়া হয় যে, হাদীস শ্রবণ প্রমাণিত নয়, তবু সাক্ষাত লাভের বিষয়টি তো নিশ্চিত। এজন্য ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর তাবেয়ী হওয়াটা বিশেষজ্ঞদের নিকট স্বীকৃত। কেননা, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (রাহ) 'তাবাকাত' গ্রন্থে, হাফিয যাহাবী (রাহ) 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' গ্রন্থে, হাফিয মিয্যী (রাহ) 'তাহযিবুল কামাল' গ্রন্থে, আল্লামা কাস্তালানীর শরহে বোখারীতে, আল্লামা নওয়াবী (রাহ)'তাহযিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত' গ্রন্থে, আল্লামা সুউতি (রাহ) 'তাবয়িদুস সাহিফা' গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির তাবেয়ী হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন। (১)

ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ)-এর হাদীসের এলেম অর্জন

ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর হাদীস শাস্ত্রে কতটুকু জ্ঞান ছিল এর একটা ধারণা লাভ করা যায় তাঁর শিক্ষকমন্ডলী ও শিষ্যবর্গের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করলে। হাফিয আবুল হাজ্জাজ মিয্যী (রাহ) 'তাহযিবুল কামাল' গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফার চুয়াত্তর জন উস্তাদের কথা উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (রাহ) বলেছেন, "ইমাম আবু হানিফা (রাহ) কুফা নগরে ৯৩ জন মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন"। এখানে আগত অতিথি তাবেয়ীদের থেকেও তিনি হাদীসের পাঠ নিতেন।

---

(১) যে সব মহান মনীষী ইমাম আযম (রাহ) সম্পর্কে উচ্ছসিত প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করেছেন তাঁরা ছিলেন ইসলামের মূল গ্রন্থাবলী তথা কোরআন ও হাদীস শাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী এবং আল্লাহভীরু, মুত্তাকী ও পূত চরিত্রের অধিকারী। তাঁদের বিষয়ে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা হলেও গ্রন্থের পরিধি বহু গুণ বর্ধিত হবে। তাই নমুনা স্বরূপ এ পর্যায়ে ইমাম মিয্যী (রাহ)-এর ব্যাপারে দু'টি কথা বলা হলো।

ইমাম আবুল হাজ্জাজ জামালুদ্দীন ইউসুফ ইবনে আবদুর রহমান আল-মিয্যী, রাহ. (৬৫৪-৭৪২ হি) আল-হালাবী কোরআন হিফয করে ফিকাহর প্রয়োজনীয় মাসয়ালা শিক্ষা করেন। তিনি বিভিন্ন শহরের অগণিত মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। তিনি বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী, হাদীস শাস্ত্রের হুজ্জাহ, অগাধ জ্ঞানের অধিকারী এবং উত্তম চরিত্রে বিভুষিত ছিলেন। রিজাল শাস্ত্রে তিনি দু'শো খন্ডে ব্যাপ্ত 'আত-তাহযিবুল কামাল ফি আসমায়ির রিজাল' এবং আতরাফ শাস্ত্রে ৮০ খন্ডে 'তুহ্ফাতুল আশরাফ ফি মারিফাতিল আতরাফ' কিতাব রচনা করেন। এলমুল রিজাল-এ তিনি অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি সিহাহ সিত্তাহর সব গ্রন্থের সনদ বিচার করেন।

হাফিয সুউতি (রাহ) 'তাবয়িদুস সাহিফা' গ্রন্থে ইমাম আ'যমের উস্তাদগণের নামগুলো উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবী (রাহ) এসব নাম উল্লেখ করে তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, 'আরো অনেক রয়েছেন'। মোল্লা আলী কারী (রাহ) 'মুসনাদে আবি হানিফা' নামক কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর উস্তাদগণের সংখ্যা চার হাজার বলে বর্ণনা করেছেন। এসব উস্তাদ হচ্ছেন, সে স্তরের যে স্তর পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত মুহাদ্দিসদের কেউ লাভ করতে পারেন নি। কেননা, ইমাম আযমের উস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী। এর নিম্নে তাঁর কোন উস্তাদ ছিলেন না। তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী উস্তাদগণের নিকট হতেই ইমাম আবু হানিফা (রাহ) অনুশীলনের দ্বারা সাহাবী কিরামের হাদীস ও ফিকাহ জানার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং গবেষণা করে মাসয়ালা বেরকরণে প্রজ্ঞা লাভ করেছিলেন।

'তারীখে বাগদাদ'-এ উল্লেখ আছে যে, একদিন ইমাম আবু হানিফা (রাহ) খলিফা মনসুর-এর দরবারে আসলেন। সেখানে বিশেষ ব্যক্তিত্ব ঈসা ইবনে মুসা উপস্থিত ছিলেন। খলিফা মনসুর তাঁকে বললেন, 'ইনি এযুগের সবেচে' বড় আলিমে দীন'। মনসূর ইমাম আবু হানিফাকে লক্ষ্য করে বললেন, নো'মান, আপনি কোন সূত্র হতে এলেম অর্জন করলেন?

তিনি বললেন, "হযরত ওমর (রা)-এর ছাত্রগণ থেকে এবং তাঁরা স্বয়ং হযরত ওমর ফারুক (রা) থেকে, হযরত আলী (রা)-এর ছাত্রগণ থেকে এবং তাঁরা স্বয়ং হযরত আলী মুরতাযা (রা) থেকে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর ছাত্রগণ থেকে এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর ছাত্রগণ থেকে। এ সময়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর ন্যায় বড় আলিম বিশ্বজগতে আর কেউ ছিলেন না।" মনসুর বললেন, 'আপনি সত্যিই অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র হতে এলেম অর্জন করেছেন'।

হযরত আলী (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর ছাত্রদের মধ্যে বড় বড় মুহাদ্দিস ও ফকিহ ছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে সামান্য লেখতে গেলেও একটি বিরাট গ্রন্থ হয়ে যাবে। আর উচ্চ মর্যাদাশীল তাবেয়ী হযরত মাসরূক ইবনে আযদা, রাহ. (মৃ.৬৩ হি.) বলেন, " আমি দীর্ঘ গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এ কথা অনুধাবন করতে পেরেছি যে, হযরত মুহাম্মদ (ছা)-এর সাহাবিগণের এলেম (হাদীস) ছয় ব্যক্তির মধ্যে এসে একত্র হয়ে যায়। তাঁরা হলেন, (১) হযরত আলী (রা), (২) হযরত ইবনে মাসউদ (রা), (৩) হযরত ওমর (রা), (৪) হযরত ইয়াযিদ (রা), (৫) হযরত আবু দারদা (রা) এবং (৬) হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা)। তারপর আমি দেখছি যে এ ছয় ব্যক্তির এলেম হযরত আলী (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা)-এর মধ্যে একত্র হয়েছে"।

সুতরাং এই দু'জনের ছাত্রগণ অর্থাৎ তাবেয়ীদের নিকট হতে কোরআন-হাদীসের যে জ্ঞান ইমাম আ'যম গ্রহণ করেছিলেন তাই তো যথেষ্ট ছিল। তারপরও তিনি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন শহরে গিয়েছেন জ্ঞানেরই অন্বেষণে। মক্কা শরীফে গিয়ে বহু দিন অবস্থান করেছেন, প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত আতা ইবনে রিবাহ, রাহ. (মৃ ১১৪ হি)-এর ছাত্র হয়েছেন। আর পবিত্র মদীনায় গিয়ে আহলে বাইতের বুযর্গদের নিকট ধর্ণা দিয়েছেন। সেখানে ইমাম বাকির মুহাম্মদ ইবনে যয়নাল আবেদীন, রাহ. (৫৭-১১৪ হি) ও যায়িদ ইবনে যয়নাল আবেদীন, রাহ. (মৃ. ১২৪ হি) ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পান্ডিত্যের

অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁদের থেকে এলমী ফায়দা হাসিল করেন। ইমাম জা'ফর আস-সাদেক রাহ. (৮০-১৪৮ হি) এর সাথেও ইমাম আ'যমের এলমী সুসম্পর্ক ছিল। আল্লামা মক্কী (রাহ), ইবনে বায্যাযী (রাহ) ও অন্যান্য মনীষীদের রচিত মানকির গ্রন্থে লেখা আছে যে, ইমাম আ'যম (রাহ) আবদুল্লাহ ইবনে হাসান, রাহ (৭০-১৪৫ হি)-এর সামনে হাঁটু গেড়ে আদবের সাথে বসতেন। তিনি একজন বিশ্বাসযোগ্য মুহাদ্দিস ও সত্যবাদী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি অত্যন্ত আবেদ ও যাহেদ ব্যক্তি ছিলেন। এঁদেরকে তিনি তাঁর উস্তাদের মধ্যে গণ্য করেছেন। তিনি বহু বার পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেছেন। হজ্বের সফরে বিভিন্ন উলামায়ে কিরাম ও ইমাম-মুজতাহিদগণ থেকে জ্ঞান আহরণ ও তাঁদের সাথে এলমী আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁরা হাদীস বর্ণনা করতেন। তাঁদের থেকে তিনি হাদীস সংগ্রহ করতেন এবং ফাতাওয়া দিতেন। তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণের সাথে এবং ভিন্ন মতাবলম্বী জ্ঞানীদের সাথেও তাঁর পরিচিতি ছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ) অসংখ্য উস্তাদ থেকে এলেম শিক্ষা করেছেন। 'উকুদুল জুম্মান' এর লেখক ইমাম ইবনে ইউসুফ সালেহানী (রাহ) এ গ্রন্থে দু'শো আশি জন উস্তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ চার হাজার নামেরও তালিকা তৈরি করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সেকালের সমস্ত এলমী মারকাযের শ্রেষ্ঠ আলিমদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ও এলমী আলোচনা হয়েছে। ইমাম আযমের শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ উস্তাদগণ হলেন,

১। হাম্মাদ ইবনে আবু সোলায়মান আল-কুফী, রাহ. (মৃ. ১২০ হি)।
২। আমের ইবনে শূরাহবিল আস-শাবী হিমায়রী আল-কুফী, রাহ. (মৃ. ১০৪ হি)।
৩। আলকামা ইবনে মারসাদ আল-কুফী, রাহ. (মৃ. ১০৪ হি)।
৪। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর আল-মাদানী, রাহ. (মৃ. ১০৬ হি)।
৫। হাকাম ইবনে কুতাইবা আল-কুফী রাহ. (মৃ. ১০৫ হি)।
৬। ইকরামা মাওলা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আল-মক্কী, রাহ. (মৃ. ১০৭ হি)।
৭। সোলায়মান ইবনে ইয়াসার আল-মাদানী, রাহ. (৩৪-১০৭ হি)।
৮। আ'ছেম ইবনে আবু নাজওয়াদ আল-কুফী (রাহ)।
৯। সালামা ইবনে কুহাইল আল-কুফী, রাহ. (মৃ. ১২৩হি)।
১০। আলী ইবনে আকমার আল-কুফী (রাহ)।
১১। আতা ইবনে আবু রিবাহ আল-মক্কী, রাহ. (মৃ. ১১৪ হি)।
১২। যিয়াত ইবনে আলফাহ আল-কুফী, (রাহ)।
১৩। হায়সাম ইবনে হাবিব (রাহ)।
১৪। আল-বাকির মুহাম্মদ ইবনে আলী, রাহ. (৫৭-১১৪ হি)।
১৫। আদী ইবনে সাবিত আল-আনসারী (রাহ)।
১৬। আতিয়া ইবনে সায়ীদ আওফী (রাহ)।
১৭। আবু সুফিয়ান সা'দী (রাহ)।

১৮। আবু উমাইয়া আবদুল করিম (রাহ)।
১৯। আবু মুযারিফ আল-বাসারী (রাহ)।
২০। ইয়াহিয়া ইবনে সায়ীদ আল-আনসারী, রাহ. (মৃ. ১৪৩হি)।
২১। ইহ্সাম ইবনে ওরওয়া আল-মাদানী (রাহ)।
২২। নাফে' মাওলা ইবনে ওমর আল-মাদানী, রাহ. (মৃ. ১১৭ হি)।
২৩। আমর ইবনে দীনার আল-মক্কী, রাহ.(৪৬-১২৬হি)।
২৪। আবদুর রহমান ইবনে হরমুয আল-আনাজ আল-মাদানী, রাহ. (মৃ. ১১৭ হি)।
২৫। কাতাদা ইবনে দা'আমা আল-বাসারী, রাহ. (মৃ. ১১৮ হি)।
২৬। আবু ইসহাক সাবিয়ী আল-কুফী, রাহ. (মৃ. ১২৭হি)।
২৭। মাহারিব ইবনে দিসার আল-কুফী, রাহ. (মৃ. ১১৬ হি)।
২৮। মুহাম্মদ ইবনে দিসার আল-কুফী (রাহ)।
২৯। মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির, রাহ. (মৃ. ১৩১ হি)।
৩০। মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব যুহরী আল-মাদানী, রাহ. (৫০-১২৪ হি)।
৩১। আবু যোবায়ের মুহাম্মদ মুসলিম আল-মক্কী, রাহ. (মৃ. ১২৭ হি)।
৩২। সিমাক ইবনে হারব আল-কুফী, রাহ. (মৃ. ১২৩ হি)।
৩৩। কায়েস ইবনে মুসলিম আল-কুফী, রাহ. (মৃ. ১২০ হি)।
৩৪। ইয়াযিদ ইবনে সুহায়ব আল-কুফী, (রাহ)।
৩৫। আবদুল আযীয ইবনে কাফী আল-মক্কী (রাহ)।
৩৬। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার আল-মাদানী, রাহ. (মৃ. ১২৭ হি)।
৩৭। সায়ীদ ইবনে মাসরূক সাওরী (রাহ)।
৩৮। মনসুর ইবনে মু'তাসির আল-কুফী (রাহ)।
৩৯। আ'মাশ সোলায়মান ইবনে মিহরান, রাহ. (মৃ. ১৪৭ হি)।
৪০। আওন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওতবা (রাহ)।
৪১। হিশাম ইবনে ওরওয়া আল-মাদানী, রাহ. (৬১-১৪৫ হি)।
৪২। শো'বা ইবনে হাজ্জাজ, রাহ. (মৃ. ১৬০ হি)।
৪৩। আমর ইবনে মুররা আল-কুফী, রাহ (মৃ ১৬১ হি)।
৪৪। মনসুর ইবনে মা'মর আল-কুফী (রাহ)।
৪৫। আদী ইবনে মারসাদ আল-কুফী (রাহ)।

ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ)-এর শায়খ ও উস্তাদগণ বিভিন্ন মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁদের সবাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের এবং 'আহলুর রায়' এর ছিলেন না। এঁদের মধ্যে বিশিষ্ট হাদীস-বিশারদ ও তাফসীর বিশেষজ্ঞ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর বিশেষজ্ঞ ছাত্ররাও ছিলেন। উমাইয়া খিলাফতের পতনের সময় অর্থাৎ তখনকার গোলযোগের সময়ে ইমাম আ'যম নিরাপদ স্থান মক্কা মোকাররমায় প্রায় ছয় বছর অবস্থান করেন। এ সময় তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-এর ছাত্র (তাবেয়ী) এবং প্রবীণ তাবেয়ীদের থেকে এলেমের উত্তরাধিকারী হয়েছেন।

ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ)-এর সম্মানিত উস্তাদগণের পরিসংখ্যান দীর্ঘ হওয়ার আরও একটি কারণ হতে পারে। সে যুগে কোন একক মুহাদ্দিসের নিকট বেশি হাদীস ছিল না। প্রত্যেকেই অতি অল্প হাদীস বর্ণনা করতেন। মক্কা মুকাররমা, মদীনা মুনাওয়ারা, কুফা, বসরা প্রভৃতি স্থানের অনেক মুহাদ্দিসের সাথে অল্প কয়েক দিনের পরিচয়েও তিনি হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। মক্কায় সফরের সময়ই সিরিয়ার মুহাদ্দিস আওযায়ী (রাহ) ও ইমাম মকহুল ইবনে আবু মুসলিম (মৃ.১১৩হি)-এর সাথে ইমাম আযমের পরিচয় ও শরীয়তী বিষয়ে মতবিনিময় হয়। ১০২ হিজরীতে মদীনার বিখ্যাত সাত ফকিহর অন্যতম সোলায়মান (হযরত মায়মুনা রা-এর গোলাম) ও সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতেও তিনি তালিমপ্রাপ্ত হন। সালেম (রাহ) তাঁর পিতাসহ বহু সাহাবী হতে হাদীসের শিক্ষা-প্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আমর ইবনে দীনার (রাহ) ও অন্যান্য খ্যাতিমান তাবেয়ী ব্যক্তিবর্গ যেমন, কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর, কাতাদা ইবনে দা'আমা, নাফে, তাউস বিন কাইসান, আবদুল্লাহ ইবনে দীনার, সোলায়মান আল-আ'মাশ রাহমাতুল্লাহ আলাইহিম প্রমুখের শিক্ষালয় থেকে ইমাম আ'যম উপকৃত হন। অর্থাৎ তাঁর যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহদের এলমী মজলিসের সাথে সম্পর্কিত থেকে তিনি হাদীস ও ফিকাহর জ্ঞান অর্জন করেন। আল্লামা মক্কী (রাহ) বলেন, "ইমাম আ'যম শুধু বসরাতেই দশবার এলমী সফরে যান। ১৩০ থেকে ১৩৬ হিজরীর সময়ে মক্কায় অবস্থান করে ইবনে আব্বাসের (রা) শিষ্যদের থেকে তিনি হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। আর মদীনায় থাকাকালে ইবনে ওমর (রা)-এর শিষ্যদের থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন"। এমনিভাবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা অর্জনে ব্যাপৃত থাকেন।

ইমাম আ'যম ও ইমামুল মুহাদ্দিসীন আবু হানিফা (রাহ)-এর কয়েকজন প্রসিদ্ধ উস্তাদ সম্পর্কে সামান্য আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হলো। এমন উস্তাদগণের সান্নিধ্যে গিয়ে তিনি তাঁদের বিশেষ চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের অর্জিত হাদীস ও ফিকাহর এলেম হতে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

(১) ইমাম আস্-শা'বী (রাহ)। ইমাম আযম প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ব্যবসায়-বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়েন। সাইয়েদুত তাবেয়ী আমের ইবনে শুরাহবিল আস-শা'বী (রাহ) তাঁকে উৎসাহ দিয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। ইমাম শা'বী (রাহ) হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফত কালে (১৭ হি) জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হামাদানের অধিবাসী। পরে কুফায় স্থানান্তরিত হন। তিনি ৫০০ সাহাবীর দর্শন লাভ করেন। তিনি হযরত আলী (রা), ইমরান ইবনে হুসাইন (রা), জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা), আবু হোরায়রা (রা), ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আয়েশা (রা), ইবনে ওমর (রা), ইবনে আমর (রা), আদী ইবনে হাতিম (রা), মুগিরা ইবনে শো'বা (রা), ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা)সহ ৪৮ জন সাহাবা-সাহাবিয়া থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন। তাঁর সূত্রে আবু হানিফা (রাহ)সহ অনেক রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম শা'বী হাদীসের সাথে আছারেও বেশি প্রভাবিত ছিলেন। তিনিই আবু হানিফা (রাহ)-এর প্রধান উস্তাদ ছিলেন এবং দীর্ঘদিন কুফার কাযী ছিলেন। মকহুল (রাহ) ও আবু হুসাইন (রাহ) বলেন, 'শা'বী-এর তুলনায় বড় আলিম ও ফকিহ আমি আর কাউকে দেখি নি। তিনি প্রসিদ্ধ কবি, মুফাসসির ও সিকাহ তাবেয়ী ছিলেন। ইবনে আবু

লায়লা রাহ. (মৃ ৮৩ হি) বলেন, শা'বী সর্বদা হাদীসের অনুসরণ করে চলতেন এবং একজন খোশমেযাজ মানুষ ছিলেন। খতীবে বাগদাদী (রাহ) আলী ইবনুল মদীনী (রাহ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, 'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর এলেমসমূহ আলকামা, আসওয়াদ, হারিস, আমের ও উবাইদা ইবনে কায়েস (রা)-এর ওপর গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। আর এঁদের এলেম দু'ব্যক্তির মধ্যে সমবেত হয়েছে। তাঁদের একজন ইবরাহীম নখয়ী (রাহ) আর অপর জন আমের শা'বী (রাহ)। এ দু'জন ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর যথাক্রমে দাদা উস্তাদ ও উস্তাদ ছিলেন। কাযী হিসাবে তিনি সবাইর সম্মানের পাত্র ছিলেন। তিনি ১০৪ কি ১০৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

(২) ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবু সোলায়মান (রাহ)। তাঁর ডাক নাম আবু ইসমাঈল আল-কুফী, পিতার নাম মুসলিম আল-আশয়ারী। ইমাম আ'যমের অপর বিশিষ্ট শিক্ষক ছিলেন হযরত হাম্মাদ ইবনে আবু সোলায়মান (রাহ)। তিনি সর্বসম্মতিক্রমে হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। তাঁকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর এলেমের সংরক্ষণকারী মনে করা হতো। সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ ও জামে তিরমিযীতে তাঁর বর্ণনাসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। তিনি হযরত আনাস (রা), হযরত যায়িদ ইবনে আওহাব (রা), সায়ীদ ইবনে মুসায়িব (রাহ), ইকরামা (রাহ), আবু ওয়ায়েল (রাহ), ইবরাহীম নখয়ী (রাহ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রাহ) থেকে এলেম অর্জন করেন। তবে ইমাম নাখয়ী (মৃ. ৯৫ হি)-এর ফিকাহয় ইমাম হাম্মাদের সুগভীর পান্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা এ কথা প্রমাণ করে যে, হানাফী ফিকাহর মূল উৎস এবং সেই ফিকাহর ভান্ডার ইমাম হাম্মাদ (রাহ) ইমাম নখয়ী (রাহ) থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। এর প্রমাণ বহন করছে 'আছার' নিয়ে নির্মিত গ্রন্থসমূহ। ইমাম আবু হানিফা (রাহ) তাঁর এই উস্তাদ থেকে দু'হাজারের মত হাদীস বর্ণনা করতেন। ইমাম মা'মার (রাহ) বলেন,যুহরী, হাম্মাদ ও কাতাদার চেয়ে অধিক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি আমার নযরে পড়ে নি। তিনি সিকাহ রাবী এবং ইবরাহীম নখয়ীর সর্বাধিক জ্ঞানবান সঙ্গী ছিলেন। ইমাম নাসায়ী (রাহ)-এর মতে তিনি সিকাহ রাবী, কিন্তু মুরজিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি ১২০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে ইমাম আবু হানিফা (রাহ) ইমাম হাম্মাদের ছাত্রদের পরামর্শে তাঁর দরস-গাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইমাম আ'যম প্রায় ২০ বছর এই উস্তাদের সাহচর্যে থেকে ফিকাহ ও হাদীসের জ্ঞান হাসিল করেন। উস্তাদের জীবিতাবস্থায় তিনি ইমাম হাম্মাদের মাদ্রাসার পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন।

৩। ইমাম আতা ইবনে আবু রিবাহ (রাহ)। তিনি মক্কা মুকাররমার ফকিহ ছিলেন। তিনি আবু মুহাম্মদ আল-কারশী (রা), আয়েশা (রা), ইবনে আব্বাস (রা), আবু হোরায়রা (রা) প্রমুখ সাহাবীদের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতেন। তিনি প্রায় দু'শো সাহাবীর সাথে মিলিত হয়েছিলেন। তাঁর থেকে আওযায়ী, ইবনে জুরাইজ, আবু হানিফা, লাইস (রাহমাতুল্লাহ আলাইহিম) প্রমুখ রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সিকাহ রাবী, ফকিহ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, "হে মক্কাবাসীরা 'তোমরা আমার কাছে আসছো, অথচ তোমাদের মাঝে আতার মত ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে"। তিনি অত্যন্ত বাগ্মী

ও পন্ডিত লোক ছিলেন। ইমাম আবু হানিফা (রাহ) বলেন, আমি আতা (রাহ) এর চেয়ে উত্তম মানুষ আর দেখি নি। তিনি সাধারণত নীরব থাকতেন। যখন কথা বলতেন, মনে হতো যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে সাহায্য করা হচ্ছে। তিনি ১১৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইমাম আবু হানিফা (রাহ) তাঁর সান্নিধ্যে সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে কোরআনের তাফসীর বিষয়ে মত বিনিময় করতেন এবং তাঁর থেকে এলমুল কোরআন শিক্ষা করতেন। হাম্মাদ (রাহ)-এর ছাত্র থাকা কালে ইমাম আযম অন্যান্য উস্তাদের নিকট হতে জ্ঞান অর্জন করতেন, এতে কোন বাধা ছিল না।

৪। ইমাম সালামা ইবনে কুহাইল (রাহ) ছিলেন একজন মশহুর মুহাদ্দিস এবং তাবেয়ী। তিনি সাহাবী জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা), আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা), আবু তোফায়েল (রা) প্রমুখের নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করতেন। ইমাম শাফিয়ীর উস্তাদ ইমাম সুফিয়ান উয়াইনা বলেছেন, 'সালামা দীন ইসলামের একটি স্তম্ভ'। ইবনে মাহদী বলতেন, কুফাতে চার ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা সঠিক বর্ণনাকারী যেমন মনসুর, সালামা, আমর ইবনে মুররা আর আবু হাসীন। সালামা ১২৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

৫। ইমাম আবু ইসহাক সাবিয়ী (রাহ)। তিনি একজন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), ইবনে যোবায়ের (রা), নো'মান ইবনে বশির (রা), যায়িদ ইবনে আরকাম (রা) প্রমুখ সাহাবী হতে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। জরাহ ও তা'দীসের ইমাম আযলী (মৃ.২৬১হি) বলেছেন, আবু ইসহাক ৩৮ জন সাহাবী হতে হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। আল্লামা নূদী (রাহ) সে সব সাহাবীর নাম তাঁর 'তাহযিবুল আসমা' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, যাদের নিকট থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন। ইমাম তুজারীর উস্তাদ ইমাম আলী ইবনুল মদীনী (রাহ) বলেছেন, "আবু ইসহাকের হাদীসের শিক্ষক কমবেশি তিনশো ছিলেন"। ইমাম আবু দাউদ তায়ালিসী (রাহ) বলেছেন যে, তিনি ইবনে মাসউদ (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর হাদীস সম্বন্ধে সম্যক অবগত ছিলেন। তাঁর অধস্তন অনুসারীদের সূত্রে সিহাহ সিত্তাহয় অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি ১২৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৬। ইমাম সিমাক ইবনে হারব (রাহ) ছিলেন বড় মাপের একজন তাবেয়ী ও মুহাদ্দিস। ইমাম সুফিয়ান সাওরী, রাহ (মৃ. ১৬১ হি) বলেছেন, 'সিমাক হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে কখনো ভুল করেন নি'। ইমাম নিজেও বলেছেন, ' আমি আশি জন সাহাবীর সাথে মিলিত হয়েছিলাম। তিনি ১২৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

৭। ইমাম মাহারিব ইবনে দিসার (রাহ)। তিনি প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হিসাবে সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) ও জাবির (রা) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। প্রসিদ্ধ হাদীসবিদ আল্লামা দারাকুতনী, নাসায়ী, আবু হাতিম প্রমুখ মাহারিবকে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত বলেছেন। তিনি কুফা শহরের কাযীর পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ১১৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

৮। ইমাম হিশাম ইবনে ওরওয়া (রাহ)। তিনি ছিলেন সাহাবী যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা)-এর পৌত্র। তিনি পিতা ও চাচা আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) এবং আরও অনেক সাহাবী হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, ইমাম মালিক, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা প্রমুখ তাঁর শিষ্য ছিলেন। ইবনে সা'দ তাঁকে বিশ্বস্ত ও ইমামুল হাদীস বলেছেন। ইমাম মালিক, আবু হানিফা ও শো'বা তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সিকাহ রাবী ছিলেন। তিনি ৬১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৯। ইমাম সোলায়মান ইবনে মিহরান ওরফে আ'মাশ (রাহ)। তিনি ছিলেন কুফা শহরের একজন প্রসিদ্ধ ইমাম। তিনি আনাস ইবনে মালিক (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা)-এর নিকট হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সুফিয়ান সাওরী (রাহ) ও শো'বা ইবনে হাজ্জাজ (রাহ) তাঁর শাগরিদ ছিলেন। তিনি ১৪৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

১০। ইমাম আমর ইবনে দীনার (রাহ) আল-মক্কী। তিনি ছিলেন মক্কার শ্রেষ্ঠ আলিমদের অন্যতম। ৪৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণকারী তিনি ছিলেন মক্কার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব, হাদীসের হাফিয, ইমাম ও ফকিহ। ইমাম যাহাবী ও ইমাম নওয়াবী তাঁকে শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বস্ত ইমাম বলেছেন। তাঁরা তাঁর মহত্ত, নেতৃত্ব ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে একমত। তিনি বহু হাদীস স্মৃতিতে ধারণ করতেন ও মুখস্থ বর্ণনা করতেন। তিনি বহু সাহাবী ও প্রথম শ্রেণীর তাবেয়ীদের থেকে হাদীস শোনেন। বিশারদদের মতে তাঁর হাদীসের স্থান অনেক উর্ধ্বে। তিনি মূল শব্দসহ হাদীস বর্ণনা করা জরুরী মনে করতেন না। নিজের ভাষায় তিনি শ্রুত হাদীসের অর্থ ও ভাব বর্ণনা করতেন। হাদীস শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞানের কারণে তিনি এর একজন নির্ভরযোগ্য সূত্রে পরিণত হন। তিনি হাদীস লেখে রাখা পছন্দ করতেন না। তাঁর ব্যাপক জ্ঞান তাঁর ছাত্র-শিষ্যের গন্ডিকে ভীষণভাবে প্রশস্ত করে দেয়। মক্কা, মদীনা, কুফা প্রভৃতি স্থানের বিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁর ছাত্র ছিলেন। কোরআন-হাদীস গবেষণা করে সমস্যার সমাধান ও আইন-কানুন বের করার ক্ষেত্রে তাঁর ছিল ইজতিহাদের বিশেষ যোগ্যতা ও স্বকীয়তা। তিনি তিরিশ বছর যাবত ফাতাওয়া প্রদান করেন। মক্কায় তখন তাঁর মত বড় আলিম, বড় ফকিহ ও হাদীসের বড় হাফিয আর কেউ ছিলেন না। তিনি ১২৬ হিজরীতে দুনিয়া ত্যাগ করেন। তিনি অত্যন্ত আবেদ ব্যক্তি ছিলেন। রাতকে তিন ভাগ করে এক ভাগে ঘুমাতেন, এক ভাগে হাদীস বর্ণনা করতেন, আরেক ভাগে এবাদত করতেন।

১১। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (রাহ)। তিনি ছিলেন কোরেশ বংশের তায়মী শাখার সন্তান এবং হযরত আয়েশা (রা)-এর মামাতো ভাই। জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার চর্চায় তিনি অতি উঁচু স্তরের মানুষ ছিলেন। ইমাম যাহাবী (রাহ) তাঁকে 'আল-ইমাম' ও 'শায়খুল ইসলাম' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "তাঁর বিশ্বস্ততা এবং এলেম ও আমলে অগ্রবর্তিতার ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য রয়েছে।" তিনি ছিলেন আল-কোরআনের কারীদের নেতা এবং 'সত্য ও সততার খণিসদৃশ'। সত্য-নিষ্ঠ ব্যক্তিরাই কেবল তাঁর নিকট আসতেন। তিনি মুখস্থ-শক্তি, দৃঢ়তা, তাকওয়া-পরহিযগারী ও দুনিয়া-বিরাগী মনোভাবের চূড়ান্ত পর্যায়ের মানুষ ছিলেন। আল্লাহতায়ালার ভয় তাঁর অন্তরের গভীরে শিকড় গেঁড়েছিল। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের সময় তাঁর চোখ হতে অশ্রুধারা জারি হতো। তিনি তাহাজ্জুদ

নামাযে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতেন। " তাদের জন্য আল্লাহর নিকট হতে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করে নি" (সূরা যোমার-৪৭ আয়াত) পড়ে তিনি মরণের আগ থেকে ভীষণ ভীত হয়ে পড়েন। না জানি তাঁর এমন কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ে যা তিনি চিন্তাও করেন নি। তাঁর নিকট কেউ হাদীস জিজ্ঞেস করলে তিনি কাঁদতেন। তাঁকে দেখলে অন্যের নফ্সও পরিশুদ্ধ হতো।

ইমাম মুহাম্মদ (রাহ) ছিলেন এলমে হাদীসের 'হুজ্জত' (দলীল-প্রমাণ) স্তরের ব্যক্তি। তিনি সাহাবা ও প্রধান তাবেয়ীদের এক জামাত হতে হাদীস শোনেন। সাহাবিগণ হলেন আবু আইউব আনসারী (রা), আনাস ইবনে মালিক (রা), জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা), আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা), আবু কাতাদা (রা), সাফিনা (রা), আয়েশা সিদ্দিকা (রা) প্রমুখ। সাহাবী ও তাবেয়ীদের সূত্রে তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন। তাঁর কিছু মুরসাল হাদীস রয়েছে। হাদীসবিদদের মতে তাঁর মুরসাল হাদীস অন্যান্যদের মারফু হাদীসের চেয়েও নির্ভরযোগ্য। তিনি ফিকাহয় ও ফাতাওয়ায় পারদর্শী ছিলেন। মদীনার তাবেয়ী মুফতিদের মাঝে তিনিও গণ্য হতেন। তিনি ১৩১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর হাদীস শিক্ষার দ্বিতীয় মারকায ছিল বসরা শহরে। সেখানে তিনি বহু বার সফর করেছেন। ইমাম হাসান বসরী, শো'বা ও কাতাদা সেখানে হাদীসের তা'লিম দিতেন। ইমাম আবু হানিফা (রাহ) কাতাদা (রাহ)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং শো'বা (রাহ)-এর নিকট হতেও হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ফাতাওয়া দানের অনুমতি লাভ করেন। কাতাদা (রাহ) ও শো'বা (রাহ) উভয়েই উঁচু স্তরের আলিম ও বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁরা দু'জনেই অনেক বিখ্যাত সাহাবায়ে কিরাম হতে হাদীস শুনে বর্ণনা করতেন এবং ছাত্রদের শিক্ষা দান করতেন।

ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ) জীবনে অপূর্ব সাধনা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে এবং অনেক কষ্ট স্বীকার করে রাসূলুল্লাহ (ছা)-এর পবিত্র হাদীস শিক্ষা করেছেন। এসব হাদীসের মর্মানুসন্ধান এবং এসবের প্রচার-প্রসার ও মুসলমানদের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগের জন্য তিনি হাদীস চর্চার এক অপূর্ব পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তীক্ষ্ন মেধা ও আল্লাহ-প্রদত্ত প্রতিভা বলে কোরআন ও হাদীসের গভীর চর্চায় মনোনিবেশ করেন। এ পর্যায়ে তিনি প্রধানত কয়েকটি পদ্ধতি গ্রহণ করেন। (১) কোরআন-হাদীসের আদেশ-নিষেধ অর্থাৎ আহকামসমূহ নির্ধারণ করার জন্য হাদীসের ব্যাপক চর্চা করেন। (২) মুসলিম বিশ্বে হাদীস প্রচারের জন্য হাজার হাজার ছাত্রকে তিনি হাদীসের পাঠদান করেন এবং বাস্তবে হাদীসের প্রয়োগ শিক্ষাদান করেন। তাঁর প্রথম প্রচেষ্টার ফলই হলো ফিকাহ শাস্ত্রের প্রচলন অর্থাৎ জীবনের সব বিষয়ে হাদীসের প্রয়োগ-প্রক্রিয়া প্রদর্শনের জন্য মাসয়ালা-মাসায়েল নির্মাণ করা তথা ফিকাহ শাস্ত্রের গোড়াপত্তন করা। আর হাদীস চর্চার তৃতীয় যে পদ্ধতিটি তিনি গ্রহণ করেন তা ছিল কিতাব রচনার ও সংকলনের মাধ্যমে হাদীসের বিস্তার ঘটানো। এ পর্যায়ে সুযোগ্য ছাত্রগণই তাঁর সংগৃহীত হাদীসগুলোর পুস্তকায়ন সম্পন্ন করেন। বর্তমানে 'মুসনাদে আবু হানিফা (রাহ)' ও 'কিতাবুল আছার' নামে যেসব হাদীসের গ্রন্থ রয়েছে তা সবই তাঁর নিবেদিত-প্রাণ

শাগরিদগণ প্রস্তুত করেছেন, প্রচার করেছেন। আজও সে সব গ্রন্থ বিশ্বময় প্রচারিত হচ্ছে। বহু হাদীস সংগ্রহ করে বিপুলভাবে ও অপূর্বভাবে প্রচারের জন্য ইমাম আবু হানিফা (রাহ) হলেন ইমামুল মুহাদ্দিসীন ও শাহানশাহে হাদীস।

১। ফিকাহ শাস্ত্রের বিন্যাসে হাদীসের প্রয়োগ

ইমাম আবু হানিফা (রাহ)ই সর্বপ্রথম বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে যুক্তি-ভিত্তিক শরয়ী আহকাম উদ্ভাবন করেছিলেন। তাঁর সংগৃহীত হাদীস কয়েকটি সিন্ধুকে সংরক্ষিত থাকতো। প্রয়োজন মত সেসব হতে হাদীস বের করে তিনি ব্যবহারিক জীবনের জন্য হাদীস ভিত্তিক মাসয়ালা উদ্ভাবন করতেন। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে তাঁর হাদীস বর্ণনার বহুল বিকাশ ঘটে নি, যেমনটা হয়েছিল হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা)-এর বেলায়। তাঁরা মুসলিম জনগণের উপকার সাধনে শাসনকার্যে ব্যস্ত ছিলেন বলে তাঁদের হাদীস বর্ণনার বিকাশ তেমন ঘটে নি, যতটুকু অন্যান্যদের এমনকি কম বয়স্ক সাহাবীদের দ্বারা ঘটেছিল। এমনিভাবে হাদীস হতে আহকাম উদ্ভাবনে ব্যস্ত থাকায় ইমাম মালিক (রাহ) ও ইমাম শাফিয়ী (রাহ) হাদীস বর্ণনায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন নি যেমন লাভ করেছেন মুহাদ্দিস আবু যুরআ, রাহ. (২০০-২৬৪হি) ও ইবনে মঈন (রাহ)। তাছাড়া 'দিরায়াত' (বুদ্ধি প্রয়োগ) অবলম্বন না করে বেশি সংখ্যক রিওয়ায়েত (হাদীস বর্ণনা) করা কৃতিত্বের বিষয় হয় না।

ইসলামে আহকাম ও মাসয়ালা উদ্ভাবনের সূচনা করেন শেষ নবী (ছা) নিজেই। তিনি বলেছেন, 'তোমরা আমার কাছ থেকে ফারাইয ও আহকাম জেনে নাও। আমি তো শীঘ্রই চলে যাবো'। এজন্য সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)সহ অনেকে এবং পরবর্তীতে তাবেয়ীদের অনেকে হাদীসের ওপর গভীর গবেষণা, অধ্যয়ন এবং সে নিরীখে শরয়ী আহকাম ও মাসয়ালা উদ্ভাবনের কাজ শুরু করেন। কোরআন-হাদীসের পঠন-পাঠন, শিক্ষাদান ও গবেষণার কাজ সাহাবা কিরামের যুগে শুরু হলেও তা তখন বিশেষ বিশেষ বিষয়ের আকারে রূপায়িত হয় নি। এটি শরয়ী আহকামের বিষয়-ভিত্তিকে রূপায়িত হয় তাবেয়ীদের শেষ যুগে। বিশেষত ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ)-এর সময়ে। তিনিই প্রথম ব্যক্তিত্ব, যিনি হাদীস সংকলনের নীতি এবং হাদীসগুলোকে বিভিন্ন অধ্যায়-অনুচ্ছেদের ওপর বিন্যস্ত করে উপস্থাপনের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তিনিই এলমে ফিকাহর বুনিয়াদ স্থাপন, এর নীতিমালা নির্ধারণ ও মাসয়ালা উদ্ভাবনের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এ ব্যাপারে তিনি একক মহান পথিকৃৎ। পরবর্তীতে উম্মতের মাঝে ইমাম মালিক,ইমাম শাফিয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলসহ আরও অনেক মুজতাহিদের আগমন ঘটে। কিন্তু যুগের অগ্রবর্তিতা, ফিকাহর পরিপূর্ণতা ও অনুসারীদের সংখ্যার দিক দিয়ে বিচার করলে অন্য কোন মুজতাহিদকে তাঁর সমকক্ষ বলার সুযোগ নেই। তাই সৌদী আরবসহ মুসলিম বিশ্বের সব দেশ তাঁকে 'ইমাম আ'যম' বলে স্বীকার করে নিয়েছে।

ইমামুল মুহাদ্দিসীন ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ)-এর অসাধারণ প্রতিভা, প্রজ্ঞা, কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার ফলে মুসলিম জাতি ইসলামের শাশ্বত শরয়ী আইন-কানুন আজ বিধিবদ্ধ আকারে পেয়ে ধন্য হয়েছে। তাঁরই এই অসামান্য অবদানের ফলে যুগ যুগ

ধরে কোটি কোটি মুসলিম এবাদত, মো'য়ামিলাত ও মো'য়াশিরাত, উকুবাত ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে ইসলামকে অতি সহজে অনুসরণ করে আসছে। ইসলামী বিধি-বিধান যদি বর্তমান আকারে বিন্যস্ত না থাকতো তাহলে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা সাধারণ মুসলমানের জন্য খুবই কষ্টকর হতো।

আল্লাহ-প্রদত্ত জ্ঞান আহরণ ক্ষমতায় তিনি রাসূলুল্লাহ (ছা)-এর হাদীসকে সকলের চেয়ে ভাল বুঝতেন। এর কারণ, তিনি হাদীসের শব্দের পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে আহকামের ইল্লাত বের করতেন। তিনি হাদীসের বাহ্যিকতার ওপর নির্ভর না করে এর প্রকৃত মর্ম অনুসন্ধান করতেন ও তা থেকে ইল্লাত বের করতেন। সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনা ও উদাহরণের সাথে তিনি সম্পর্ক স্থাপন করতেন এবং বিধিবদ্ধ বিধানকে মূল ভিত্তি সাব্যস্ত করে সামঞ্জস্য ও সমপর্যায়ের সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ের জন্য ভিত্তি রচনা করতেন। (ইল্লাত হলো কিয়াসের মূল ভিত্তি। এটা সেই উপযোগী গুণকে বলা হয় যা বিধানের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়। যেখানে এই গুণ পাওয়া যায় সেখানে বিধানও পাওয়া যায়। আর দুর্বল গুণটিকে ত্যাগ করে শক্তিশালী গুণকে কার্যকরী করাই হলো 'ইসতিহসান সদৃশ কিয়াস')।

ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর অনুগামী অনুরাগী ও বিরোধী সবাই এ বিষয়ে একমত যে, তিনি মুসলিম জাতির একজন অবিসংবাদিত ইমাম ও মুজতাহিদ ছিলেন। মুজতাহিদের শর্তসমূহের একটি হলো, তিনি অবশ্যই আহকাম সম্পর্কিত সকল হাদীস পূর্ণভাবে জ্ঞাত হবেন। অবশ্য আহকাম সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যা প্রায় এক হাজার বা এর অধিক। তাঁর মাযহাবের হাজার হাজার ফিকহী মাসয়ালা সম্পূর্ণরূপে আহকাম সম্পর্কিত বিশুদ্ধ হাদীসের অনুকূল। ইমাম আবু হানিফা (রাহ) থেকে বর্ণিত লক্ষ লক্ষ মাসয়ালার সবই এসব হাদীস থেকে উদ্ভাবিত। তবে এসব মাসয়ালা তাঁর কোন একক গবেষণা বা অনুধ্যানের ফলস্বরূপ উদ্ভাবিত হয় নি।

ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর চিন্তাশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর ও সুগভীর। গবেষণাকালে প্রকাশ্য দলীল ও মূল ভাষ্যের প্রকাশ্য শব্দাবলীর মধ্যে তিনি সীমাবদ্ধ থাকতেন না, বরং নিরলস জ্ঞানগর্ভ গবেষণা ও পর্যালোচনা চালিয়ে যেতেন। তাঁর ছিল এক দার্শনিক-সুলভ চিন্তাশক্তি। তজ্জন্যই তিনি জীবনের প্রথমে 'এলমে কালাম'-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যাতে চিন্তা-গবেষণা ও পর্যালোচনা দ্বারা সে দার্শনিক তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারেন এবং সেই তৃষ্ণাই তাঁকে গভীরভাবে হাদীস অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিয়ে দেয়। তিনি হাদীসের শাব্দিক বর্ণনা থেকে গভীর মর্মার্থ বের করতেন। পবিত্র হাদীসের আলোকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করার জন্য দীর্ঘ ত্রিশ বছর কাল পর্যন্ত তিনি এ ব্যাপারে সাধনা করেন।

ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর পূর্বে ফিকাহ বা ইসলামী আইন শাস্ত্র মজবুত বুনিয়াদের ওপর গড়ে উঠে নি। তিনি হাদীস দ্বারা আহকাম প্রতিপন্ন ও আইন-কানুন প্রতিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলেন। ইসলামী আইন-কানুন প্রণয়নের প্রয়োজন তিনি তীব্রভাবে অনুভব করলেন। এই প্রয়োজন মিটানোর জন্য তিনি চিন্তা-ভাবনা ও কিয়াস করার তাগিদ অনুভব করলেন। এই কঠিন পরিস্থিতি মুকাবিলা করার কঠিনতর সাধনায় তিনি যে

অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ও মেধাশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন এর ফলেই তিনি জনগণের কাছে 'ইমাম আহলে রায়' হিসাবে অভিষিক্ত ও পরিচিত হয়েছিলেন।

তাঁর খ্যাতি লাভের আরও একটি কারণ ছিল। তখনকার মুহাদ্দিসগণ হাদীস রিওয়ায়েত করার সময় দিরায়াত বা প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ণয় করা সম্বন্ধে আদৌ চিন্তা করতেন না। হাদীস দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ণয় ও নানা সমস্যার মুকাবিলায় সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে বের করার অসাধারণ শক্তির বলে তিনি যুগাগত সব সমস্যাবই সমাধান দিতেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ শাস্ত্র আকারে লেখার নিয়ম তিনিই প্রথম চালু করেন। যুক্তির বিচারে সঠিক প্রতিপন্ন না হলে তিনি অনেক হাদীস গ্রহণ করেন নি। দিরায়াত ও রায় অর্থাৎ যুক্তি প্রমাণ ও বিচার-বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণীয় কোন তথ্য এবং সে অনুসারে সিদ্ধান্ত প্রদান, এ দু'টি প্রায় সমার্থক বিষয়। তা মানব মনের স্বাভাবিক শক্তি। তাঁর মধ্যে এ দু'টি শক্তির অতুলনীয় সমাবেশের ফলেই ইমাম আ'যম তুলনাহীন খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

এখন প্রশ্ন হলো হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা (রা)-এর মর্যাদা কোন স্তরের ছিল? এ প্রশ্নের জওয়াব পাওয়া যাবে তাঁর প্রথম জীবনে হাদীস শিক্ষার জন্য ও সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন মারকাযে গমন ও বিভিন্ন হাদীসবিদ তাবেয়ীদের নিকট ধর্ণা দেয়ার বিষয়টি অনুধাবন করলে। মক্কা, মদীনা, কুফা, বসরা প্রভৃতি স্থানের খ্যাতিমান হাদীসবিদ উস্তাদদের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন তিনি। একই সাথে শাগরিদদের কথাও মনে রাখা দরকার। জ'রাহ ও তা'দীলের ইমাম ইয়াহিয়া ইবনে সায়ীদ আল-কাত্তান, জামে কবীর প্রণেতা আবদুর রায্যাক ইবনে হুমাম, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের উস্তাদ ইয়াযিদ ইবনে হারুন, সনদ ও দিরায়াতের অদ্বিতীয় পন্ডিত ওকী ইবনে জাররাহ, হাদীস শাস্ত্রের আমিরুল মু'মিনীন আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, এসব অমর মনীষী ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর শিষ্য হয়ে নিজেদের ধন্য মনে করেছেন। এসব মহাপন্ডিত, যাঁরা নিজেরাই হাদীসের ইমাম ছিলেন, তাঁরা কি কোন সাধারণ লোকের সামনে মাথা নত করেছিলেন?

আরও বিবেচ্য বিষয় হলো যে, ইমাম আবু হানিফা (রাহ) ছিলেন একজন মুজতাহিদ। একথা সর্ববাদী সম্মত। বিগত সাড়ে বারো শো বছরের মধ্যে প্রায় সব উলামায়ে হাদীস তা স্বীকার করে নিয়েছেন। ইমাম বগভী, ইমাম রাফেয়ী, আল্লামা নূদী প্রমুখ বিদ্বানগণ 'মুজাতাহিদ' এর সংজ্ঞা এভাবে নির্ধারণ করেছেন, 'মুজতাহিদ হলেন ওই ব্যক্তি যিনি কোরআন, হাদীস, মাযাহিবে সালফ, আভিধানিক জ্ঞান ও কিয়াস, এই পাঁচটি বিষয়ে গভীর জ্ঞান রাখেন। অর্থাৎ শরীয়তের মাসয়ালা সম্পর্কে কোরআনের যেসব আয়াত রয়েছে, যে সব হাদীস রাসূলুল্লাহ (ছা) থেকে প্রমাণিতভাবে এসেছে, যে পরিমাণ আভিধানিক জ্ঞানের তথা ভাষানীতি ও অলংকার জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, প্রাচীন বিদ্বানগণের যে সব কথা বিদ্যমান আছে ও কিয়াসের নীতিমালা যিনি জানেন, তিনিই মুজতাহিদ। এই পাঁচটি কারো না থাকলে বা কম থাকলে তিনি মুজতাহিদ নন, তার ইজতিহাদের অধিকার নেই। তাকে অন্যের তাকলিদ বা অনুসরণ করতে হবে।

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ও তাঁর ফিকাহ" শীর্ষক গ্রন্থে ড. হানাফী রাযী নবী (ছা) ও সাহাবী (রা)দের ইজতিহাদের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে ইজতিহাদ সম্পর্কে অপরিহার্য যোগ্যতাসমূহ নিম্নরূপ নির্ধারণ করেছেন।

১। পবিত্র কোরআনের জ্ঞান সম্পর্কে দূরদর্শিতা ও ব্যুৎপত্তি, একই সাথে কোরআন উপলব্ধির ঈমানী বিচক্ষণতা অর্জন।

২। হাদীসের শ্রেণী বিন্যাস ও সনদসহ গোটা সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন।

৩। পূর্ববর্তী মুজতাহিদদের ইজতিহাদ প্রসূত মাসয়ালা ও এর দলীল সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন।

৪। রূহ-ই শরীয়ত ও দীন-ই-ইসলামের মৌল দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া এবং সে দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নিজেকে গড়ে তোলা।

৫। আরবী সাহিত্য ও সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে পূর্ণ অভিজ্ঞান লাভ।

৬। বিশুদ্ধ আমল ও সুন্নতের একনিষ্ঠ অনুসারী হওয়া। কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা, সগিরা গুনাহর পুনরাবৃত্তি না ঘটানো।

৭। হক ও সত্য প্রকাশের জন্য সৎসাহস থাকা। কোনরূপ হুমকি ও প্ররোচনার মুখে দমে না যাওয়া।

হযরত হাসান বসরী, রাহ (মৃ.১১০ হি) বলেন, মুজতাহিদ ফকিহর জন্য আরও পাঁচটি গুণের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। যেমন (ক) পার্থিব লালসা পরিহার করা। (খ) আখিরাতের উৎকর্ষতা ও কামিয়াবীর জন্য নির্দ্বিধায় স্বীয় শক্তি ও সময় ব্যয় করা। (গ) সব ব্যাপারে ইলাহী নির্দেশের পাবন্দী করা। মুসলিম জন-সাধারণের মান-ইজ্জত ও হক-হুকুক সংরক্ষণকে স্বীয় দায়িত্ব মনে করা। (ঘ) দীনী বিষয়ে ঈমানী দূরদর্শিতার অধিকারী হওয়া। (ঙ) মুসলমানদের উপকারের জন্য নিজ স্বার্থকে কুরবানী করতে অভ্যস্ত হওয়া। ইমাম গায্যালী, রাহ. (মৃ. ৫০৫ হি) বলেন, পার্থিব ব্যাপারেও এক জন ফকিহ সব সময় মাখলুকের উপকার সাধনে সচেষ্ট থাকবেন।

আল্লাহতায়ালার অসীম করুণায় ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ)-এর এ সব গুণ পুরোপুরি হাসিল হয়েছিল। তাঁর সম্পর্কে বিশ্ব-মনীষীদের উক্তিসমূহই এর প্রমাণ বহন করছে। (গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে খালদুন (৭৩২-৮০৮ হি) তাঁর 'উলূমুল হাদীস' গ্রন্থে মুজতাহিদদের ব্যাপারে লেখেছেন, "অবিবেচক বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের কথা এই যে, মুজতাহিদদের মধ্যে কারো কারো হাদীসে জ্ঞান কম ছিল। এজন্য তাঁদের রিওয়ায়েতের সংখ্যা কম। কিন্তু এ ধারণা ভুল। স্বাভাবিকভাবেই মহান ইমামদের সম্বন্ধে এমন ধারণা পোষণ করা কোনভাবেই উচিত নয়। কারণ শরীয়তী আইন কোরআন ও হাদীস থেকে গৃহীত। যে ব্যক্তি হাদীস শাস্ত্রে কম অভিজ্ঞ তাঁর পক্ষে চেষ্টা ও তালাশ করে ধর্মীয় আইন-কানুন সঠিকভাবে প্রণয়ন করা অপরিহার্য"। এর পরেই আল্লামা ইবনে খালদুন (রাহ) লেখেছেন, "হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর মর্যাদা বড় মুজতাহিদদের পর্যায়ে। এর প্রমাণ হলো যে, তাঁর মাযহাব মুহাদ্দিসগণেরও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় এবং তা গ্রহণ বা বর্জন সম্বন্ধে আলোচিত হয়"।

অধিকাংশ মুহাদ্দিস একথা স্বীকার করেছেন। আল্লামা যাহাবী (রাহ), যিনি পরবর্তী মুহাদ্দিসদের নেতা বলে স্বীকৃত, হাদীসের হাফিযদের সম্পর্কে তিনি লেখেছেন, তা ওই সব লোকের জীবন আলোচনা যাঁরা নবীর এলেম বহনকারী এবং যাঁদের ইজতিহাদ বিশ্বস্ত।

ইমাম আবু হানিফা (রাহ)কে তিনি হাদীসের হাফিয বলে গণ্য করেছেন। হাফিয আবুল মাহাসিন (রাহ) তাঁর কিতাবে ইমাম আবু হানিফা (রাহ)কে 'অনেক হাদীসের বিশারদ পন্ডিত' ও 'হাদীসের হাফিয' বলে উল্লেখ করেছেন। এরূপ মন্তব্য আরও মুহাদ্দিসগণ করেছেন। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর জ্ঞান কত গভীর আর এ বিষয়ে তাঁর মর্যাদা কত উচ্চে ছিল। আর যে কারণে তাঁর মর্যাদা সমসাময়িক বিদ্বানগণের তুলনায় অত্যধিক বেশি ছিল সেটাই হলো তাঁর প্রধান কৃতিত্ব অর্থাৎ শরীয়তের আইন প্রণয়নে হাদীসের বিচার-বিশ্লেষণ ও তা প্রমাণে-ব্যবহারে নীতি নির্ধারণ করা। এ প্রসঙ্গে হাদীসগুলোর শ্রেণীভেদ করাও তাঁরই বৈশিষ্ট।

ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর পরে এলেম এর অনেক উন্নতি হয়েছে। সহীহ হাদীসের হয়েছে, উসূলে হাদীস শাস্ত্র শক্ত বুনিয়াদের ওপর গড়ে উঠেছে এবং এ সম্বন্ধে বহু কিতাব প্রণীত হয়েছে। যুগের গতিপ্রবাহ এতো উন্নতি লাভ করেছে যে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন যুগ মানস সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু হাদীসের বিচার-বিশ্লেষণ ও শ্রেণী-বিন্যাসের যে পদ্ধতি ইমাম আ'যম (রাহ) উদ্ভাবন করে গিয়েছেন, বিবর্তনের চমক তা অতিক্রম করতে পারে নি। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা আরও বোধগম্য হবে, যদি আমরা হাদীস শাস্ত্র সৃষ্টির গোড়ার দিকে নযর দেই। রিওয়ায়েতের সিলসিলা কেমনভাবে পয়দা হলো, কোন কোন যুগে এর কি কি পরিবর্তন ঘটলো, সে সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকলে সহজেই বোঝা যাবে যে, হাদীস বিষয়ে ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ)-এর অবদান ছিল কত বিরাট আর সমসাময়িক বিদ্বানদের মধ্যে তাঁর বিশিষ্টতা ছিল কত উচ্চে। হাদীসের শ্রেণী-বিন্যাস করা এবং প্রত্যেক শ্রেণীর গুরুত্ব অনুযায়ী শরীয়তী আহকামের গুরুত্ব নির্ধারণ করা ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ)-এর আর একটি অতি মূল্যবান সংযোজন।

শরীয়তী আহকামের প্রথম উৎস হলো আল-কোরআন। কারো এ সম্বন্ধে আপত্তি করার কোন অধিকার নেই। কোরআনের পর দ্বিতীয় উৎস হলো আল-হাদীস। মূলত হাদীসের গুরুত্ব সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠতে পারে না। কারণ কোরআনকে বলা হয় ওহীয়ে মাতলু, পাঠযোগ্য ওহী আর হাদীসকে বলা হয় ওহীয়ে গায়ের মাতলু বা পাঠযোগ্যাতীত ওহী। যা কিছু বিভিন্ন ও মতভেদ তা হলো হাদীসের প্রমাণিকতা সম্বন্ধে। যদি কোন হাদীস নির্ভুল ও নিঃসন্দেহভাবে বর্ণিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছা) পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবে সেই হাদীসকে কোরআনী হুকুমের পর্যায়ভুক্ত মানতে হবে। বর্ণনাকারীদের ধারার মধ্যে কোনরূপ গোলযোগ ঘটলে তার হুকুমও কম গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে। এই হিসাবে হাদীসগুলোকে সহীহ, হাসান, যয়ীফ, মশহুর, গরীব ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। মুহাদ্দিসগণ শুধু যয়ীফ হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করে অন্যগুলোকে প্রমাণে ব্যবহারযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহ) অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী ফকিহ বা আইনবিশারদ ছিলেন। তিনি হাদীসের তিনটি শ্রেণী স্থির করেছিলেন। প্রথম, মোতাওয়াতির অর্থাৎ যে হাদীসের নির্ভুল বর্ণনা শেষ বর্ণনাকারী হতে সঠিকভাবে রাসূলুল্লাহ (ছা) পর্যন্ত পৌঁছেছে। দ্বিতীয়, মশহুর অর্থাৎ যে হাদীসের বর্ণনা শেষ বর্ণনাকরী হতে রাসূলুল্লাহ (ছা) পর্যন্ত নির্ভুল ও সঠিকভাবে পৌঁছে নি। তৃতীয়, আহাদ অর্থাৎ যে সমস্ত হাদীস প্রথম দু'টির কোন পর্যায়েই পড়ে না। এই তিন শ্রেণীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আহকামের গুরুত্ব সমান হয় এরূপ নীতি নির্ধারণ

তিনিই প্রথম করেছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য অনেক বিদ্বান ব্যক্তি ওই সব নীতির পক্ষে বা বিপক্ষে অনেক কথা বলেছেন। পরবর্তী বিদ্বান ব্যক্তিরা হাদীস সংগ্রহ ও এর শ্রেণীভেদের ব্যাপারে অনেক গবেষণা করেছেন। তবুও সেসব রীতিনীতির পথিকৃৎ ছিলেন ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহ), এ কথা সহজেই বলা চলে।

হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর সবচে' বড় কৃতিত্ব ছিল উসূলে দিরায়াত কায়েম করা । হাদীসের সত্যাসত্য নির্ণয় ও তা আইন প্রণয়নের কাজে ব্যবহৃত হওয়া এই দিরায়াতের নীতি দ্বারা সহজসাধ্য হয়ে পড়ে। পূর্বে আলিমগণ হাদীসের রিওয়ায়েতের দিকে যে পরিমাণ গুরুত্ব ও দৃষ্টি দান করতেন,তা বিচারের প্রতি সে পরিমাণ দৃষ্টি দিতেন না। দিরায়াত এর নীতি এরূপ, যখন কোন ঘটনা (হাদীসে) বর্ণনা করা হয়, তখন উক্ত ঘটনার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করে, চিন্তা করে দেখতে হবে উক্ত ঘটনা মানব-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা, সময়ের গতি-প্রকৃতি অনুসারে উক্ত ঘটনা ঘটা আদৌ সম্ভব কিনা এবং মানুষের সাধারণ ও সুস্থবুদ্ধি তাকে বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করে কিনা। এসব মাপকাঠিতে যদি না উৎরায় তবে উক্ত বর্ণনা সন্দেহযুক্ত মনে করতে হবে। বর্ণনা বিচারের এই মাপকাঠি হাদীসের সত্যাসত্য নির্ণয়ে খুবই ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছিল। অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা (রাহ) যে সব নীতি হাদীস বিচারের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন সে সবের কিছু এরূপ, যে হাদীস সুস্থ বিচার বোধের নিকট গ্রহণযোগ্য নয় তা বিবেচনারও যোগ্য নয়। পরবর্তী অনেক আলিম এই নীতিকে আরও মার্জিত করেছিলেন। হাদীস শাস্ত্রের বড় বিশেষজ্ঞ আল্লামা আবুল ফারায জামালুদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনুল জাওযী, রাহ. (৫১০-৫৯৭ হি) এবং হাদীস নিরীক্ষার কড়া বিশেষজ্ঞ আল্লামা রাযিউদ্দীন হাসান ইবনে মুহাম্মদ সাগানী লাহুরী, রাহ. (৫৭৭-৬৫০ হি) ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর মতেরই প্রতিধ্বনি করেছিলেন। এঁদের সময়ে হাদীসের তথা ইসলামের জ্ঞান-সাধনা উন্নতির চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

মান্যবর সাহাবীদের থেকে বিশেষত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর নিকট হাদীস ও ফিকাহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে ইমাম আলকামা ইবনে কায়েস, রাহ. (মৃ.৬২ হি) ও ইমাম আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ নখয়ী, রাহ. (মৃ.৭৫হি) প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ইবনে মাসউদ (রা) বলতেন, ' আলকামার জ্ঞানের চেয়ে আমার জ্ঞান বেশি নয়'। অনেক সাহাবীও ইমাম আলকামার নিকট মাসয়ালা জানার জন্য আসতেন। এই দুই ইমামের মৃত্যুর পরে ইমাম ইবরাহীম ইবনে ইয়াযিদ নখয়ী (রাহ) শিক্ষাদানের আসন গ্রহণ করেন। (স্মর্তব্য যে এই দু'জন ইমামই ইবরাহীম নখয়ী এর ঘনিষ্ট আত্মীয় ছিলেন)। তিনি ফিকাহ শাস্ত্রকে আরও প্রসারিত করেন। এলমে হাদীসেও তাঁর অসীম জ্ঞান ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর ইমাম শা'বী (রাহ) দুঃখ করে বলেছিলেন, 'ইবরাহীম এমন কাউকে রেখে গেলেন না, যে ব্যক্তি তাঁর চেয়ে বেশি আলিম ও ফকিহ্'। আসলে সিরিয়া, হিজায, বসরা, কুফা কোথাও তাঁর মত হাদীস ও ফিকাহর আর কোন আলিম ছিলেন না। তাঁর সময়েই ফিকাহ বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন তৈরি হয়। ওই সংকলন নবী করিম (ছা)-এর হাদীস,হযরত আলী (রা) এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ফাতাওয়া অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এই সংকলনটি শ্রেণীবিন্যাস করে লিখিত হয় নি। কিন্তু ইবরাহীম (রাহ)-এর ছাত্রগণ তা হতেই

মাসয়ালা মুখস্থ করে নিয়েছিলেন। ইবরাহীম (রাহ)-এর ছাত্রগণের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হাম্মাদ এর নিকট আরও বেশি মাসয়ালায় পূর্ণ আর একটি সংকলন ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর ফিকাহ্ শিক্ষাদানের আসন হাম্মাদ (রাহ.)ই পেয়েছিলেন। হাম্মাদ (রাহ) নিজে ফিকাহ্ শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধন করতে না পারলেও তিনি ইব্রাহীম (রাহ) সংকলিত মাসয়ালা ইত্যাদির হাফিয ছিলেন। হাম্মাদ ১২০ হিজরীতে ইন্তেকাল করলে উম্মতে মুসলিমা সর্বসম্মতভাবে ইমাম আবু হানিফা (রাহ)কেই ফিকাহ্ শিক্ষাদানের উস্তাদ বানিয়েছিলেন।

ইমাম আ'যমের সময়কাল পর্যন্ত যদিও বিভিন্ন বিষয়ের মাসয়ালা শিক্ষাদানের নিয়ম মোটামুটিভাবে চালু হয়েছিল, কিন্তু তা সামগ্রিকভাবে বিধিসম্মত ছিল না। প্রথমত ওই নিয়মে শিক্ষাদান চলতো মৌখিকভাবে পঠিত রিওয়ায়েতের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত যা কিছু শিক্ষা দেয়া হতো তা শাস্ত্র হিসেবে দেয়া হতো না। দলীল প্রমাণ পেশ এবং যুক্তিতর্কের সাহায্যে তা বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার নিয়ম-পদ্ধতি তখন পর্যন্ত চালু হয় নি। হাদীস নামে বর্ণিত বিষয়গুলো বিচার-বিশ্লেষণের কোন সুষ্ঠু নিয়ম কিংবা তা শ্রেণী-বিভাগ করে প্রতিপাদ্য বিষয়ের গুরুত্ব নির্ধারণের নীতি লিপিবদ্ধ হয় নি। মূলত তখন পর্যন্ত ফিকাহ্ শাস্ত্রের অর্থ ছিল শুধু সাময়িকভাবে উদ্ভূত সমস্যাদির সমাধানকল্পে মোটামুটিভাবে রায় প্রদান। ইসলামী আইন শাস্ত্র হিসেবে ফিকাহ্কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তখনো প্রভূত সাধনা, গবেষণা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন ছিল। এটাও নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন, ঠিক কোন কারণটি ইমাম আবু হানিফা (রাহ)কে ফিকাহ্ শাস্ত্র গ্রণয়নের প্রতি মনোযোগী করেছিল। ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত আছে যে, ১২০ হিজরীতে তাঁর মনে ফিকাহ্ শাস্ত্র প্রণয়নের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর উস্তাদ হাম্মাদ (রাহ)-এর মৃত্যুর পরে তিনি শিক্ষাদান কাজে ব্যাপৃত হন। সে সময় ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রসার হওয়ার সাথে সাথে বিজিত জাতিসমূহের নানা সমস্যার সমাধানকল্পে সুষ্ঠু আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয়েছিল। মুসলমানদের এবাদত ও জীবনের নানা মোয়ামিলাত এর বিধি প্রণয়নেরও প্রয়োজন বেড়ে গেল। সুষ্ঠু ও সুসঙ্গত আইন প্রণয়ন তখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। মৌখিকভাবে শোনা প্রমাণের সাহায্যে নানা শ্রেণীর মোকদ্দমার বিচার করা ও রায় দান করা তখন বিচারকগণের জন্য আর সম্ভব হচ্ছিল না। রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের আইন, ব্যবসা-বাণিজ্যের আইন, শরীর ও সম্পত্তি সংক্রান্ত আইন ইত্যাদি হাজার হাজার বিষয়ের জন্য সুদৃঢ় নীতির ওপর আইন শাস্ত্রকে গড়ে তোলার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

ইমাম আ'যম তখন দেশ ও যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রসারিতভাবে আইন প্রণয়নের কাজ শুরু করলেন। কাজটি বিপজ্জনকও ছিল। এ জন্য তিনি তা নিজের ওপরেই সীমাবদ্ধ করে রাখলেন না। অতএব তিনি নিজের ছাত্রদের মধ্য হতে কয়েকজন অত্যন্ত মেধাবী ও প্রতিভাবান মুজতাহিদ আলিমকে বাছাই করে নিজের কাজের সঙ্গে যুক্ত করে নিলেন। তারা স্ব স্ব রুচি ও প্রতিভার বিকাশে পরবর্তীকালে এক এক বিষয়ের অথরিটি বনেছিলেন। যথা, ইমাম ইয়াহিয়া ইবনে আবি যায়িদা, হাফস্ ইবনে গিয়াস, কাযী আবু ইউসুফ, দাউদ তায়ী (রাহ.)। এঁরা হাদীস এবং উপকরণাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। ইমাম যুফার বিষয়সমূহের মর্মোদ্ধারে দক্ষ ছিলেন। ইমাম কাসেম ইবনে মায়ান এবং ইমাম মুহাম্মদ (রাহ) আরবী ভাষা ও সাহিত্যে সুপন্ডিত ছিলেন। ইমাম আ'যম ওই সকল লোকের

সহযোগিতা নিয়ে একটি মজলিস গঠন করলেন। তখন থেকে সুদৃঢ় নীতি ও রীতি অনুযায়ী ফিকাহ্ শাস্ত্র লিপিবদ্ধ হতে শুরু হলো। ইমাম তাহাভী (রাহ) লেখেছেন, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর যেসব ছাত্র ফিকাহ্ শাস্ত্র প্রণয়নে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ জন। তন্মধ্যে বেশি প্রসিদ্ধ ছিলেন আবু ইউসুফ, যাফর, দাউদ তায়ী, আসাদ ইবনে আমর, ইউসুফ ইবনে খালিদ তামিমী, ইয়াহিয়া ইবনে আবি যায়িদা। ফিকাহ প্রণয়নে লেখনের কাজটি পালন করেছিলেন ইয়াহিয়া ইবনে আবি যায়িদা (রাহ)। ফিকাহ মজলিসের সমস্যরা ছিলেন,

১। ইমাম যুফার ইবনে হুয়ায়েল (১১০-১৫৮হি)।
২। ইমাম মালিক ইবনে মিগওয়াল (মৃ. ১৫৯ হি)।
৩। ইমাম মালিক ইবনে নাযির তায়ী (মৃ. ১৬০ হি)।
৪। ইমাম মিন্দাল ইবনে আলী (মৃ. ১৬৮ হি)।
৫। ইমাম নযর ইবনে আবদুল করিম (মৃ. ১৬৯ হি)।
৬। ইমাম আমর ইবনে মায়মুন (মৃ. ১৭১হি)।
৭। ইমাম হিব্বান ইবনে আলী (মৃ. ১৭২ হি)।
৮। ইমাম আবু ইসমাত নূহ ইবনে মরিয়ম আল-জামি (মৃ.১৭৩ হি)।
৯। ইমাম যুহায়র ইবনে মুয়াবিয়া (মৃ. ১৭৩ হি)।
১০। ইমাম কাসেম ইবনে মা'য়ান (মৃ. ১৭৫ হি)।
১১। ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবু হানিফা (মৃ. ১৭৬ হি)।
১২। ইমাম সায়াজ ইবনে বিসতাস (মৃ. ১৭৭ হি)।
১৩। ইমাম শরীক ইবনে আবদুল্লাহ (মৃ. ১৭৮ হি)।
১৪। ইমাম আফিয়া ইবনে ইয়াযিদ (মৃ. ১৮০ হি)।
১৫। ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (১১৮-১৮১ হি)।
১৬। ইমাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব (১১৩-১৮২ হি)।
১৭। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে নূহ (মৃ. ১৮৩ হি)।
১৮। ইমাম হায়সাম ইবনে বশির (মৃ. ১৮৩ হি)।
১৯। ইমাম ইয়াহিয়া ইবনে যাকারিয়া (৯০-১৮২ হি)।
২০। ইমাম শায়খ ফুযায়েল ইবনে ইয়ায (মৃ. ১৮৭ হি)।
২১। ইমাম ইবনে ওমর (মৃ. ১৮৮ হি)।
২২। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান (১৩২-১৮৯ হি)।
২৩। ইমাম আলী ইবনে মুসয়ির (মৃ. ১৮৯ হি)।
২৪। ইমাম ইউসুফ ইবনে খালিদ তামিমী (মৃ. ১৮৯)।
২৫। ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে ইদ্রিস (মৃ. ১৯২ হি)।
২৬। ইমাম ফযল ইবনে মুসা (মৃ. ১৯২ হি)।
২৭। ইমাম আলী ইবনে যিরআন (মৃ. ১৯২ হি)।
২৮। ইমাম হাফ্স ইবনে গিয়াস আন-নখয়ী (মৃ. ১৯৪ হি)।
২৯। ইমাম ওকী ইবনে জাররাহ (মৃ. ১৯৭ হি)।

৩০। ইমাম হিশাম ইবনে ইউসুফ (মৃ. ১৯৭ হি)।
৩১। ইমাম ইয়াহিয়া ইবনে সায়ীদ আল-কাত্তান (মৃ. ১৯৮ হি)।
৩২। ইমাম শু'আয়ব ইবনে ইসহাক (মৃ. ১৯৮ হি)।
৩৩। ইমাম আবু হাফ্স ইবনে আবদুর রহমান (মৃ. ১৯৯ হি)।
৩৪। ইমাম আবু মুতি আল-হাকাম ইবনে আবদুল্লাহ বলখী (মৃ. ১৯৯ হি)।
৩৫। ইমাম খালিদ ইবনে সোলায়মান (মৃ. ১৯৯ হি)।
৩৬। ইমাম আবদুল হামিদ (মৃ. ২০৩ হি)।
৩৭। ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ লু'লুয়ী (মৃ. ২০৪ হি)।
৩৮। ইমাম আবু আ'ছেম নাবিল (মৃ. ২১২ হি)।
৩৯। ইমাম হাম্মাদ ইবনে দালীল (মৃ. ২১৫ হি)।
৪০। ইমাম মক্কী ইবনে ইবরাহীম (মৃ. ২১৫ হি)।

এই ফিকাহ মজলিসের তাঁরাই হলেন ইজতিহাদ পরিষদ। এই মজলিস কোরআন, হাদীস, ইজমায়ে সাহাবা, ফাতাওয়ায়ে সাহাবা ও কিয়াসের মাধ্যমে ব্যাপক গবেষণা করে বিষয় ভিত্তিকভাবে ফিকাহর এক বিশাল ভান্ডার গড়ে তোলেন যা 'এলমে ফিকাহ' নামে সুপরিচিত হয়। এ মজলিসে সর্বসম্মতভাবে যা সিদ্ধান্ত হতো তাই লিপিবদ্ধ করা হতো। সদস্যদের মধ্যে একজনও যদি ভিন্ন মত পোষণ করতেন তাহলে তিন দিন পর্যন্ত সে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হতো। এরপর ঐকমত্যে পৌঁছলে তা লিপিবদ্ধ করা হতো। ত্রিশ বছর পর্যন্ত এ নিয়মে ফিকাহর মাসয়ালা লিপিবদ্ধ হয়। ফিকাহর মাসয়ালা চূড়ান্তভাবে লিপিবদ্ধ করার সময় মজলিসের প্রধান হিসাবে ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ) মাসয়ালার সমাধান পবিত্র কোরআন-হাদীসের নির্দেশ মুতাবিক হলো কিনা তা প্রয়োজনে পুনঃপরীক্ষা করতেন। অর্থাৎ পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহের ইবারাতুন নস্, দালালাতুন নস্, ইশারাতুন নস্, ইকতিযাউন নস তথা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, স্পষ্ট, সুপ্ত ইশারা-ইঙ্গিত যে কোনভাবেই সমাধান পাওয়া না গেলে হাদীসে রাসূলে সমাধান অনুসন্ধান করতেন। হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে তিনি নিখুঁত ও কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। হাদীসে রাসূলে সমাধান না পাওয়া গেলে আছারে সাহাবা ও ফাতাওয়ায়ে সাহাবা অনুসন্ধান করতেন এবং নির্দ্বিধায় যে কোন সাহাবীর অভিমত গ্রহণ করতেন। এ ক্ষেত্রে সমাধানে ব্যর্থ হলে তাবেয়ীদের মতামতের প্রতি নযর দিতেন। সমাধান না পেলে ইজমার প্রতি মনোনিবেশ করতেন। এখানেও ব্যর্থ হলে কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা সমাধানকৃত হুকুমের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা করে সামঞ্জস্য বিধান করে, উপমানের হুকুম উপমেয়র ওপর আরোপ করতেন এবং ইসতিহসান দ্বারা মাসয়ালার সমাধান করতেন। কাজেই বলা চলে যে, হানাফী ফিকাহ ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর কোন ব্যক্তিগত ফিকাহ ছিল না। সব মাসয়ালাই ফিকাহ মজলিসের তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। তাই হানাফী ফিকাহ হলো পরামর্শ-ভিত্তিতে রচিত ও সংকলিত মাসয়ালা বা ইসলামী আইন-কানুন। পরবর্তীতে এটাকে অন্যায়ভাবে ব্যক্তিগত তাকলিদ হিসাবে অভিহিত করা হচ্ছে।

এ সম্পর্কে সাদরুল আইম্মা আল্লামা মুয়াফ্ফেক মক্কী (রাহ) বলেন, "আবু হানিফা (রাহ) তাঁর মাযহাব তথা ফিকাহর চিন্তাধারা পরস্পর আলোচনা ও পরামর্শের ওপর ভিত্তি

করে রচনা করেন। মজলিসে শূরার সাথে আলোচনা ছাড়া তিনি নিজের একান্ত মতে কিছুই করেন নি। দীনী বিষয়ে ইজতিহাদ করার ক্ষেত্রে এবং আল্লাহ , রাসূল ও মু'মিনদের কল্যাণ কামনার্থেই তিনি এ নীতি অবলম্বন করেছিলেন। ফিকাহ মজলিসের সামনে তিনি এক একটি মাসয়ালা পেশ করতেন, সদস্যদের মতামত ও প্রমাণাদি শুনতেন এবং সবশেষে নিজের দলীল ও যুক্তিসমূহ পেশ করতেন। এভাবে এক এক মাসয়ালার ওপর মাসব্যাপী বা আরও বেশি সময় ধরেও তিনি সদস্যদের সাথে মুনাযারা বা বাহাস করতেন। অবশেষে কোন অভিমতের ওপর সদস্যরা একমত হলে ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ) তা কপিতে লিপিবদ্ধ করতেন। এভাবে ফিকাহ হানাফী লিপিবদ্ধ হয়"।

ফিকাহ্ লেখনের পদ্ধতি ছিল এরূপ, কোন বিষয়ের কোন একটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা শুরু হতো। সুনিপুণ ও সুদীর্ঘ আলোচনার পর যদি সকলেই একমত হয়ে সে সম্বন্ধে রায় দিতেন তবে তখনই তা লেখে নেয়া হতো। সকলে একমত না হলে স্বাধীনভাবে আলোচনা শুরু হতো। কখনো কখনো কোন বিষয়ের আলোচনা দীর্ঘ দিন ধরে চলতো। ইমাম আ'যম অত্যন্ত ধৈর্য ও মনোযোগের সাথে প্রত্যেকের বক্তব্য শুনতেন এবং অবশেষে নিজের সারগর্ভ রায় প্রকাশ করলে সকলে তাঁর প্রদত্ত অভিমতই মেনে নিতেন। কখনো এমন হতো যে, ইমাম আ'যম রায় দান করলেও মজলিসের সদস্যগণ নিজের রায়ের ওপর কায়েম থাকতেন। তখন সকল মতভেদের কথাই লেখে রাখা হতো। সেখানে বাধ্যতামূলক নিয়ম ছিল যে, যতক্ষণ মজলিসের সকল সদস্য উপস্থিত না হতেন, ততক্ষণ কোন প্রশ্ন আলোচিত বা লিখিত হতো না। 'জাওয়াহেরে মাবিয়া' প্রণেতা বর্ণনা করেছেন, 'ওই মজলিসের অন্যতম সদস্য আফিয়া ইবনে ইয়াযিদের অনুপস্থিতিতেই যদি কোন মাসয়ালার আলোচনা শুরু হতো, তবে ইমাম আ'যম (রাহ) বলতেন, 'আফিয়াকে আসতে দাও'। যখন তিনি এসে আলোচিত মাসয়ালাটির রায় সম্বন্ধে মতৈক্য প্রকাশ করতেন তখন তা লিপিবদ্ধ করা হতো। এভাবে সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে সে মহান কাজ সমাধা করা হয়েছিল।'

হাফিয আবুল মাহাসিন (রাহ)-এর বর্ণনা অনুসারে দেখা যায়, ওই মজলিসে প্রথমে আলোচিত ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো বাবে তাহারাত, তারপর বাবে ছালাত, তার পর বাবে সিয়াম, তারপর এবাদত, এর পর অন্যান্য বাব, এরপর বাবে মোয়ামিলাত এবং সবশেষে বাবে মিরাছ।

ইমাম আ'যমের জীবদ্দশাতেই তাঁর মজলিসে প্রণীত আইনগুলো সর্বত্র সাদরে গৃহীত ও অভিনন্দিত হয়েছিল। সে সময়ের প্রেক্ষিতে গৃহীত ওই সব আইন যাবতীয় কঠিন বিষয়ের সমাধানে সহায়ক হতো। গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো প্রকাশের সাথে সাথেই ইসলামী দুনিয়ার সর্বত্র প্রচারিত হতো। ইমাম আ'যমের ফিকাহ মজলিস আইন তৈরির সংসদরূপ মাদ্রাসায় পরিগণিত হয়েছিল। এই মাদ্রাসার ছাত্রগণ সরকারি বড় বড় পদে নিযুক্ত হতেন। আশ্চর্যের কথা এই যে, ইমাম আ'যমের সম সাময়িক অন্যান্য বিদ্বান ব্যক্তিরাও তাঁর রচিত আইন অনুসরণ করতেন। ইমাম সুফিয়ান সাওরী 'কিতাবুর রেহান' এর নকল নিয়ে তা সর্বদা ব্যবহার করতেন। যায়িদা বলেছেন, 'আমি এক দিন সুফিয়ানের শিয়রে ওই নকল দেখে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনিও আবু হানিফার কিতাব দেখেন? তিনি উত্তর দিলেন,

তাঁর সমসাময়িক কিছু বিদ্বান ব্যক্তি ইমাম আ'যমের বিরোধিতা করলেও কেউই তাঁর আইন বিষয়ক কিতাবগুলোর প্রতিবাদ করতে পারেন নি। ইমাম রাযী তাঁর মানাকেবুস শাফেয়ী কিতাবে লেখেছেন, 'ইমাম আবু হানিফা (রাহ.) এবং তাঁর ছাত্রগণ আসহাবুর রায় নামে কথিত হলেও তাঁরা যে যুগে তাঁদের আইন-কানুনগুলো প্রকাশ করেছিলেন, তখন মুহাদ্দিস এবং রাবিগণের আধিক্যে দুনিয়া ভরপুর ছিল, অথচ কেউই তাঁদের প্রতিবাদ করতে পারেন নি। অবশ্য ইমাম আওযায়ী (রাহ.) ইমাম আবু হানিফা (রাহ.)-এর 'কিতাবুস-সায়ের' এর প্রতিবাদ লেখেছিলেন, কিন্তু কাযী আবু ইউসুফ এর জবাবও লেখেছিলেন।

ইমাম আ'যমের আইন মজলিস অত্যন্ত বড় মজলিস ছিল। হাজার হাজার মাসয়ালা সম্বন্ধে ওই মজলিসে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। 'উকুদুল ইকওয়ান' এর ব্যাখ্যা লেখক বলেন, "ইমাম আবু হানিফার রচিত আইন এর সংখ্যা বারো লাখ নববই হাজারেরও বেশি ছিল"। শামসুল আইম্মা কারদারী (রাহ) ওই সংখ্যা ছয় লাখ বলেছেন। আল্লামা খাওয়ারিযমী (রাহ) তাঁর 'জামিউল মাসানীদ' গ্রন্থে বলেছেন, "ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর (লিপিবদ্ধকৃত) মাসয়ালার সংখ্যা পাঁচ লাখে গিয়ে পৌঁছেছে। তাঁর ও তাঁর ছাত্রদের গ্রন্থসমূহ এর প্রমাণ বহন করে"। সংখ্যা যাই হোক, এতে সন্দেহ নেই যে, ওই সংখ্যা লাখের কম ছিল না। ইমাম মুহাম্মদ (রাহ)-এর যে কিতাব এখন প্রচলিত আছে তা দ্বারা ওই বিষয়ের সত্যতা প্রমাণিত হয়।

এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, ইমাম আবু হানিফা (রাহ.)-এর জীবনকালেই ফিকাহ্ শাস্ত্রের সমস্ত অধ্যায় শ্রেণীবদ্ধভাবে লিখিত হয়। রিজাল ও ইতিহাসের পুস্তকগুলোতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

ফিকাহর মাসয়ালা নির্মাণে ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহ)-এর অনুসৃত নীতি কি ছিল, এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেন, " নবী করিম (ছা)-এর কোন হাদীস আমাদের নিকট পৌঁছলে আমরা তা গ্রহণ করে সে মুতাবিক ফয়সালা করি। যদি আমাদের কাছে সাহাবায়ে কিরামের রিওয়ায়েত পৌঁছে তবে আমরা এসব বর্ণনা হতে কোন একটি গ্রহণ করে থাকি। আর আমাদের মধ্যে তাবেয়ী কিরামের বর্ণনা পৌঁছলে আমরা এর মুকাবিলায় নিজেদের অভিমত পেশ করি অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে আমরা ইজতিহাদের পথ অবলম্বন করি" (আল-ইনতিকা কৃত হাফিয ইবনে আবদুল বার)।

আল-মানাকিব লিল যাহাবীতে আছে, ইমাম আবু হানিফা বলেন, "আমি কিতাবুল্লাহ (কোরআন মজিদ) থেকে দলীল-প্রমাণ গ্রহণ করতাম। কোরআন মজিদে দলীল পাওয়া না গেলে রাসূলুল্লাহ (ছা)-এর হাদীস এবং সহীহ আছার, যা নির্ভরযোগ্য মানুষের সূত্রে মানুষের কাছে পৌঁছেছে সে মুতাবিক ফয়সালা করতাম। এতেও না পেলে সাহাবীদের যে কোন একজনের অভিমত অনুসারে ফয়সালা করতাম। বিষয়টি ইবরাহীম নখয়ী, শা'বী হাসান বসরী ও আতা (রাহ) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলে তাঁরা যেমন ইজতিহাদ করেছেন তখন আমিও তাঁদের অনুরূপ ইজতিহাদ করি"।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মীযানুল কোবরা'-র লেখক শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারী আল্লামা আবদুল ওয়াহহাব শা'রানী (রাহ) বলেছেন, ইমাম আ'যম বলেন, "যতদিন পর্যন্ত এ উম্মতের মধ্যে হাদীস অন্বেষণকারী লোক বাকি থাকবে ততদিন পর্যন্ত এ উম্মতের মধ্যে

সালাহ ও ফালাহ অব্যাহত থাকবে। আর যখন লোকে হাদীসবিহীন এলেম অন্বেষণে লিপ্ত হবে তখন এ উম্মত ধ্বংস হয়ে যাবে"।

এতে একথা প্রতীয়মান হলো যে, ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ) তাঁর নিজের ও তাঁর উস্তাদদের রায়ের ওপর সর্বদাই হাদীস ও আছারে সাহাবাকে অগ্রাধিকার দিতেন। হাদীস বিদ্যমান থাকা অবস্থায় দীনের কোন বিষয়ে নিজের রায় প্রকাশ করা এবং সে মতে ফাতাওয়া দেয়া ইমাম আবু হানিফা (রাহ) জায়েয মনে করতেন না। তিনি বলতেন, "দীনী বিষয়ে তোমরা নিজেদের রায় অনুপাতে কথা বলা থেকে বিরত থাকবে। সর্বদা সুন্নাহ তথা হাদীসকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। যে এর থেকে বাইরে চলে যাবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে" (মীযানুল কোবরা)।

খলিফা আবু জা'ফর মনসুরের এক অভিযোগের জবাবে ইমাম আবু হানিফা (রাহ) বলেন, " আমি সর্বাগ্রে কোরআনের ওপর, এরপর হাদীসের ওপর আমল করি। এরপর আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর ফাতাওয়ার ওপর, এরপর অন্যান্য সাহাবীদের ফাতাওয়ার ওপর আমল করি। যদি কোন একটি মাসয়ালার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের একাধিক অভিমত থাকে, তবে অনন্যোপায় হয়ে এক্ষেত্রে একটি কিয়াস করি এবং তাঁদের কোন একজনের অভিমতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি" (মীযানুল কোবরা)।

হানাফী ফিকাহ বিশ্বে বহুলভাবে প্রচারিত ও অনুসৃত হওয়ার কারণ হলো এর অসংখ্য বিশিষ্টতা যা অন্য মাযহাবে অনুপস্থিত। এর কিছু বৈশিষ্ট নিম্নরূপ,

১. হানাফী ফিকাহতে রিওয়ায়েতের সাথে দিরায়াত তথা যুক্তির সামঞ্জস্য রয়েছে।
২. হানাফী ফিকাহ অপরাপর ফিকাহর তুলনায় সরল এবং সহজে পালনযোগ্য।
৩. তাহযীব-তমদ্দুন বা কৃষ্টি-কালচারের জন্য যা প্রয়োজন তা অন্যান্য ফিকাহর তুলনায় এতে অনেক বেশি রয়েছে।
৪. হানাফী ফিকাহয় বাস্তব জীবন ব্যবস্থার অংশ অত্যন্ত ব্যাপক, সুদৃঢ় এবং নিয়মতান্ত্রিক।
৫. হানাফী ফিকাহ অনুযায়ী রাষ্ট্র ও বিচার কার্য পরিচালনা করা অত্যন্ত সহজ। কারণ এতে প্রজা সাধারণ বিশেষত অমুসলিম প্রজাদের দাবি ও চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।
৬. কোরআন ও সুন্নাহ থেকে আহরিত মাসয়ালা-মাসায়েল হানাফী ফিকাহতে অত্যন্ত সুদৃঢ় ও যুক্তিসঙ্গতভাবে বর্ণিত হয়েছে।
৭. হানাফী ফিকাহতে কোরআন ও হাদীস এবং একাধিক হাদীসের ক্ষেত্রে এমন সমন্বয় করা হয়েছে যার ফলে হাদীস এবং কোরআনের সংশ্লিষ্ট কোন আয়াতই আমলের আওতা বহির্ভূত থাকে নি।

ফিকাহ হানাফীর এসব বিশিষ্টতার জন্য এর প্রতি বিরাগ-বিমুখিতা সত্ত্বেও এ ফিকাহ অধ্যয়ন করেছেন ইমাম বোখারী সহ সব মাযহাবের ইমামগণ। মুসলিম বিশ্বের সব মাদ্রাসাতে এমনকি মাযহাববিহীনদের মাদ্রাসাতেও হানাফী ফিকাহ পাঠদান করা হচ্ছে। কারণ মাসয়ালা ও দীনী এলেম এ ছাড়া পূর্ণতা লাভ করে না।

২। অসংখ্য ছাত্রের মাধ্যমে হাদীসের প্রচার-প্রসার

ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ) তাঁর বিশিষ্ট উস্তাদ হাম্মাদ ইবনে আবু সোলায়মান (রাহ)-এর মৃত্যুর পর উস্তাদের হালকায়ে দরসের স্থলাভিষিক্ত হন। অল্প দিনের মধ্যে তাঁর দরস ও তাদরীসের সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল হতে আলিম ছাত্রগণ তাঁর দরসে অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। ইমাম আ'যমের হাজার হাজার ছাত্র ছিল। কোন মুহাদ্দিস বা ফকিহর এতো অধিক সংখ্যক ছাত্র ছিল না। মক্কা মুকাররমা, মদীনা মুনাওয়ারা, দামেস্ক, বসরা, কুফা, ওয়াসিত, মোসেল, রিকাহ্, রামাল্লাহ, মিসর, ইয়ামন, ইয়ামামা, বাহরাইন, বাগদাদ, আহওয়ায, কিরমান, ইস্পাহান, হামাদান, হালওয়ান, দাগমান, তাবারিস্তান, জুরজান, মার্ভ, সারাখস, নিশাপুর, বোখারা, সমরকন্দ, তিরমিয, বলখ, কুর্দিস্থান, খাওয়ারিযম, সিজিস্তান, মাদইয়ান, হিমস ইত্যাদি এলাকার হাজার হাজার শিক্ষার্থী ইমাম আযম (রাহ)-এর দরসে অংশ গ্রহণ করে শিক্ষা লাভ করেছেন। 'উকুদুল জুম্মান' গ্রন্থে এবং 'জামেউ মাসানীদিল ইমামিল আ'যম' গ্রন্থে তাঁর ছাত্র-শাগরিদদের দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। তাঁর ছাত্র সংখ্যা অত্যধিক বেশি হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল যে, তাঁর দরসে দু'ধরনের অর্থাৎ হাদীস ও ফিকাহর শিক্ষা দেয়া হতো। এজন্য দু'ধরনের শিক্ষার্থী তাঁর দরসে হাযির হতেন।

ইমাম আ'যম (রাহ) তাঁর ছাত্রদেরকে বর্তমান যুগের ন্যায় গতানুগতিক সবক পড়াতেন না, বরং এলমী আলোচনা অনুশীলনের ন্যায় পাঠদান করতেন। পবিত্র কোরআন বা হাদীস বা আছার হতে পাওয়া যে মাসয়ালাটি আলোচনার জন্য উপস্থাপিত হতো তা তিনি ছাত্রদের সামনে তুলে ধরতেন এবং এ বিষয়ে শরয়ী নির্দেশ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করতেন। প্রত্যেক ছাত্রই নিজ নিজ মত পেশ করতেন। কিয়াসের বিষয়ে ছাত্রগণ পূর্ণ অধিকার পেতেন। তারা বিপরীত মতও দিতেন, এমন কি দীর্ঘ সময় আলোচনা পর্যালোচনা ও তর্ক-বিতর্কে দরসগাহে শোরগোল লেগে যেতো। সব কিছু গভীরভাবে চিন্তা করে, পর্যবেক্ষণ করে ইমাম আবু হানিফা (রাহ) নিজের মতামত পেশ করতেন। সেটাই হতো সে এলমী পর্যালোচনা ও অনুশীলনের ফলাফল, যা খুবই বিশ্লেষণমূলক ও সন্তোষজনক হতো। তা সকলের মনোপুত হতো এবং সকলেই গ্রহণ করতে বাধ্য হতো। এ ধরনের আলোচনা ও পর্যালোচনা ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের জন্য অত্যন্ত ফলদায়ক প্রশিক্ষণ। এতে ছাত্র-শিক্ষক উভয়ই সমভাবে উপকৃত হতেন। এ পদ্ধতিতে শিক্ষা দানের কারণে তিনি জীবন-সায়াহ্ন পর্যন্ত শিক্ষার্থীই (তালেবে এলেম) থেকে যান। তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তথা চিন্তাধারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেতে থাকে।

ছাত্রদের ও শিক্ষার্থীদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ

ইমাম আ'যম (রাহ) তাঁর ছাত্র-শিক্ষার্থীদেরকে গোঁড়াপন্থী ও অন্ধ অনুকরণপ্রিয় বানাতে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁদেরকে তিনি স্বাধীন মন-মানসিকতা সম্পন্ন তর্কবাগিশ দেখতে চাইতেন। তিনি তিনটি বিষয়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন,

১। তিনি শিক্ষার্থীদের আর্থিক সাহায্য দান করতেন। আপতকালীন সময়ে তাদের পাশে দাঁড়াতেন। তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে চাহিদা থেকে মুখাপেক্ষিহীন করে দিতেন এবং তাদের পরিবারের জন্য সম্পদ ব্যয় করতেন।

২। তিনি তাঁর ছাত্রদের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখতেন। যদি কারো মাঝে জ্ঞান অর্জনের অনুভূতির সাথে অহংকারের নমুনা দেখতে পেতেন, তবে বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে তা দূরীভূত করতেন এবং তাকে বিশ্বাস করাতেন যে, জ্ঞান অর্জন করতে হলে তোমাকে অপরের ওপর নির্ভরশীল হতেই হবে।

৩। তিনি শিক্ষার্থীদের উপদেশ দিতেন। বিশেষত তাদেরকে যারা স্বদেশে ফিরে যেতে চাইতেন অথবা যারা বড় হওয়ার জন্য আগ্রহী হতেন।

মোটকথা, ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ) তাঁর ছাত্রদেরকে বন্ধুর দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তাদের জন্য তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হতেন না। তিনি বলতেন, "তোমরা হলে আমার হৃদয়ের প্রশান্তি এবং চিন্তা-মুক্তির কারণ"।

ক্রমে ইমাম আ'যমের সুখ্যাতি এতো অধিক ছড়িয়ে পড়েছিল যে, তাঁর এলমী হালকা বিশাল সমাবেশে পরিণত হয়েছিল। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনটি বিষয়ে পারদর্শী শিক্ষার্থী পাওয়া যায়। (১) আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (ইমামুল মু'মিনীন ফিল হাদীস) ও হাফ্স ইবনে গিয়াস এর মত শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণ, (২) আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ইবনে হাসান, যুফার ইবনে হুযায়েল, হাসান ইবনে যিয়াদ এর মত শ্রেষ্ঠ ফকিহ-মুহাদ্দিস এবং (৩) শায়খ ইমাম ফুযায়েল ইবনে ইয়ায ও শায়খ ইমাম দাউদ তায়ী প্রমুখের ন্যায় শ্রেষ্ঠ আবেদ ও যাহেদ অলী-আল্লাহ। ইমাম আ'যমও মৃর্ত্যু পর্যন্ত এবাদতে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, দৃঢ় থেকে এবং দুনিয়া হতে বিমুখ হয়ে এলমের আমানত পৌঁছানোর দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি সারা জীবনই ছিলেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও উম্মতে মুসলিমার কল্যাণ কামনায় নিয়োজিত। কারণ, তিনি জানতেন যে এরূপ কল্যাণ কামনাই দীন, 'আদ-দীনুন নাসিহা'।

ইমাম আ'যম (রাহ)-এর ছাত্রদের মধ্যে বহু সংখ্যক কোরআন বিশেষজ্ঞ, ফকিহ, মুহাদ্দিস ও বিচারক ছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন,

১। কাযী আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম (রাহ)।
২। মুহাম্মদ ইবনে হাসান আস-শায়বানী (রাহ)।
৩। যুফার ইবনে হুযায়েল আম্বারী (রাহ)।
৪। হাম্মাদ ইবনে আবু হানিফা (রাহ)।
৫। হাসান ইবনে যিয়াদ লু'লুয়ী (রাহ)।
৬। আবু ইসমাত নূহ ইবনে মরিয়ম আল-জামি (রাহ)।
৭। কাযী আসাদ ইবনে আমের আবু মুতি (রাহ)।
৮। আবু মুতি আল-হাকাম ইবনে আবদুল্লাহ বলখী, রাহ.(মৃ-১৯৯হি)।
৯। ফযল ইবনে মুসা (রাহ)।
১০। মুগিরা ইবনে মুসা (রাহ)।
১১। যাকারিয়া ইবনে আবি যায়িদা (রাহ)।
১২। আসাদ ইবনে আমর (রাহ)।

১৩। মুসইর ইবনে কিদাম, রাহ. (মৃ.১৫৫হি)।
১৪। সুফিয়ান সাওরী, রাহ. (৯৭-১৬১ হি)।
১৫। মালিক ইবনে মিগওয়াল (রাহ)।
১৬। ইউসুফ ইবনে খালিদ সিমতি, রাহ. (মৃ. ১৮৯ হি)।
১৭। ইউনুস ইবনে আবু ইসহাক (রাহ)।
১৮। শায়খ দাউদ ইবনে তায়ী (রাহ)।
১৯। আফিয়া ইবনে ইয়াযিদ (রাহ)।
২০। মিন্দাল ইবনে আলী (রাহ)।
২১। হাসান ইবনে সালিহ (রাহ)।
২২। আবু বকর ইবনে আয়াশ (রাহ)।
২৩। ঈসা ইবনে ইউনুস (রাহ)।
২৪। আলী ইবনে মুসয়ির (রাহ)।
২৫। হাফ্স ইবনে গিয়াস আন-নখয়ী (রাহ)।
২৬। ইয়াহিয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে আবি যায়িদা (রাহ)।
২৭। আবুল আ'ছেম নাবিল (রাহ)।
২৮। জারীর ইবনে আবদুল হামিদ রাহ. (মৃ.১৮৮ হি)।
২৯। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রাহ)।
৩০। ওকী ইবনে জাররা (রাহ)।
৩১। হিব্বান ইবনে আলী, (রাহ, মৃ. ১৭২ হি)।
৩২। আবু ইসহাক আল-ফাযারী, রাহ. (মৃ ১৮৫ হি)।
৩৩। ইয়াযিদ ইবনে হারুন, রাহ. (১১৭-২০৬ হি)।
৩৪। আবদুর রায্যাক ইবনে ইবরাহীম (রাহ)।
৩৫। আবদুর রায্যাক ইবনে হুমাম সান'আনী (রাহ)।
৩৬। আবদুর রহমান আল-মুকরী (রাহ)।
৩৭। হায়সাম ইবনে বশির (রাহ)।
৩৮। কাসেম ইবনে মায়ান, রাহ. (মৃ. ১৭৫ হি)।
৩৯। আলী ইবনে আ'ছেম (রাহ)।
৪০। ইয়াহিয়া ইবনে সায়ীদ আল-কাত্তান (রাহ)।
৪১। জাফর ইবনে আওন (রাহ)।
৪২। ইবরাহীম ইবনে তাহমান, রাহ. (মৃ. ১৬৯ হি)।
৪৩। হামযা ইবনে হাবিব আয্-যায়াত, রাহ. (মৃ. ১৫৮ হি)।
৪৪। ইয়াযিদ ইবনে রাফি (রাহ)।
৪৫। ইয়াহিয়া ইবনে ইয়ামান (রাহ)।
৪৬। খারিজা ইবনে মুসআব (রাহ)।
৪৭। মুসআব ইবনে কিদাম (রাহ)।
৪৮। রাবীয়া ইবনে আবদুর রহমান রাঈ আল-মাদানী (রাহ)।

৪৯। নযর ইবনে মুহাম্মদ মারওয়াযী (রাহ)।
৫০। আবদুল আযীয ইবনে আবু রাজমা (রাহ)।
৫১। আসাদুদ্ দীন ইবনে ফুরাত (রাহ)
৫২। মক্কী ইবনে ইবরাহীম (রাহ)।
৫৩। আবুল মুকাতিল হাফ্স ইবনে সালেম সমরকান্দী, রাহ (মৃ. ২০৮ হি)।

ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ)-এর ছাত্রদের বিশিষ্টতা অসংখ্য বলে ইতিহাসে বর্ণিত আছে। এর কিছু নিম্নরূপ,

(ক) ইমাম আ'যম (রাহ)-এর বহু ছাত্র মুজতাহিদ ইমাম ছিলেন। তাঁরা নিজেরা স্বাধীনভাবে কোরআন, হাদীস ও আছারের সাহায্য নিয়ে মাসয়ালা-মাসায়েল নির্ণয় করতে সক্ষম ছিলেন।

(খ) দেশের সরকারী বড় বড় পদের জন্য তাঁদেরকে নির্বাচন করা হতো। বিশেষ করে কাযী ও বিচারক হিসাবে তাঁরা অসম্ভব পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছেন।

(গ) ইমাম আ'যমের বহু ছাত্র রাসূল (ছা)-এর হাদীসের ইমাম ও একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তাঁরা সারা জীবন হাদীসের পাঠ, অনুশীলন ও দরস জারি রেখেছিলেন।

(ঘ) তাঁদের বেশ কয়েক জন প্রসিদ্ধতম ও সহীহ 'আল-জামে আল-বোখারী'র সংকলক ইমাম বোখারী, রাহ. (১৯৪-২৫৬ হি)-এর উস্তাদ ছিলেন। তাঁর বহু ছাত্র ও ছাত্রের ছাত্ররাই ছিলেন আসহাবে সিহাহ্ সিত্তাহ। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আছে)।

ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ)-এর শিষ্যবর্গ

ইমাম আযমের ছাত্র-শিষ্যদের সংখ্যা ছিল অসংখ্য। তাঁদের কিছু লোক ইমাম আ'যমের সান্নিধ্যে এসে সমবেত হতেন। কিছু দিন পর তাঁর থেকে ফায়েয হাসিল করে তাঁর চিন্তাধারার পদ্ধতি ও নীতি আহরণ করে স্বদেশে ফিরে যেতেন। আর কিছু সংখ্যক শিষ্য তাঁর সান্নিধ্যে পড়ে থাকতেন। এমন কি আমৃত্যু তাঁর সান্নিধ্য তাঁরা ছেড়ে যান নি। একবার শেষোক্ত ছাত্রদের সম্পর্কে তিনি বলেন, "তাঁরা ছিলেন ছত্রিশ জন। তাঁদের মধ্যে আটাশ জন ছিলেন কাযী (বিচারক) এবং ছয় জন ছিলেন 'মুফতি' হওয়ার মত যোগ্য ব্যক্তিত্ব। আর আবু ইউসুফ ও যুফার ছিলেন একাধারে কাযী ও মুফতিদের শিরোমণি হওয়ার যোগ্য"।

এখন আমরা ইমাম আ'যম (রাহ)-এর প্রসিদ্ধ ও প্রভাবশালী কয়েক জন ছাত্রে সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরবো। তাঁর ছাত্রদের চল্লিশ জন কোরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে বিবিধ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

ইমাম কাযী আবু ইউসুফ (রাহ)

তাঁর পুরো নাম ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম ইবনে হাবিব আনসারী। তিনি ১১৩ হিজরীতে কুফাতে জন্ম গ্রহণ করেন। সেখানেই প্রাথমিক লেখাপড়া শেষ করেন ও স্থায়ী নিবাস গড়ে তোলেন। তিনি ১৮২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন আরব বংশীয়। জ্ঞান আহরণের প্রতি তাঁর ছিল প্রবল ঝোঁক। তাই তিনি উলামায়ে কিরামের সান্নিধ্যে থেকে

জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের চেষ্টা করতেন। এক সময় তিনি কাযী ইবনে আবু লায়লার ছাত্র ছিলেন। তারপর ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর সংস্পর্শে আসেন। জানা যায়, তিনি ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর ওফাতের পর মুহাদ্দিসদের সাথে সুসম্পর্ক রেখে চলতেন এবং তাঁদের থেকে ফায়েয ও বরকত হাসিল করতেন। তিনি হিশাম ইবনে ওরওয়া, সোলায়মান তামিমী, আতা ইবনে সাইয়িব, আবু ইসহাক শায়বানী, আহওয়াস ইবনে হাকিম, ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম, আইউব ইবনে ইতবা প্রমুখ আলিমের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক এর নিকট তিনি ফারসী ও ভাষাতত্ত্ব পড়েন। মুহাম্মদ ইবনে আবি লায়লার নিকট তিনি ফিকাহর মাসয়ালা সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর শিক্ষা মজলিসে জড়িত থেকে ফিকাহ শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস হাফিয ইবনে আবদুল বার (রাহ) লেখেছেন যে, আবু ইউসুফ মুহাদ্দিসদের নিকট হতে এক বৈঠকেই পঞ্চাশ বা ষাটটি হাদীস শুনে মুখস্থ করে নিতে পারতেন। আল্লামা যাহাবী (রাহ) বলেছেন, " আহলে রায়গণের মধ্যে আবু ইউসুফের চেয়ে বেশি হাদীস কেউ জানেন না। ইতিহাসবিদ ইবনে খাল্লিকান লেখেছেন, 'আবু ইউসুফ তাফসীর ও আরব জাতির প্রাচীন ইতিহাসের হাফিয ছিলেন। ফিকাহতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল তাঁর। হাদীস শাস্ত্রেও তিনি হাফিযে হাদীস ছিলেন'। ইমাম আহমদ তাঁকে হাদীসের বিশারদ বলেছেন। ইয়াহিয়া ইবনে মঈন ও ইমাম আহমদ উভয়েই কাযী আবু ইউসুফের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কাযী সাহেবের বহু ছাত্র-শিষ্য ছিলেন।

আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে জরীর তাবারী রাহ. (২২৪-৩১০ হি) বলেন, "কাযী আবু ইউসুফ (রাহ) অত্যন্ত উচুঁমানের ফকিহ এবং হাফিযে হাদীস ছিলেন। হাদীস হিফযে তাঁর সুখ্যাতি ছিল প্রচুর। তিনি মুহাদ্দিসদের নিকট হাযির হতেন এবং পঞ্চাশ বা ষাটটি হাদীস মুখস্থ করে ফেলতেন। তারপর দাঁড়িয়ে মুখস্থ হাদীসগুলো উস্তাদকে শুনাতেন। হাদীসে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অতুলনীয়"।

ইমাম আবু ইউসুফের বদৌলতে হানাফী ফিকাহর বিপুল উপকার সাধিত হয়েছে। বিচারকের পদে অভিষিক্ত থাকার কারণে তিনি হানাফী ফিকাহকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এর সফল কার্যকারিতা দেখিয়ে গিয়েছেন। ইমাম আযমের শিষ্যদের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদীস ও মুজতাহিদ ফকিহ ছিলেন। উল্লেখ্য যে, তাঁর ছাত্রদের মাঝে শত শত মুজতাহিদ ফকিহ ছিলেন। ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ) পবিত্র কোরআন, হাদীসের আলোকে ও স্বীয় উস্তাদের চিন্তাধারা ও অভিমতসহ বহু কিতাব রচনা করে গিয়েছেন। এসবের কয়েকটি নিম্নরূপ,

১। কিতাবুছ ছালাত। ২। কিতাবুয যাকাত। ৩। কিতাবুস সিয়াম। ৪। কিতাবুল বুয়ু।
৫। কিতাবুল ফারাইয। ৬। কিতাবুল হুদুদ। ৭। কিতাবুল ওয়াকালা।
৮। কিতাবুল অছায়া। ৯। কিতাবুছ ছায়দ ওয়ায-যাবাইহ।
১০। কিতাবুল গাযব ওয়াল ইসতিবরা। ১১। কিতাবুল ইকতিলাফুল আমছার।
১২। কিতাবুল রাদ্দু আ'লা মালিক ইবনে আনাস। ১৩। কিতাবুল খারাজ।
১৪। ইখতিলাফু ইবনে আবি লায়লা। ১৫। আর-রাদ্দু আ'লা সিয়ারিল আওযায়ী।

১৬। কিতাবুল জাওয়ামি (এতে ৪০টি কিতাবের সমষ্টি রয়েছে)। এতে মানুষের মতবিরোধ, কার্যকরী রায় ও অভিমত স্থান পেয়েছে। এছাড়া কাযী সাহেবের কিছু 'ইমালা' গ্রন্থ রয়েছে যেগুলো তাঁর অভিমতের সমষ্টি।

১৭। কিতাবুল আছার। এই গ্রন্থে ইউসুফ ইবনে আবু ইউসুফ তার পিতা থেকে এবং তিনি ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ) থেকে বর্ণনা করেছেন। এ গ্রন্থের কিছু হাদীস রাসূলুল্লাহ (ছা) পর্যন্ত অথবা সাহাবী পর্যন্ত অথবা তাঁর পছন্দনীয় তাবেয়ী পর্যন্ত মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত। এ ভিত্তিতে মনে হয় গ্রন্থটি ইমাম আবু হানিফা (রাহ) এর 'মুসনাদ'। যা ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ) তাঁর পূত্রের মাধ্যমে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। গ্রন্থটিতে কুফার ফকিহদের ফাতাওয়াসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। যেগুলো ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ) পছন্দ করেছেন অথবা বিরোধিতা করেছেন, বিরোধিতার কারণসমূহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটিকে ফিকাহর অনুচ্ছেদ হিসাবে বিন্যাস করা হয়েছে। গ্রন্থটি তিনটি কারণে অত্যন্ত মুল্যবান ও মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। যথা (১) গ্রন্থটি 'মুসনাদে আবু হানিফা' (রাহ) এর মর্যাদা রাখে এবং এর সেসব হাদীস চিহ্নিত করা যায়, যার দ্বারা তিনি ফাতাওয়া ও আহকাম আহরণে সাহায্য গ্রহণ করতেন। (২) গ্রন্থটি হতে জানা যায় যে, কিভাবে ইমাম আ'যম সাহাবা কিরাম (রা)-এর ফাতাওয়া গ্রহণ করতেন। 'মুরসাল' হাদীসকে মারফু হাদীসের শর্তারোপ ছাড়া কিভাবে তিনি নির্ভরযোগ্য মনে করতেন। আর কোন ধরনের বর্ণনা তাঁর নিকট বিশ্বাসযোগ্য ছিল। (৩) গ্রন্থটিতে ইমাম আ'যমের পছন্দ মত ফাতাওয়া সান্নিবেশিত হয়েছে যা কুফার তাবেয়ী ফকিহদের ও অন্যান্য ফকিহদের ফাতাওয়া হতে লওয়া হয়েছিল। এসব ফাতাওয়া ভান্ডারই আহকামে শরীয়ার ভিত্তি সাব্যস্ত করেছিলেন তিনি। গ্রন্থটি হতে ফিকাহর মাসয়ালা নির্ণয়ে ইমাম আ'যমের মর্যাদা ও মুজতাহিদদের মাঝে তাঁর অবস্থান জানা যায়।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আস-শায়বানী (রাহ)

তাঁর নাম মুহাম্মদ, পিতার নাম হাসান, দাদার নাম ফারকাদ আস-শায়বানী। উপনাম আবু আবদুল্লাহ। তিনি হানাফী ফিকাহর দ্বিতীয় বাহু ছিলেন। তিনি এই মাযহাবের মহান ব্যক্তিত্ব, অতুলনীয় বৈশিষ্ট ও গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন কোরআন বিশেষজ্ঞ, ফকিহ ও মুহাদ্দিস। তিনি ১৩২ হিজরীতে ওয়াসিত শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯ হিজরীতে খলিফা হারুন-অর-রশীদের সফর সঙ্গী হিসাবে রায়নগরে গিয়ে মত্যুবরণ করেন। তখন তিনি কাযী ছিলেন। ঘটনাক্রমে খলিফার অন্য সফরসঙ্গী বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ আলী ইবনে হামযা আল-কাসায়ীও তখন ইন্তেকাল করেন। শোকাহত হয়ে খলিফা সে সময় বলেছিলেন, "আজ এখানে ফিকাহ ও ব্যাকরণ দু'টোকেই দাফন করে গেলাম"।

এ মহান ফকিহ দীর্ঘকাল ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ) থেকে শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ পান নি। তাই তিনি ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ) থেকে শিক্ষা সমাপন করেন। এছাড়া তিনি কুফা, মক্কা, মদীনা, বসরা, ওয়াসিত, দামেস্ক, খোরাসান, ইয়ামামা প্রভৃতি শহরের অসংখ্য ফকিহ ও মুহাদ্দিস থেকে এলেম শিক্ষা করেন। তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সুফিয়ান সাওরী, মালিক ইবনে মিগওয়াল, হাসান ইবনে ওমরা, ইমাম মালিক ইবনে

আনাস, ইবরাহীম, যাহহাক ইবনে ওসমান, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, তালহা ইবনে আমর, জামআ ইবনে সালিহ, আবুল আওয়াম, ইমাম আওযায়ী, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ। ইমাম মালিকের সান্নিধ্যে তিনি সুদীর্ঘ কাল অতিবাহিত করেন। তিনি ইমাম মুসআব ইবনে কিদাম, ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আওযায়ী প্রমুখ হতে হাদীস বর্ণনা করেন।

তাঁর ছাত্র সংখ্যা ছিল অগণিত। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন আবু হাফস আল কাবীর, আবু উবাইদ কাসেম ইবনে সালাম, আলী ইবনে মা'বাদ, মুসা ইবনে নাছির, মুহাম্মদ ইবনে সালামা, মু'আল্লাহ ইবনে মনসুর, মুহাম্মদ বিন মুকাতিল আর-রাযী, ইয়াহিয়া ইবনে মঈন, ইবনে রুস্তম, হিশাম ইবনে উবায়দুল্লাহ, ঈসা ইবনে আবান, শাদ্দাদ ইবনে হাকিম রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ।

ইমাম মুহাম্মদ (রাহ) বিশ বছর বয়সে দরস ও তাদরীসের কাজ শুরু করেন। তিনি এক হাজারের মত গ্রন্থ সংকলন করেন। তিনি অতি উন্নত মানের সাহিত্যিক ও বাগ্মী ছিলেন। তাঁর দরসে হাজার হাজার লোকের সমাগম হতো। তাঁর ব্যক্তিত্বে অতুলনীয় আকর্ষণ শক্তি ছিল। ইমাম শাফেয়ী (রাহ) তাঁর সম্পর্কে বলেন, "মুহাম্মদ ইবনে হাসান (রাহ)-এর ব্যক্তিত্বের প্রভাব হৃদয়-মন ও নয়নকে ভরে দিতো। ... তিনি ছিলেন সুনিপুণ ও বাক্যালংকারে পরিপূর্ণ বাগ্মী। তিনি যখন কথা বলতেন, শ্রোতাগণ মনে করতো যে কোরআন তাঁরই ভাষায় নাযিল হয়েছে"।

ইমাম মুহাম্মদ (রাহ) ছিলেন একজন মুজতাহিদ ইমাম। তাঁর ফিকাহর দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যান-ধারণা ছিল অতি উচ্চ মানের। ফিকাহ হানাফী প্রণয়নে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইরাকী ও হিজাযী উভয়ের ফিকাহতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তিনি ইমাম মালিক থেকে মুয়াত্তা বর্ণনা করেছেন, সংকলন করেছেন এবং বিন্যাস করেছেন। মুয়াত্তা ইমাম মালিকের রাবীদের মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ (রাহ)-এর বর্ণনাসমূহ উত্তম রিওয়ায়েত বলে গণ্য। তাঁর রচনাবলী হানাফী ফিকাহর প্রথম পর্যায়ের আকর গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত। তাঁর অমূল্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো,

১। আল-মাবসূত। ২। আয-যিয়াদাত। ৩। আল-জামিউস সাগীর। ৪। আস-সিয়ারুল কাবীর। ৫। আস-সিয়ারুস সাগীর। ৬। আল-জামিউল কাবীর।

এই ছয়টি গ্রন্থকে 'যাহিরুর রিওয়ায়েত' বলা হয়ে থাকে। এসব গ্রন্থ বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, 'আল-মাবসূত', গ্রন্থটি 'আল-আছল' নামে পরিচিত। এটি একটি বৃহদাকার গ্রন্থ। ইমাম আ'যম (রাহ) কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন বিষয়ে ফাতাওয়ার বিপুল সমাবেশ ঘটেছে এ গ্রন্থে। এ গ্রন্থটি হানাফী ফিকাহর সত্যিকার দর্পণ হিসাবে বিবেচিত। এছাড়া তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে,

১। আল-মুহীত, ২। আল-মুয়াত্তা, ৩। আল-নাওয়াদির, ৪। কিতাবুল আছার, ৫। কিতাবুর রাদ্দি আলা আহলিল মদীনাহ, ৬। আল-কায়সানিয়াত, ৭। আল-হারুনিয়াত ৮। আল-জুরজানিয়াত, ৯। আর-রাক্কিয়াত। ১০। যিয়াদুয যিয়াদাত। এসব গ্রন্থকে 'গারবু যাহিরুর রিওয়ায়েত' বলা হয়ে থাকে। কেননা, এসব গ্রন্থ ইমাম মুহাম্মদ (রাহ) থেকে প্রামাণ্যরূপে বর্ণিত হওয়ার বিষয়টি প্রথম প্রকারের পর্যায়ভুক্ত নয়। ইমাম মুহাম্মদ (রাহ)-

এর 'আল-কাবীর' নামে যেসব গ্রন্থ রয়েছে তা ছাড়া সব গ্রন্থই ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ)কে শুনিয়েছিলেন। 'আল-কাবীর' গ্রন্থগুলো হলো, (১) আল-মুদারিবাতুল কাবীর, (২) আল-মুযারিয়াতুল কাবীর, (৩) আল-মাযুনুল কাবীর (৪) আল-জামিউল কাবীর ও (৫) আল সিয়ারুল কাবীর।

এলমুল খেলাফ অর্থাৎ ফিকাহর অধ্যায়গুলোতে অনুকূল ও প্রতিকূল হাদীস লিপিবদ্ধ করে এর বিচার-বিশ্লেষণ করা তাঁরই আবিষ্কার।

(ক) কিতাবুল আছার। এ গ্রন্থে এমন সব হাদীস ও আছার সন্নিবেশিত হয়েছে যা ইরাকী ফকিহদের মাঝে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল এবং যা ইমাম আবু হানিফা (রাহ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। এ গ্রন্থের অধিকাংশ বর্ণনা ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ)-এর 'কিতাবুল আছার'-এর সাথে মিল রয়েছে। এ দু'টি গ্রন্থকে 'মুসনাদে ইমামে আ'যম' হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। এ দু'টি গ্রন্থ থেকে ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর হাদীস, আছারে সাহাবা ও তাবেয়ী সম্পর্কে জ্ঞানের অনুমান করা যায় এবং এ বিষয়টি জানা যায় যে, যুক্তি প্রমাণ গ্রহণকালে তিনি হাদীস ও আছার এর ওপর কতটুকু নির্ভর করতেন। হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর আরোপিত শর্তাবলী কি ছিল ? হানাফী মাযহাবের যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তি কি ছিল? কেননা, গ্রন্থ দু'টিতে সব ফাতাওয়া ও অভিমত যুক্তি-প্রমাণসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। মাসয়ালার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং এর ভিত্তি উসূল তৈরি করা হয়েছে।

মাওলানা 'আবদুল বারী ফিরিঙ্গীমহলী (মৃ-১৩৪৪ হি) ইমাম মুহাম্মদের কিতাবুল আছার'-এর টীকা লেখেছেন। এর উর্দু অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এর একটি শরাহ অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

(খ) আল-মুয়াত্তা। ইমাম মুহাম্মদ (রাহ)-এর 'মুয়াত্তা' মুলত ইমাম মালিকের আল-মুয়াত্তা-র প্রতিলিপি। ইমাম মালিক (রাহ)-এর নিকট অনেক মুহাদ্দিস ও ফিকাহবিদ হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন এবং তারা নিজস্বভাবে এর সংকলনও তৈরি করেন। সে সব সংকলনের এখন আর কোন অস্তিত্ব নেই। কেবল ইমাম ইয়াহিয়া আন্দালুসী (মৃ ১৩৪ হি)-এর সংকলনটি 'মুয়াত্তা ইমাম মালিক' নামে এবং ইমাম মুহাম্মদ (রাহ)-এর সংকলনটি 'আল-মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ' নামে পরিচিত হয়ে আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রাহ)-এর মুয়াত্তায় মোট ১১৮০ টি রিওয়ায়েত আছে। এতে ইমাম মালিকের ১০০৫ টি ও ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর ১৩টি ও ইমাম আবু ইউসুফের ৪ টি রিওয়ায়েত রয়েছে।

গ্রন্থে সনদের দ্বিতীয় প্রকারের মাধ্যমে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যাতে ইমাম আবু হানিফা ও রাসূলুল্লাহ (ছা)-এর মাঝে শুধু দু'জন মাধ্যম রয়েছেন। অর্থাৎ ইমাম আযম তাবেয়ী থেকে শুনেছেন, তাবেয়ী সাহাবী থেকে এবং সাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছা) থেকে শুনেছেন। এটাকে উসূলে হাদীসের ইমামদের মতে 'সুনাইয়াত' বলা হয়। যেমন,

১। আন আবি হানিফা আন নাফে আন ইবনে ওমর (রা) আন নবী (ছা)।
২। আন আবি হানিফা আন আবদিল্লাহ বিন বাহিনা আন আবি দারদা (রা) আন নবী (ছা)।
৩। আন আবি হানিফা আন আবি যায়িদ আন জাবির (রা) আন নবী (ছা)।

৪। আন আবি হানিফা আন আবদুর রহমান আন আবি সায়ীদ (রা) আন নবী (ছা)।
৫। আন আবি হানিফা আন শাদ্দাদ আন আবি সায়ীদ (রা) আন নবী (ছা)।
৬। আন আবি হানিফা আন আতা আন আবি সায়ীদ (রা) আন নবী (ছা)।
৭। আন আবি হানিফা আন আতিয়া আন আবি সায়ীদ (রা) আন নবী (ছা)।
৮। আন আবি হানিফা আন মুসলিম বিন আল-আওয়ার আন আনাস বিন মালিক (রা) আন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ইত্যাদি (মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ)।

ইমাম আ'যমের ১৩টি হাদীসের সব সনদ এরূপই। প্রিয় পাঠক, আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে সনদের প্রথম ও উত্তম স্তর 'উহাদিয়াত' অবলম্বনেও ইমাম আ'যম হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাই সাইয়েদোনা ইমাম আ'যম (রাহ) সমস্ত আইম্মায়ে মুহাদ্দিসীনের মাঝে বৈশিষ্টমন্ডিত এবং একক। কোন মুহাদ্দিস বা মুজতাহিদের এরূপ উঁচু সনদের মর্যাদা নসিব হয় নি।

ইমাম মুহাম্মদ (রাহ)-এর 'মুয়াত্তা-য় কোন মওযু (জাল) হাদীস নেই। দুর্বল হাদীস থাকলে তা ভিন্ন সূত্রে সহীহ বলে প্রমাণিত। মোল্লা আলী কারী, মাওলানা ইবরাহীম বীরিযাদা (মৃ. ১০৯৯ হি) ও মাওলানা আবদুল হাই লখনোভী (মৃ. ১৩০৪ হি) এর শরাহ লেখেছেন। এর রাবীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লেখেছেন হাফিয যাইনুদ্দীন কাসেম ইবনে কাতলবুগা (৮০২-৮৭৯ হি)।

ইমাম যুফার ইবনে হুযায়েল (রাহ)

ইমাম যুফার (রাহ)-এর পূর্ণ নাম আবুল হুযায়েল যুফার আল-আম্বারী আল-বাসারী ইবনে হুযায়েল ইবনে যুফার। তিনি ১১০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট মুজতাহিদ ফকিহ ছিলেন। তিনি আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন। প্রথম দিকেই তিনি হাদীসের অধ্যয়নে খুব বেশি মনোযোগী ছিলেন। এজন্যই তাঁকে 'সাহিবুল হাদীস' বলা হতো। পরে ইমাম আ'যমের সান্নিধ্যে আসেন এবং গভীরভাবে ফিকাহ হানাফী অধ্যয়ন করেন। তিনি যুক্তিতর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বলিষ্ঠ দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন এবং পরম যুক্তিনির্ভর মন্তব্য প্রদানে অনন্য গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি ইমাম আ'যম (রাহ) থেকে 'ফিকাহর রায়' আহরণ করেন এবং উস্তাদের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সাথেই থাকেন।

কিয়াস ও ইজতিহাদে তিনি অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। 'তারিখে বাগদাদ-এ বর্ণিত আছে, মিসরের কালজয়ী মুহাদ্দিস ও ফকিহ ইমাম মুযানী রাহ. (১৭৫-২৬৪হি.) বলেন, "ইমাম যুফার কিয়াসের ক্ষেত্রে অনন্য প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন"। হানাফী মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে ইমাম যুফার (রাহ)-এর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। তিনি যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতার মাধ্যমে হানাফী মাযহার প্রচার করেন। উস্তাদের জীবিতাবস্থায় তিনি বসরার বিচারক নিযুক্ত হন। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি উস্তাদের পাঠদান মজলিসের স্থলাভিষিক্ত হন। ইমাম আ'যম (রাহ) ছাড়াও ইমাম যুফার (রাহ)-এর উস্তাদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সোলায়মান ইবনে মিহরান আ'মাশ, ইয়াহিয়া ইবনে সায়ীদ আনসারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ইয়াহিয়া ইবনে আবদুল্লাহ তায়মী, ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদ, আইউব সাখতিয়ানী, যাকারিয়া ইবনে আবু যায়িদা, ইবনে আবু আরুবা রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ। তাঁর

ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, শফিক ইবনে ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইবনে হাসান, ওকী ইবনে জাররা, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, আবু আলী উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল মজিদ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী, হিলাল ইবনে ইয়াহিয়া, হাকাম ইবনে আইউব। শাদ্দাদ ইবনে হাকিম, নো'মান ইবনে আবদুস সালাম, মালিক ইবনে ফুদাইক, হাসান ইবনে যিয়াদ লু'লুয়ী রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ।

আল্লামা মুহাম্মদ যাহেদ কাওসারী মিসরী (রাহ) "লামহাতুন নাযার ফি সীরাতে ইমাম যুফার" গ্রন্থে ইমাম যুফার (রাহ)কে মুজতাহিদে মুতলাক অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর মুজতাহিদদের মধ্যে শামিল করেছেন। তিনি ইজতিহাদের কোন কোন মূলনীতির ব্যাপারে কোন কোন মাসয়ালায় ইমাম আযমের সাথে মতানৈক্য করেছেন। আল্লামা কাওসারী (রাহ) 'হুসনুয তাকাযা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লামা মারজান (রাহ) বলেছেন, "ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম যুফার ও ইমাম মুহাম্মদ এলমে ফিকাহর ক্ষেত্রে ইমাম মালিক (রাহ) ও ইমাম শাফেয়ী (রাহ)-এর সমপর্যায়ের মুজতাহিদ ছিলেন।"

ইমাম যুফার (রাহ) কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি। তবে 'কিতাবুল আছার'-এর অনেক বর্ণনাকারীর প্রসিদ্ধ চার জনের একজন হলেন ইমাম যুফার (রাহ)। ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, ইমাম যুফার (রাহ)-এর বুদ্ধিমত্তার কারণে বসরায় হানাফী মাযহাবের প্রসার ঘটেছিল। তিনি যখন বসরায় কাযী-বিচারক নিযুক্ত হয়ে এলেন, তখন প্রতিদিন বসরার জ্ঞানী গুণীজনদের নিয়ে ফিকাহর মাসয়ালা-মাসায়েল সম্পর্কে মত বিনিময় করতেন এবং সুকৌশলে ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর অভিমত ব্যক্ত করতেন।

ইমাম যুফার (রাহ) দুনিয়ার ঝামেলা হতে মুক্ত থেকে সারা জীবন জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান দান কাজে অতিবাহিত করেন। ১৫৮ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ লু'লুয়ী (রাহ)

ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (রাহ) আল-কুফী ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ)-এর নিকট ফিকাহর শিক্ষা আরম্ভ করে তা সমাপ্ত করেন ইমাম যুফার (রাহ) ও সাহিবাইনের নিকট। তিনি ফিকাহ হানাফীর মতামত ও চিন্তাধারা বর্ণনা করে বহু কিতাব রচনা করেন। কিয়াসে তিনি খুব দক্ষ ছিলেন। তিনি কিছু দিন কাযীর পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। হানাফী মাযহাবের ফিকাহর রাবী হিসাবে সুখ্যাতির ন্যায় তিনি হাদীসের রাবী (বর্ণনাকারী) হিসাবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি স্বয়ং বলেছেন, ' আমি ইবনে জুরাইজ (রাহ) থেকে বার হাজার হাদীস রিওয়ায়েত করেছি'। এর সবই জ্ঞান রাজ্যের জন্য অতীব জরুরী। তবে কোন কোন মুহাদ্দিস তাঁর বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন। আহমদ ইবনে আবদুল হামিদ হাযিমী (রাহ) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি হাসান ইবনে যিয়াদ (রাহ)-এর চেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি কাউকে দেখে নি।

জনসাধারণের মধ্যে তাঁর এলমে ফিকাহর সুখ্যাতি ছিল ব্যাপক। তবে হানাফী ফকিহগণ ফিকাহর ক্ষেত্রে তাঁর বর্ণনাকে ইমাম মুহাম্মদ (রাহ)-এর 'যাহিরুর রিওয়ায়েত'-এর মত মর্যাদা দেন নি। জনগণ তাঁর ফিকাহর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। ইয়াহিয়া ইবনে

আদম (রাহ) বলেন, 'আমি হাসান ইবনে যিয়াদ (রাহ)-এর ন্যায় শ্রেষ্ঠ ফকিহ দেখি নি। তিনি ২০৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। এই খ্যাতিমান ফকিহ থেকে যেসব ছাত্র এলেম হাসিল করে ধন্য হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মুহাম্মদ ইবনে সিমাআ (১৩০-২৩৩ হি), মুহাম্মদ ইবনে সুজা, সালজী, ওমর ইবনে মাহীর, আলী রাযী প্রমুখ।

ইবনে নাদীম (রাহ) স্বীয় 'আল-ফিহরিস্ত' গ্রন্থে লেখেছেন, ইমাম তাহাভী (রাহ) বলেন, "হাসান ইবনে যিয়াদ (রাহ) ইমাম আযম (রাহ)-এর 'কিতাবুল মুজাররাদ' এর বর্ণনাকারী"। তাছাড়া তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করে জ্ঞানের অমর স্বাক্ষর রেখে যান। যেমন,

১। কিতাবু আদাবুল কাযী। ২। কিতাবুল খিছাল।
৩। কিতাবু মা'আনিল ঈমান। ৪। কিতাবুন নাফাকাত।
৫। কিতাবুল ফারাইয। ৬। কিতাবুল খারাজ।
৭। কিতাবুল অছায়া। ৮। কিতাবুল আমালী, ইত্যাদি।

ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ)-এর হাজার হাজার ছাত্রের মধ্যে শত শত ছাত্র ছিলেন 'মুজতাহিদ'। তারা সবাই ফিকাহ হানাফীর মূলনীতি ও এর ব্যাখ্যা প্রদানে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। একই সঙ্গে তাঁরা মুহাদ্দিসও ছিলেন। তাঁদের সূত্রে সিহাহ সিত্তাহর গ্রন্থসমূহে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এমন আরও কয়েকজন মুজতাহিদের সামান্য আলোচনা নিম্নরূপ,

(ক) ইমাম কাসেম ইবনে মায়ান (রাহ)

তিনি বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। সিহাহ সিত্তাহর লেখকগণ তাঁর সূত্রে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীস ও ফিকাহ উভয় বিষয়েই তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি আরবী সাহিত্যে সুপন্ডিত ছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ (রাহ)ও তাঁর ছাত্র ছিলেন।

খলিফা তাঁকে কাযী পদে নিযুক্ত করেন। বাধ্য হয়ে তিনি চাকরী গ্রহণ করেন, কিন্তু এজন্য বেতন গ্রহণ করতেন না। তিনি ইমাম আবু হানিফার বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। তিনি ইমাম আ'যমের অত্যন্ত অনুরাগী ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৭৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

(খ) ইমাম আসাদ ইবনে আমর (রাহ)

তিনি অত্যন্ত মর্যাদাশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ওপরই প্রথম সব কিতাব লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন ইমাম আ'যম (রাহ)। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, রাহ. (১৬৪-২৪১হি)সহ অনেকে তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়েত করতেন।

(গ) ইমাম আলী ইবনে মুসয়ির (রাহ)

তিনি আ'মাশ ও হিশাম ইবনে ওরওয়ার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইমাম বোখারী (রাহ) ও ইমাম মুসলিম (রাহ) তাঁর সূত্রে হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। তিনি মোসেল নগরের কাযী ছিলেন। তিনি ১৮৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

(ঘ) ইমাম আফিয়া ইবনে ইয়াযিদ (রাহ)

তিনি সেই ব্যক্তি যাঁর সম্বন্ধে ইমাম আবু হানিফা (রাহ) বলতেন, 'যতক্ষণ আফিয়া উপস্থিত না হয়, কোন মাসয়ালা যেন লিপিবদ্ধ না হয়, কোন মাসয়ালা লিপিবদ্ধ করো না"। আল্লামা যাহাবী লেখেছেন, তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ বিচারক। ১৮০ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়।

(ঙ) ইমাম হিব্বান ইবনে আলী (রাহ)।

তিনি বহু হাদীসের বর্ণনাকারী। ইবনে মাজাহ (রাহ) তাঁর সূত্রে অনেক হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রাহ) তাঁর স্মরণ-শক্তির প্রশংসা করতেন। তিনি ১৭২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

(চ) ইমাম মিন্দাল ইবনে আলী (রাহ)

তিনি ছিলেন ইমাম হিব্বান (রাহ)-এর ভাই। তিনি ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আ'মাশ প্রমুখ হতে বহু হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ও পরহিযগার লোক ছিলেন। তিনি ১৬৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

মহামতি ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর অসংখ্য ছাত্র ও শারগিদ ফিকাহ শাস্ত্র ও হাদীসে অপূর্ব পরিপূর্ণতা বা কামালাত হাসিল করেছিলেন। তাঁদের দ্বারা যেমন ফিকাহ শাস্ত্র অসম্ভবভাবে সৌন্দর্যমন্ডিত হয়েছিল তেমনি সিহাহ সিত্তাহর গ্রন্থসমূহ সমৃদ্ধ হয়েছিল। ইমাম আ'যমের খাস শারগিরদের দ্বারাই বা তাঁদের ছাত্রদের রিওয়ায়েত দ্বারা বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীস গ্রন্থ পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। এতে ইমাম আ'যম (রাহ)-এর কামালিয়াতই প্রকাশমান হলো। এতে প্রমাণিত হলো যে, ইমাম আ'যম (রাহ)-এর সিন্দুকে হাজার হাজার হাদীস সংরক্ষিত ছিল। হাজার হাজার হাদীসের সংগ্রাহক ইমাম আযম (রাহ)-এর ছাত্ররাই হতে পেরেছিলেন খ্যাতিমান শিক্ষক ও মুজতাহিদ ইমাম। ফিকাহ, হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রের চর্চায় তাঁরা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন। মুহাদ্দিস ছাত্রদের সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা এখানে সন্নিবেশিত হলো। অবশ্য তারা একই সাথে ফকিহও ছিলেন। সব ফকিহই মুহাদ্দিস ছিলেন।

(১) ইমাম ইয়াহিয়া ইবনে সায়ীদ আল-কাত্তান (রাহ)

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইয়াহিয়া ইবনে সায়ীদ রিজাল শাস্ত্রের ধারাবাহিকতা শুরু করেন। আল্লামা যাহাবী (রাহ) 'মীযানুল এতেদাল' গ্রন্থে লেখেন, প্রথম যিনি রিজাল শাস্ত্র লেখা শুরু করেন তিনি ইয়াহিয়া ইবনে সায়ীদ আল-কাত্তান (রাহ)। তারপর তাঁর ছাত্রগণ যেমন ইয়াহিয়া ইবনে মঈন (তিনি ইমাম বোখারীর উস্তাদ ছিলেন), আলী ইবনুল মাদীনী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আমর ইবনুল ফালাস প্রমুখ তা লিপিবদ্ধ করণ চালু রাখেন। আসমাউর রিজাল অর্থাৎ হাদীসের রাবীদের জীবন ও বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে উস্তাদ বক্তৃতা দিতেন আর ছাত্রগণ তা লিপিবদ্ধ করে নিতেন। হাদীসে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। তিনি যখন হাদীসের তালিম দিতে বসতেন তখন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহ) প্রমুখ ছাত্রগণ আদবের সাথে দাঁড়িয়ে থেকে হাদীস বিশেষভাবে বুঝে নিতেন। আছরের নামাযের সময় হতে এশার নামাযের সময় পর্যন্ত তাঁর শিক্ষাদান চলতো। ছাত্রগণ সারাক্ষণই দাঁড়িয়ে পাঠ গ্রহণ করতেন। ইয়াহিয়া (রাহ) এতোদূর ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন যে, অন্যান্য ইমাম বলতেন, 'ইয়াহিয়া যা ছেড়ে দেবেন, আমরাও তা ছেড়ে দেবো'। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহ)-এর প্রসিদ্ধ উক্তি হলো, 'আমি ইয়াহিয়ার মত আর কাউকে দেখি নি'। এতো বিদ্যাবত্তার সাথে সাথে তিনি ইমাম আ'যম আবু হানিফার শিষ্যত্ব ও সঙ্গলাভ করে ধন্য

হয়েছিলেন। তিনি ১৯৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। আল্লামা যাহাবী বলেছেন, ওকী ও ইয়াহিয়া উভয়েই ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর কথা অনুসারে ফাতাওয়া দিতেন।

(২) ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রাহ)

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস নূদী (রাহ) 'তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত' নামক কিতাবে লেখেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক এমন ইমাম যাঁর ইমামাত ও জালালাত সম্বন্ধে সকলেই একমত। যাঁর নাম উল্লেখ করলে আল্লাহর রহমত নাযিল হয়, যাঁর প্রতি মহব্বত রাখলে ক্ষমা লাভের আশা করা যায়। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর এমন জ্ঞান ছিল যে, সকলেই তাঁকে 'আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস' উপাধিতে ভূষিত করেছিল এবং ওই নামেই তাঁকে ডাকা হতো। তিনি ছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের (মাগরিব ওয়াল মাশরিক) আলিম, সবখানেরই আলিম ছিলেন। আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহ) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রাহ)-এর সময়কালে কোন লোকই তাঁর চেয়ে বেশি পরিশ্রম করে হাদীস সংগ্রহ করেন নি'। তিনি নিজেও বলেছেন, 'আমি চার হাজার শায়খ (উস্তাদ) থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছি। এর মধ্যে হাজার জনের নিকট হতে রিওয়ায়েত করেছি'। সহীহ বোখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে তাঁর রিওয়ায়েত করা অসংখ্য হাদীস রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে হাদীস বর্ণনার বিষয়ে তিনি একজন মস্ত বড় স্তম্ভ ছিলেন। হাদীস ও ফিকাহ দু'বিষয়ে তাঁর বহু কিতাব ছিল। দুঃখের বিষয়, এখন এর একটিও অবশিষ্ট নেই। তাঁর জ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব খুবই উঁচু পর্যায়ের ছিল। তিনি ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর অন্যতম বিখ্যাত শাগরিদ ছিলেন। ইমাম আ'যমের সাথে তাঁর আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। তাঁর বিখ্যাত উক্তি, "আল্লাহ যদি আমাকে আবু হানিফা ও সুফিয়ানের দ্বারা সাহায্য না করতেন তবে আমি অন্যের মতই সাধারণ মানুষ থাকতাম"। তিনি মার্ভের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১১৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

(৩) ইমাম ইয়াহিয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে আবি যায়িদা (রাহ)

ইয়াহিয়া ইবনে যাকারিয়া (৯০-১৮২ হি) ছিলেন বিখ্যাত একজন মুহাদ্দিস। আল্লামা যাহাবী (রাহ) 'তাযকিরাতুল হুফফায' নামক কিতাবে শুধুমাত্র হাদীসের হাফিযদের নামোল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে তাঁকেও শামিল করেছেন। ইমাম বোখারী (রাহ)-এর বিখ্যাত উস্তাদ আলী ইবনুল মদীনী বলতেন, "ইয়াহিয়ার যুগে তাঁর ওপরেই সব এলেম খতম হয়ে গিয়েছিল"। সিহাহ সিত্তাহর কিতাবসমূহে তাঁর সূত্রে বর্ণিত অসংখ্য হাদীস রয়েছে। তিনি মুহাদ্দিস ও ফকিহ দু-ই ছিলেন এবং দু'বিষয়েরই পূর্ণ জ্ঞান রাখতেন।

তিনি ইমাম আ'যম (রাহ)-এর বিজ্ঞতম ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন। ফিকাহ শাস্ত্র প্রণয়নে তিনি প্রধান অংশী ছিলেন। ইমাম তাহাভী (রাহ)-এর মতে তিনি ত্রিশ বছর ইমাম আ'যমের সাথে ফিকাহ প্রণয়নে ব্যাপৃত ছিলেন। অনেকের মতে কুফা শহরে তিনিই প্রথম ফিকাহর কিতাব প্রণয়ন করেন। তিনি মাদায়েন শহরের কাযীর পদে নিয়োজিত ছিলেন এবং সেখানেই ১৮২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

(৪) ইমাম ওকী ইবনে জাররা (রাহ)

তিনি হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর ছাত্র হয়ে গৌরববোধ করতেন। অনেক মুহাদ্দিস স্বীকার করেছেন যে, হাদীসের জ্ঞানে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। সহীহ বোখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে তাঁর সূত্রে বর্ণনাকৃত বহু হাদীস রয়েছে। হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রে তাঁর বর্ণনাকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়া হতো। তিনি ইমাম আ'যমের অন্যতম বিশিষ্ট শাগরিদ ছিলেন। বেশির ভাগ মাসয়ালাতে তিনি ইমাম আ'যমের অনুসরণ করতেন এবং তদনুযায়ী ফাতাওয়া দিতেন। তিনি ১২৯ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম ওকী (রাহ) ছিলেন ইমাম শাফেয়ী (রাহ)-এর বিশিষ্ট উস্তাদ। তিনি ইমাম আবু হানিফা (রাহ) হতে নয়শো হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি মুজতাহিদ ফিল মাযহাবের ন্যায়ও ফাতাওয়া দিতেন। এক্ষেত্রে সাহিবাইনের মত তিনিও ইমাম আ'যমের সাথে কোন বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করতেন। যেমন হজ্বে প্রেরিত উট চিহ্নিত করণের মাসয়ালাটি। তিনি বহু গ্রন্থের লেখক ছিলেন।

কালের বিখ্যাত মুহাদ্দিস ওকী ইবনে জাররা (রাহ) সম্বন্ধে খতীব বাগদাদী (রাহ) বলেন, "এক সময় ওকীর নিকট কয়েক জন বিদ্বান লোক আসলেন। এদের কেউ বলে উঠলেন, "এই মাসয়ালায় ইমাম আবু হানিফা ভুল করেছেন"। ওকী বললেন, আবু হানিফা কেমন করে ভুল করতে পারেন? কিয়াসে আবু ইউসুফ ও যুফার, হাদীসে ইয়াহিয়া ইবনে আবি যায়িদা, হাফস ইবনে গিয়াস, হিব্বান ও মিন্দাল, আরবী ভাষা ও অভিধানে কাসেম ইবনে মায়ান এবং তাকওয়াতে ফুযায়েল ইবনে ইয়ায ও দাউদ তায়ী, এতো সব মর্যাদাধারী লোক সঙ্গে থাকতে আবু হানিফা (রাহ) কিভাবে ভুল করবেন? তিনি ভুল করলে ওই সব লোক ভুল শোধরিয়ে দিতেন না?

(৫) ইমাম আবদুর রায্যাক ইবনে হুমাম (রাহ)

তিনি ইয়ামনের সানআতে ১২৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হুমাম, দাদার নাম নাফি। তিনি ২১১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে সানআর মাকবারা 'হামরা-আলব'-এ সমাহিত করা হয়।

তাঁর পিতা ও দাদা প্রসিদ্ধ রাবীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তাই পারিবারিকভাবে তিনি হাদীস চর্চার পরিবেশে লালিত পালিত হন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ রাবী ইমাম মা'মার (মৃ. ১৫৩ হি)-এর সান্নিধ্যে তিনি নয় বছর অতিবাহিত করেন। তিনি মক্কা, মদীনা ও সিরিয়ায় ভ্রমণ করে প্রসিদ্ধ রাবীদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর শায়খের সংখ্যা ছিল ৫৮ জন। তিনি আবু হানিফা (রাহ)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বহু বছর তাঁর সাথে অতিবাহিত করেন। তিনি বলেন, "আমি আবু হানিফার চেয়ে বড় কোন জ্ঞানী ব্যক্তি দেখি নি"।

তিনি 'জামে আবদুর রায্যাক' নামে বিরাট একটি হাদীসের কিতাব সংকলন করেন। ইমাম বোখারী (রাহ) স্বীকার করেছেন যে, তিনি এই কিতাব দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। আল্লামা যাহাবী এই কিতাবকে জ্ঞান ভান্ডার আখ্যা দিয়েছেন এবং তাঁকে বড় মুহাদ্দিস বলে আখ্যায়িত করেছেন। সহীহ বোখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে তাঁর সূত্রে

বর্ণনাকৃত অসংখ্য হাদীস রয়েছে। বড় বড় মুহাদ্দিস যথা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, ইয়াহিয়া ইবনে মঈন প্রমুখ তাঁর ছাত্র ছিলেন। বহু দূর দেশ হতে হাদীস শিক্ষার্থী তাঁর নিকট আসতেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ হলো, কিতাবুল আমালী, কিতাবুছ ছালাত, কিতাবুল মাগাযী, কিতাবুত তারীখ, কিতাবুস সুনান, আল-মুসান্নাফ, তাযকিরাতুল আরওয়াহ, মাওয়াকিউয়িল ইফলাহ, কিতাবু ইখতিলাফুল নাস ফিল ফিকাহ এবং তাফসীরে আবদুর রায্যাক। হাদীস থেকে তাফসীরকে আলাদা করে রচিত এটি একটি তাফসীর বিল মা'সুর বা বর্ণনামূলক শ্রেষ্ঠ তাফসীর।

(৬) ইমাম ইয়াযিদ ইবনে হারুন (রাহ)

তিনি হাদীসের বিখ্যাত ইমাম ছিলেন। বড় বড় ইমাম যেমন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আলী ইবনুল মদীনী প্রমুখ তাঁর ছাত্র ছিলেন। আল্লামা নূদী (রাহ)-এর মতে তাঁর ছাত্রদের সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। ইয়াহিয়া ইবনে আবি তালিব বলেছেন, 'একবার আমি তাঁর শিক্ষাদানের মজলিসে হাযির হলাম। সেখানে শ্রোতাদের সংখ্যা প্রায় সত্তর হাজার ছিল'। তিনি নিজেই বলেছেন, 'বিশ হাজার হাদীস আমার স্মরণ আছে। হাদীস শাস্ত্রে তিনি আবু হানিফা (রাহ)-এর শিষ্য ছিলেন। তিনি বলেন, " আমি বহু বিদ্বান লোকের সংস্পর্শে গিয়েছি। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার চেয়ে বড় আর কাউকে পাই নি"। তিনি ১১৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

(৭) ইমাম হাফ্স ইবনে গিয়াস আন-নখয়ী (রাহ)

ইমাম হাফ্স ১১৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। খলিফা হারুন-অর-রশীদ তাঁর সুখ্যাতি শুনে তাঁকে কাযীর পদে নিয়োগ দেন। তিনি অভাবগ্রস্থ ও ঋণগ্রস্থ হয়ে ১৭৭ হিজরীতে কাযীর পদ গ্রহণ করেন। তাঁর বিচার দেখে সবাই স্বীকার করেছিলেন যে, হাফ্স (রাহ)-এর ওপর আল্লাহর সাহায্য রয়েছে।

তিনি একজন খুব বড় মাপের মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও আলী ইবনুল মদীনী তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি যা কিছু রিওয়ায়েত করতেন তা মুখে মুখে করতেন। কাগজ কলমের ধার ধারতেন না। এভাবেই তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীসের সংখ্যা তিন-চার হাজার ছিল। ইমাম আবু হানিফা (রাহ) তাঁর কয়েক জন প্রতিভাশালী ছাত্র সম্বন্ধে মন্তব্য করতেন, 'তোমরা আমার মনের শান্তি, আমার দুঃখ দূরকারী'। হাফ্স ইবনে গিয়াসও তাঁদের অন্যতম ছিলেন। অনেক দিন তিনি দুনিয়াদারীর কাজকর্ম হতে নির্লিপ্ত ছিলেন। তিনি ১৯৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

(৮) ইমাম আবুল আ'ছেম নাবিল (রাহ)

তাঁর আসল নাম যুহাক ইবনে মুখাল্লাদ। তিনি একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। সহীহ বোখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থে তাঁর বর্ণনাকৃত বহু হাদীস বর্তমান আছে। আল্লামা শামসুদ্দীন যাহাবী (রাহ)-এর মতে তাঁর বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সকলেই একমত। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ও পূত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল 'নাবিল' অর্থ সম্মানিত। এ উপাধি প্রাপ্তি সম্বন্ধে নানামত রয়েছে।

তিনি ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর একজন বিশিষ্ট শাগরিদ ছিলেন। একদিন কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, সুফিয়ান সাওরী বড় ফকিহ না ইমাম আবু হানিফা? তিনি উত্তর দিলেন, তুলনা তো ওই রকম দু'টি জিনিসের মধ্যে চলে যাদের মধ্যে মিল থাকে। আবু হানিফা (রাহ) হলেন ফিকাহর জন্মদাতা আর সুফিয়ান হলেন মাত্র ফকিহ। তিনি ২১২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

(৯) ইমাম মুসইর ইবনে কিদাম (রাহ)। কোরেশ বংশের 'আমিরী' শাখার সন্তান ও কুফার অধিবাসী ইমাম মুসইর (রাহ) জ্ঞান ও ধর্মচর্চায় শ্রেষ্ঠ তাবেয়ীদের একজন ছিলেন। তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদীস ও শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। তিনি আমর ইবনে সায়ীদ নখয়ী, আবু ইসহাক আস-সুবায়ী, সায়ীদ ইবনে ইবরাহীম, সাবিত ইবনে উবায়দুল্লাহ আনসারী, আবদুল মালিক ইবনে নুমাইর, হিলাল ইবনে জানাব, হাবিব ইবনে আবি সাবিত, আলকামা ইবনে মারসাদ, কাতাদা, মায়ান ইবনে আবদুর রহমান, মিকদাম ইবনে শুরায়হ, আল-আ'মাশ, আদী ইবনে সাবিত, আল হাকাম ইবনে ওতাইবা, আবু হানিফা (রাহিমাহুমুল্লাহ) সহ বহু সংখ্যক মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর বর্ণনাসমূহের বিশ্বস্ততার জন্য বিখ্যাত তাবেয়ী হাদীসবিদ ইমাম শো'বা (রাহ)-এর একটি মন্তব্যই যথেষ্ট। তিনি বলেন, " তাঁর দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের কারণে আমরা তাঁকে 'মাসহাফ' বলতাম।" তাঁর ব্যক্তি-সত্তা ছিল হাদীস যাচাই-বাছাইয়ের মাপকাঠি। এ কারণে তাঁর উপাধি ছিল 'মীযান'। তাঁর হাদীসগুলো সমালোচনার উর্ধ্বে ছিল। হাদীসের ইমামগণ সন্দেহ ও মত পার্থক্যের বেলায় তাঁর শরণাপন্ন হতেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর এতো জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও তিনি হাদীস বর্ণনায় খুব বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতেন। তিনি এ দায়িত্ব পালনে খুব ভয় করতেন এবং তাঁর হাদীসগুলো সম্পর্কে সন্দেহপরায়ণ ছিলেন। তবে তিনি কোন ভুল করতেন না। আর তাঁর এই সন্দেহ হাদীসগুলোর মান বাড়িয়ে দেয়। হাদীস বিশারদগণ তাঁর সন্দেহকে দৃঢ় প্রত্যয়ের মর্যাদা দিতেন। তিনি কুফার মুফতিদেরও একজন ছিলেন। তিনি ছিলেন উঁচুস্তরের আবেদ ও যাহেদ এবং দুনিয়ার শান-শওকতের প্রতি একেবারেই উদাসীন। তিনি অন্য হাদীসবিদদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ও প্রফুল্ল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি ১৫৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

(১০) ইমাম শায়খ দাউদ তায়ী (রাহ)

আল্লাহতায়ালা তাঁকে সকল মানুষের নিকট গ্রহণীয় করেছিলেন। মারিফাত ও সূক্ষ্মদর্শনের প্রতীক, আধ্যাত্মিক বিদ্যায় মহাজ্ঞানী ও সূফীদের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন শায়খ দাউদ তায়ী (রাহ)। 'তাযকিরাতুল আওলিয়া' গ্রন্থে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। তিনি নানা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি খুব উঁচু মাপের ফকিহ ছিলেন। তিনি বহু বছর ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর সান্নিধ্য লাভ করেন। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মাহারিব (রাহ) বলতেন, 'দাউদ যদি প্রাচীন যুগের মানুষ হতেন, তবে কোরআন মজিদে তাঁর কাহিনী উল্লেখ থাকতো'।

তিনি প্রথম দিকে হাদীস ও ফিকাহ শিক্ষা লাভ করেন। পরে এলমে কালাম বিষয়েও পারদর্শিতা লাভ করেন এবং বাহাস ও তর্কযুদ্ধে মশগুল থাকেন। পরে তিনি দুনিয়া

বিমুখ হয়ে যান এবং সমস্ত কিতাব নদীতে ফেলে দেন। ইমাম মুহাম্মদ (রাহ) জরুরী মাসয়ালা দাউদ তায়ী (রাহ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন। তিনি ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর মুরিদ ও বিখ্যাত শাগরিদ ছিলেন। ফিকাহ অধ্যয়নে তিনি ইমাম আ'যমের সাথী ছিলেন। হযরত ফুযায়েল ইবনে ইয়ায (রাহ), ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রাহ) ও বিশর হাফী (রাহ)ও ইমাম আযমের ছাত্র ছিলেন। শায়খ দাউদ (রাহ) ১২০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

আসহাবে সিহাহ সিত্তাহ

ইমাম আ'যম (রাহ)-এর মুহাদ্দিস ছাত্র ও অনুছাত্রদের অনেকেই ইমাম বোখারী (রাহ), ইমাম মুসলিম (রাহ), ইমাম তিরমিযী (রাহ), ইমাম আবু দাউদ (রাহ), ইমাম নাসায়ী (রাহ) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (রাহ) এমন কি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহ) ও ইমাম শাফেয়ী (রাহ) এর উস্তাদ ছিলেন। এই হাদীসবিদেরা তাঁদের মাধ্যমে অসংখ্য হাদীস সংগ্রহ করে নিজ নিজ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। ইমাম বোখারী (রাহ) তাঁর 'জামে' এর ২২টি সুলাসিয়াতের ২০টি হানাফী মুহাদ্দিস হতে গ্রহণ করেছেন। মক্কী ইবনে ইবরাহীম (রাহ) হতে তিনি বেশির ভাগ সুলাসিয়াত গ্রহণ করেন। মক্কী (রাহ) ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর ছাত্র ছিলেন। শাগরিদের কামালাত উস্তাদের কামালাত হতে অর্জিত হয়। শাগরিদের লেখাই উস্তাদের লেখা, শাগরিদের দক্ষতাই উস্তাদের দক্ষতা। ইমাম আ'যমের শাগরিদ ও তাঁদের ছাত্রদের বর্ণিত হাদীস ও সনদের সংকলন থেকে বিশুদ্ধ ছয় কিতাবের সংগ্রাহকদের বড় বড় কিতাব সুসজ্জিত ও সম্পাদিত হয়েছে। এটা কি ইমাম আ'যমের জন্য কম গৌরবের কথা। তিনি যদি অসংখ্য হাদীস রিওয়ায়েত না করতেন তবে তাঁর ছাত্র-অনুছাত্রদের অসংখ্য বর্ণনা কোথা হতে আসলো? ছাত্রের সম্মানই তো শিক্ষকের গৌরবের কারণ। এক্ষেত্রে ইসলামের ইতিহাসে এমন গৌরবের অধিকারী ইমাম আবু হানিফা (রাহ) ছাড়া আর কেউ নেই। তাঁর ছাত্র-অনুছাত্ররাই বড় বড় মুজতাহিদ ইমাম ও হাদীসের উস্তাদ ছিলেন। তাই ইমাম আবু হানিফা (রাহ) হয়েছিলেন শ্রেষ্ঠতম ইমামুল মুহাদ্দিসীন ওয়াল ফোকাহা।

৩। গ্রন্থের মাধ্যমে হাদীসের বহুল প্রচার ও প্রসার

ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ) প্রধানত তিন ধরনের গ্রন্থ রচনা বা সংকলন করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এসব গ্রন্থ তিনি পবিত্র কোরআন, হাদীস ও আছার-এর ভিত্তিতে তৈরি করেছিলেন।

প্রথম, ঈমান ও আকাইদ বিষয়ের গ্রন্থাবলী। এসবের নাম প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে এবং বর্তমানে এসবের প্রতিলিপি বিশ্বের কোন কোন স্থানে রয়েছে তাও বলা হয়েছে। সে সব গ্রন্থ হতে 'আল-ফিকহুল আকবার' অনেক বার অনেক ভাষায় মুদ্রিত হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও এটা প্রকাশিত হয়েছে। মিসর থেকেও আকাইদের কয়েকটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিতীয়, ফিকাহ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী। কোরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে নির্মিত ইমাম আ'যমের ফিকাহর কিতাবাদি বিভিন্ন মাসয়ালার অধ্যায়ে শ্রেণীবদ্ধভাবে লিখিত

হয়েছিল। রিজাল ও ইতিহাস গ্রন্থে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আফসোস, সে সব সংকলন অনেক দিন আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখন দুনিয়ার কোন কুতুবখানাতেই সে সব সংকলনের ঠিকানা মিলে না। ইমাম রাযী (রাহ) লেখেছেন, আবু হানিফার কোন পুস্তকেরই বর্তমানে অস্তিত্ব নেই। ইমাম রাযী ৬০৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। এ হিসেবে কমপক্ষে আটশো বছর আগেই ইমাম আ'যমের কিতাবগুলো বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সেগুলো বিলুপ্ত হওয়া আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। ওই যুগের সকল কিতাবেরই আজ অস্তিত্ব নেই। ইমাম আওযায়ী, ইবনে জরীর, ইবনে আরূবা, সুফিয়ান সাওরী, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, হাম্মাদ ইবনে আবি মুয়াম্মার প্রমুখের কিতাবাদিও ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর কিতাবসমূহ প্রকাশের কালে প্রকাশিত হয়েছিল, অথচ তাঁদের কিতাবের নামও কেউ জানে না। ইমাম আবূ হানিফা (রাহ)-এর কিতাবাদি বিলুপ্ত হওয়ার প্রধান কারণ এই যে, তাঁর দু'জন মহান শিষ্য কাযী আবু ইউসুফ (রাহ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রাহ) নিজেদের উস্তাদের সংকলিত ফিকাহ বিষয়ক আইনগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা লেখেছিলেন। সে সব ব্যাখ্যা পুস্তক পরবর্তীকালে এতো বিপুলভাবে প্রচারিত হয়েছে যে, লোকে আসল কিতাব সম্বন্ধে মনোযোগী হয় নি। তাছাড়া পরবর্তীতে অসংখ্য ফকিহ-মনীষী এসবের আরও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বহু গ্রন্থ লেখেছেন। ঠিক একই ধরনে আরবী ব্যাকরণ 'নাহু' শাস্ত্রের উদগাতা আবু উবারদা প্রমুখের রচনাবলী পরবর্তীকালের ব্যাখ্যা লেখকগণের প্রভাবে বিলুপ্ত হয়েছিল। ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর মাসয়ালা এখন ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ এর সংকলনের মাধ্যমে দুনিয়ায় মওজুদ আছে।

প্রকৃতপক্ষে হানাফী ফিকাহ চার জনের সংকলিত আইন শাস্ত্র। তাঁরা হলেন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম যুফার, কাযী আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (রাহ)। কাযী আবু ইউসুফ (রাহ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রাহ) অনেক মাসয়ালায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। হানাফী ফকিহ্গণ লেখেছেন, ওই দু'জন মহান শাগরিদ স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা যে সকল মাসয়ালায় উস্তাদের সঙ্গে ইখতিলাফ করেছেন তাও প্রকৃতপক্ষে ইমাম আবু হানিফারই কথা। কারণ তিনি কোন কোন মাসয়ালাতে তাঁর একাধিক মতামত প্রদান করতেন। কাযী আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ ইজতিহাদ করার ক্ষমতা রাখতেন, উস্তাদের সাথে মতভেদ প্রকাশের অধিকারও তাদের ছিল। ইসলামের উন্নতি ওই সময় পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল যতদিন শিক্ষকের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে ছাত্রগণ স্বীয় মতামত অনায়াসে প্রকাশ করতে পারতেন।

তৃতীয়, হাদীস ও আছার সম্পর্কিত কিতাবাদি। এসব কিতাব বহু বছর পরে সংগৃহীত ও সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে ইমাম কাযী আবু ইউসুফ (রাহ). ইমাম মুহাম্মদ (রাহ), ইমাম যুফার (রাহ) ও ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ লু'লুয়ী (রাহ)-এর বর্ণিত মুসনাদে আছার এবং ইমাম হাম্মাদ ইবনুল ইমাম এর মুসনাদ তাঁদের জীবনকালেই সংকলিত হয়েছিল। ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রাহ) কর্তৃক ইমাম আ'যম (রাহ) হতে বর্ণিত হাদীস ও আছারের সংকলনগুলো ছিল অতি বিরাট আকারের গ্রন্থ। ইমাম মুহাম্মদ (রাহ)-এর সংকলন দু'টির নাম ছিল 'কিতাবুল আছার আল-মারফুআ' ও 'কিতাবুল আছার আল-মারফুআ ওয়াল মাওকুফা'। আরও ছয় জন ছাত্র তার লেখা হাদীসগুলো

গ্রন্থাকারে ও মুসনাদ আকারে সাজিয়েছেন। পরবর্তী বহু মুহাদ্দিস ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ)-এর বর্ণিত হাদীস ও আছার সংগ্রহ করে কিতাবাদি রচনা করেছেন। কেউ কেউ সেসব গ্রন্থের ব্যাখ্যা লেখেছেন বা সংক্ষেপণ করেছেন কিংবা টীকা লেখেছেন।

অনেকে মনে করেন যে, ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহ) অন্যান্য ইমাম যেমন ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ীর মত হাদীসের কোন কিতাব সংকলন করেন নি। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, তাঁর ও তাঁর সাথী-শিষ্যদের সংকলিত কিতাবাদি তাতারী হামলার সময় বাগদাদের বিশাল গ্রন্থাগার 'বায়তুল হিকমাহ' ধ্বংসের কারণে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পরে বিশ্বের বড় বড় প্রাচীন গ্রন্থাগারে রক্ষিত বা ব্যক্তিগত সংগ্রহ হতে তাঁদের কিতাবাদি নিয়ে আবার লিখিত হয়ে প্রচারিত হয়েছে।

পরবর্তীতে যারা ইমাম আ'যম (রাহ)-এর সংগৃহীত হাদীস বা আছার হতে সংকলন করে মুসনাদ বা মুসান্নাফ নির্মাণ করেছেন তাঁদের নাম এরূপ,

১। ইমাম হাফিয আবুল হুসাইন মুহাম্মদ ইবনে মুযাফ্ফর ইবনে মুসা ইবনে ঈসা আল-বাগদাদী (মৃ. ৩০০হি)।
২। ইমাম হাফিয আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আইউব হারেসী আল-বোখারী (মৃ.৩৪০ হি)। উস্তাদ আবদুল্লাহ আওতাদ নামে যিনি খ্যাত ছিলেন।
৩। ইমাম হাফিয আবুল কাসেম তালহা ইবনে মুহাম্মদ জাফর আস-শাহিদুল আদল (মৃ.৩৮০ হি)।
৪। ইমাম হাফিয আবু নাঈম আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইসপাহানী (মৃ. ৪৩০ হি)।
৫। আস-শায়খ আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকী ইবনে মুহাম্মদ আল-আনসারী (মৃ.৪৩৫ হি)।
৬। ইমাম আবু আহমদ আবদুল্লাহ ইবনে আদী আল-জুরজানী (২৭৭-৩৬৫ হি)।
৭। ইমাম হাফিয ওমর ইবনে হাসান আস-শায়বানী (মৃ. ৩৩৯ হি)।
৮। ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খালি আল-কালায়ী।
৯। ইমাম হাফিয আবুল কাসেম আবদুল্লাহ ইবনে আবুল আওয়াম আস-সা'দী (মৃত্যু-৩৩৫ হিজরী)।
১০। ইমাম হাফিয আবু আবদুল্লাহ আল-হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খসরু আল-বলখী (মৃ. ৫২৩ হিজরী)।
১১। ইমাম আবুল হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাবিব মাওয়ারদী (মৃ.৪৫০ হি)।

প্রধান বিচারপতি ইমাম আবু মুয়ীদ মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ ইবনে মুহাম্মদ আল-খাওয়ারিযমী (মৃ. ৬৬৫ হি) ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রাহ)-এর কিতাবসহ মোট পনরটি মুসনাদকে ফিকাহর দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচ্ছেদ সংযোজন করে বিন্যাস করেছেন। তবে যেসব হাদীস বার বার এসেছে তা বাদ দিয়েছেন এবং সনদের ক্ষেত্রেও বার বার উল্লেখিত রাবীর নাম বাদ দিয়েছেন। এ গ্রন্থের নাম দিয়েছেন 'জামেউ মাসানীদিল ইমাম আ'যম (রাহ)'। তিনি উক্ত গ্রন্থে তাঁর বক্তব্য লেখেছেন এভাবে, "আমি সিরিয়াতে কিছু মূর্খ লোককে ইমাম আবু হানিফার হাদীসের সংখ্যা এতো নগণ্য বর্ণনা

করতে শুনেছি যে, এতে ইমাম আ'যমের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়ে যায়। তারা ইমাম আ'যমের প্রতি হাদীসের কম সংখ্যা সম্বন্ধযুক্ত করতো এবং দলীল হিসাবে মুসনাদে শাফেয়ী ও মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক পেশ করতো এবং এই দাবি করতো যে, আবু হানিফার তো এমন কোন 'মুসনাদ' নেই। তিনি তো সামান্য কয়েকটি হাদীসই রিওয়ায়েত করেছেন। আসলে তারা (এসব মন্তব্য করে) দীনের অবমাননায় লিপ্ত ছিল বিধায় আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, বড় বড় মুহাদ্দিসগণ ইমাম আবু হানিফার লিখিয়ে দেয়া হাদীসের যে পনরটি মুসনাদ রচনা করেছেন আমি সেগুলো একত্র করবো"।

সুতরাং তা-ই হলো। আমি মুসনাদগুলোকে একত্র করলাম। 'জামেউ মাসানীদ' ছাপা হলো। সুদীর্ঘ আটশো পৃষ্ঠার এক বিশাল গ্রন্থ। ১৩৩২ হিজরীতে ভারতের হায়দ্রাবাদ হতে 'জামেউ মাসানীদ' প্রকাশিত হয়। আবুল বাকা মুহাম্মদ ইবনে আহমদ যিয়া আল-হানাফী (মৃ ৮৫৪ হি) এর সংক্ষেপণ করেন। তিনি এর নাম দেন 'আল-মুসতানিদে মুখতাসার আল-মুসনাদ'। এটা ইস্তামবুলের বিভিন্ন কুতুবখানায় রয়েছে।

মুহাক্কিক আলিমদের দৃষ্টিতে ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রাহ)-এর মুসনাদে আছার অন্যান্য মুসনাদ থেকে শক্তিশালী। এতে যেসব বর্ণনা ইমাম আ'যমের প্রতি আরোপিত এর বিশুদ্ধতা সকল প্রকার সন্দেহ ও সংশয়ের অনেক উর্ধ্বে। যদিও এ দু'টি গ্রন্থের সব হাদীস ইমাম আবু হানিফা (রাহ) স্বয়ং সংগ্রহ ও বিন্যাস করেন নি, বরং এর অধিকাংশ হাদীস সংগ্রহ করেছেন তার সুযোগ্য দু'জন প্রখ্যাত শিষ্য (সাহিবাইন)। ইমাম যুফারের 'কিতাবুল আছার'-এর অধিকাংশ হাদীস ইমাম আ'যম থেকে বর্ণিত। অন্যান্য ছাত্রদের মুসনাদ তিনি স্বয়ং সংগ্রহ করেছেন তারপর বিন্যস্ত করেছেন। আর পরিচ্ছেদ আকারে বিন্যাসের কাজ সমাধান করেছেন পরবর্তী বর্ণনাকারিগণ। তবে সামগ্রিকভাবে এসব মুসনাদ ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ)-এর প্রতি আরোপ করা কোন দিক দিয়েই দূষণীয় নয়। কারণ সেকালে এমনটিই হতো।

হাফিয আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ হারেসী (রাহ) তিন শতাব্দী পরে ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর হাদীসসমূহে মনোযোগ দিয়েছেন এবং ইমাম আ'যমের উস্তাদগণের ক্রমানুসারে তা সংকলন করেছেন। তারপর হাফিয আবু বকর মুকরী রাহ (মৃ ৩৮১ হি) মারফূ হাদীসগুলোকে হারেসী সংকলিত মুসনাদ থেকে আলাদা করে একত্রিত করেছেন। যা আকারে 'মুসনাদে হারিসী' থেকে অনেকটা ছোট। ঠিক এই আঙ্গিকেই হাফিয আবুল হুসাইন মুহাম্মদ ইবনে মুযাফফর-এর সংকলিত 'মুসনাদে আবু হানিফা' ররেছে। আর এটি সেই মুসনাদে আবু হানিফা যার রাবীদের নামের তালিকা ও জীবনী বর্ণনার জন্য হাফিয আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আল-হামযা হুসাইনী (মৃ. ৪২২ হি)কে মনোনীত করা হয়েছিল। আর সেটাই হলো হুসাইন ইবনে খসরু- এর মুসনাদে আবু হানিফা। তাঁর মুসনাদে মূলের চেয়ে আরও কিছু বেশি রয়েছে, যা হারেসী বা ইমাম মুকরীর মুসনাদে নেই। মুসনাদে আবু হানিফার রিওয়ায়েত এর মতবিরোধ এবং এর সংগ্রহ, বিন্যাস ও সুংহতকরণের বর্ণনা দিতে গিয়ে হাজী খলিফা মুস্তফা ইবনে আবদুল্লাহ (মৃ. ১০৬১হি) তাঁর 'কাশফুয যুনুন আন আসমায়িল কুতুবি ওয়াল ফুনুন' গ্রন্থে বলেন,

"শায়খ কাসেম ইবনে কাতলবুগা (রাহ) এ মুসনাদকে স্বয়ং হারেসীর বর্ণনা মুতাবিক ফিকাহর অনুচ্ছেদ আঙ্গিকে বিন্যাস করেছেন। এর পর এর টীকা-টিপ্পনী লেখেছেন। গ্রন্থটি দু'খন্ডে সংকলিত। জামালউদ্দীন মাহমুদ ইবনে আহমদ কুনুবী দামেস্কী (মৃ. ৭৭০ হি) মুসনাদে আবু হানিফা (রাহ)কে 'আল-মুতামিত' নামে সংক্ষিপ্ত আকারে সাজিয়েছেন এবং 'আল-মুসতানিদ' নামে এর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ লেখেছেন। ইমাম আবু মুয়ীদ মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ খাওয়ারিযমী (রাহ) মুসনাদের বর্ধিত অংশ সংগ্রহ করেছেন"।

বর্তমানে মাত্র কয়েক জনের সংগৃহীত 'মুসনাদে আবু হানিফা (রাহ)' ছাড়া অন্যান্যগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই। তবে এগুলোর প্রাচীন প্রতিলিপি বিশ্বের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। মুসলিম বিশ্বের ইস্তাম্বুল, আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো, দামেস্ক, আঙ্কারা প্রভৃতি স্থানের গ্রন্থাগারে এরূপ প্রতিলিপি রয়েছে।

যাহোক, ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর প্রতি আরোপিত আরও কয়েকটি মুসনাদের সংগ্রাহক নিম্নরূপ,

১। আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল-মুকরী (মৃ. ৩৮১ হি)।
২। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মান্দাহ (মৃ.৩৯৫ হি)।
৩। হুসামউদ্দীন আলী ইবনে আহমদ ইবনে মক্কী আর-রাযী (মৃ-৫৯৮ হি)।
৪। মুসা ইবনে যাকারিয়া ইবনে ইবরাহীম আল-হাসকাফী (মৃ. ৬৫০ হি)। তাঁর সংকলনটি ভারত, মিসর, সিরিয়া ও পাকিস্তান হতে প্রকাশিত হয়েছে।
৫। কাসেম ইবনে কাতলবুগা ইবনে আবদুল্লাহ আল-মিসরী যাইনুদ্দীন আবু আদল আল হানাফী (৮০২-৮৭৯ হি)।
৬। মুহাম্মদ আবেদ ইবনে আহমদ আলী ইয়াকুব আনসারী হানাফী আল-সিন্ধী (মৃ.১২৫৭ হি)। তাঁর গ্রন্থের নাম 'মুরাত্তাব মুসনাদে ইমাম আ'যম'। এটি ফিকাহর অধ্যায় অনুসারে বিন্যস্ত। এই গ্রন্থটি ইমাম বোখারীর 'আদাবুল মুফরাদ' এর হাশিয়ায় ১৩০৪ হিজরীতে ভারতে প্রকাশিত হয়। এটা পৃথকভাবেও কায়রো হতে ১৩১৮ হিজরীতে প্রকাশিত হয়। 'আল-মাওয়াহিবুল লতিফা আ'লা মুসনাদিল আবি হানিফা' নামে এর একটি ভাষ্যগ্রন্থ রয়েছে। এতে নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি হতে ভাষ্যকার এমন সব হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন, যা মুসনাদের হাদীসগুলোকে সমর্থন করে।
৭। মুহাদ্দিস মুহাম্মদ হাসান লখনোভী (মৃ ১৩০৯ হি)।
৮। আবু হাফ্স ওমর ইবনে আহমদ ইবনে শাহীন (মৃ.৩৮৫ হি)।
৯। আবুল হাসান আলী ইবনে ওমর দারাকুতনী (৩০৫-৩৮৫হি)।
১০। আবু বকর আহমদ ইবনে আলী খতীব বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হি)।
১১। ইবনে উকদা (রাহ)। (আল্লামা সুউতি তাঁকে একজন বড় হাফিযে হাদীস ও বিশ্বস্ত বলেছেন)। তাঁর মুসনাদে ইমাম আ'যম হতে হাজারের অধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
১২। হাফিয আবুল কাসেম আলী ইবনে হাসান ইবনে আসাকির, রাহ. (৪৯৯-৫৭১ হি)।
১৩। মুহাদ্দিস আল-ওহবী (রাহ)।

ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর প্রতি আরোপিত মুসনাদের অনেক শরাহ রয়েছে। এর কয়েকটির পরিচয়,

১। 'তানভীরুস সানাদ ফী ঈযাহী রামমিল মুসনাদ'। রচয়িতা ওসমান ইবনে ইয়াকুব ইবনে হুসাইন ইবনে মুস্তাফা আল-কামাসী। (১১৬৬ হিজরীতে ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত)।

২। 'কিতাব যিকর মান রাওয়া আনহু আবু হানিফা'। রচয়িতা অজ্ঞাত। আঙ্কারা ও ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত।

৩। 'কিতাব মাশিখাত আবি হানিফা'। রচয়িতা আবু উমাইয়া মারওয়ান ইবনে স্কওবান, কায়রোতে সংরক্ষিত।

৪। 'কিতাবুল আরবাঈন আল-মুখতারাত মিন হাদীসিল ইমাম আবু হানিফা'। রচয়িতা ইউসুফ ইবনে আবদিল হাদী (৯০৯ হিজরীতে দামেস্ক হতে প্রকাশিত হয়)।

৫। 'আওয়ালী আল-ইমাম আবি হানিফা' নামে সংগৃহীত, দামেস্কে রক্ষিত।

৬। 'মুসনাদ ইমাম আ'যম কৃত 'উস্তাদ খুরশিদ আলম, দেওবন্দ, উর্দু অনুবাদ।

কিতাবুল আছার
ইমাম আ'যম (রাহ)-এর অমর কীর্তি

তাবেয়ী মুহাদ্দিসদের সংকলিত হাদীস গ্রন্থাবলী স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লয়ে পরবর্তী মুহাদ্দিসদের নিকট পৌঁছে নি। এদিক দিয়ে 'কিতাবুল আছার' একমাত্র ব্যতিক্রম। ইমাম আবু হানিফা (রাহ) কুফার শিক্ষা কেন্দ্রের প্রধান নিযুক্ত হয়ে এলমে ফিকাহর ভিত্তি স্থাপন করেন। তখনই তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ-নিষেধমূলক হাদীসগুলোরও একটি সংকলন নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংগৃহীত হাদীসসমূহের সমন্বয়ে রচনা করেন। 'এই গ্রন্থের নামই হলো 'কিতাবুল আছার'। মুসলিম উম্মতের নিকট মওজুদ হাদীস গ্রন্থাবলীর মধ্যে এটাই সর্বাধিক প্রাচীন হাদীস গ্রন্থ। হাদীস গ্রন্থে পরিচ্ছেদ (কিতাব) ও 'বাব' অধ্যায় হিসাবে গ্রন্থ প্রণয়নের ধারা ও পদ্ধতি অনুসারে সুসংকলিত করার কাজ তখন পর্যন্ত অসম্পন্নই ছিল। ইমাম আবু হানিফা (রাহ) 'কিতাবুল আছার' প্রণয়ন করে এই দায়িত্ব বিশেষ যোগ্যতা ও বিজ্ঞতার সাথে পালন করেন। তাঁর 'কিতাবুল আছার' সম্পর্কে হাদীস বিশেষজ্ঞ মনীষীদের পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর অভিমত রয়েছে।

কিতাবুল আছার-এ মূলত মারফু ও মাওকুফ হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। ইমাম আ'যমের প্রধান সাথী ও শিষ্যগণের কয়েকজন এই কিতাবটি বর্ণনা করেছেন, এ বিষয়ে আগে কিছু আলোচনা হয়েছে। তাঁর শিক্ষামূলক অবদানসমূহের মধ্য থেকে 'কিতাবুল আছার' নামক গ্রন্থটি হাদীস শাস্ত্রে তাঁর উচ্চ মর্যাদার সাক্ষ্য বহন করছে। এই কিতাবটি ফিকাহ শাস্ত্রের অধ্যায়সমূহের ধারায় বিন্যস্ত হাদীসের প্রথম কিতাব। আল্লামা সুউতি (রাহ) 'তাবয়িদুস সাহীফা' গ্রন্থে বলেছেন, "হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর মর্যাদা কিছুতেই কম নয়, কারণ তিনিই সর্বপ্রথম ফিকাহর বিষয়ের অধ্যায়সমূহের ধারায় বিন্যস্ত হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেছেন। এটাই কিতাবুল আছার। এ ব্যাপারে তিনি অনন্য, একক। এ মর্যাদা অপর কেউ লাভ করতে পারেন নি। ইমাম আ'যম (রাহ)-এর 'কিতাবুল আছার' গ্রন্থটি মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক এর উৎস গ্রন্থের মর্যাদা রাখে। কেননা, হাফিয যাহাবী (রাহ) তাঁর 'মানাকিব' গ্রন্থে কাযী আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবুল আওয়াম (রাহ)-এর 'আখবারে আবি হানিফা' কিতাবের বরাত দিয়ে অবিছিন্ন সূত্রে মুহাদ্দিস আবদুল আযীয দারাওয়ার্দী (রাহ)-এর এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, 'ইমাম মালিক (রাহ) ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করতেন এবং সেগুলো দ্বারা উপকৃত হতেন"।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ) বলেন, "ইমাম আবু হানিফার বর্ণিত স্বতন্ত্র হাদীস গ্রন্থ বর্তমান আছে। আর তা হলো 'কিতাবুল আছার'। এটা তাঁর নিকট থেকে মুহাম্মদ ইবনে হাসান বর্ণনা করেছেন"।

এতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো যে, ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর কিতাবুল আছার-এর স্থান ইমাম মালিক (রাহ)-এর মুয়াত্তার তুলনায় এরূপ, বোখারী ও মুসলিমের তুলনায় মুয়াত্তার স্থান যেরূপ। ইমাম বোখারী (রাহ) যেমনিভাবে নিজের সহীহ গ্রন্থটি ছয় লক্ষ হাদীস থেকে নির্বাচন করে বিন্যস্ত করেছেন, তেমনিভাবে ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-ও 'কিতাবুল আছার' অসংখ্য হাদীস থেকে নির্বাচন করে বিন্যস্ত করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রাহ) ইমাম বোখারী (রাহ)-এর অগ্রজ ছিলেন, তাঁর সময়ে হাদীসের সনদ ও বর্ণনাধারায় এতো আধিক্য ও ব্যাপকতা সৃষ্টি হয় নি। এজন্য ইমাম আ'যম (রাহ)-এর নির্বাচন চল্লিশ হাজার হাদীসের মধ্য থেকে করা হয়েছে। যেমন আল্লামা মুয়াফফেক আল-মক্কী (রাহ) 'মানাকিবুল ইমামিল আযম' গ্রন্থে (১৩২১হিজরীতে ভারতে মুদ্রিত ,১ম খন্ড ৯৫ পৃষ্ঠায়) আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ আয-যাবানযারী (রাহ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, "আবু হানিফা (রাহ) চল্লিশ হাজার হাদীস থেকে ছাঁটাই-বাছাই করে 'কিতাবুল আছার' নামক গ্রন্থে হাদীস নির্বাচন করেছেন"। পরবর্তীতে মোল্লা আলী কারী (রাহ) তাঁর রচিত 'মানাকিব' গ্রন্থে বলেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রাহ) ৪০ হাজার হাদীস থেকে (কিতাব) আল-আছার সংকলন করেছেন। আবার আল্লামা মুয়াফফেক (রাহ)-ই হাফিয আবু ইয়াহিয়া যাকারিয়া ইবনে ইয়াহিয়া নিশাপুরী (রাহ)-এর 'মানাকিবি আবি হানিফা' গ্রন্থের বরাতে তাঁর নিজস্ব সনদে ইয়াহিয়া ইবনে নসর ইবনে হাজিব (রাহ) থেকেও উদ্ধৃত করেন, "আমি আবু হানিফা (রাহ)কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, আমার কাছে হাদীসের কতগুলো সিন্দুক আছে, সেগুলো থেকে মানুষ উপকৃত হওয়ার মত সামান্য কিছুই বের করেছি মাত্র"। তাছাড়া আল্লামা মুরতযা যুবাইদী (রাহ) 'উকুদুল জাওয়াহিরিল মুনিফা' নামক গ্রন্থে হাফিয আবু নাঈম ইস্পাহানী (রাহ)-এর সনদে ইয়াহিয়া ইবনে নসর (রাহ)-এর এ বাণী উদ্ধৃত করেছেন, "আমি একবার আবু হানিফা (রাহ)-এর কাছে গেলাম, তখন দেখলাম তাঁর কক্ষটি বই-পুস্তকে ভরা আছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত, এগুলো কি? তিনি উত্তর দিলেন, 'এগুলো সবই হাদীসের কিতাব"। এসব ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে যায়, 'কিতাবুল আছার' গ্রন্থটিতে যতগুলো হাদীস বিদ্যমান আছে সেগুলো ইমাম আ'যম (রাহ)-এর আহরিত সব হাদীস নয়। বরং সেগুলো থেকে সংক্ষিপ্ত ধরনের নির্বাচন। যাহোক, ইমাম আ'যম (রাহ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব হলো হাদীসের যতগুলো কিতাব তাঁর সময়ে প্রচলিত ছিল, সেগুলোর মধ্যে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ বিন্যস্ত কিতাব হলো তাঁর সংকলিত 'কিতাবুল আছার'।

হাদীস শাস্ত্রে 'কিতাবুল আছার' গ্রন্থটির স্থান কিরূপ তা অনুমান করা যায় সে যুগের হাদীসবিদদের উক্তি থেকে। তাঁরা নিজ শিষ্যদেরকে শুধু গ্রন্থটি অধ্যয়নের পরামর্শ দিয়েছিলেন তা নয়, বরং বিশেষ গুরুত্বারোপ করে বলেছিলেন, "এ গ্রন্থ অধ্যয়ন ছাড়া

ফিকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা যাবে না" । এসব বাণী ইমাম আ'যম (রাহ)-এর জীবন চরিত বিষয়ক গ্রন্থাবলীতে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে ।

মুহাদ্দিসগণ 'কিতাবুল আছার'-এর যেরূপ পরিচর্যা করেছেন এতে অনুমিত হয় যে, এ গ্রন্থটি তাঁদের নিকট কত গুরুত্ববহ ও মর্যাদার অধিকারী । এজন্য গ্রন্থটির অনেক শরাহ-ভাষ্য লিখিত হয়েছে । আল্লামা ইবনে হুমাম (রাহ) এর শিষ্য হাফিয যাইনুদ্দীন কাসেম ইবনে কাতলবুগা (রাহ) 'কিতাবুল আছার'-এর ব্যাখ্যা এবং 'কিতাবুল আছার'-এর সনদে আগত ব্যক্তিগণের ওপর একটি চরিতাভিধান লেখেছেন, যার নাম 'আল-ঈসারু লিযিকরি রুওয়াতিল আছার' । এ কিতাবটির আলোচনা স্বয়ং হাফিয ইবনে হাজার (রাহ) তাঁর 'তা' জীলুল মুনিফা বিযাওয়ায়েদে রিজালিল আরবাআ' নামক কিতাবে উপস্থাপন করেছেন । গ্রন্থে 'কিতাবুল আছার' এর সব বর্ণনাকারীর আলোচনাই স্থান পেয়েছে । কেননা এ কিতাবটি হাফিয ইবনে হাজার (রাহ) চার ইমাম অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা (রাহ), ইমাম মালিক (রাহ), ইমাম শাফেয়ী (রাহ) ও ইমাম আহমদ (রাহ) এর হাদীস বর্ণনাকারী ব্যক্তিদের আলোচনায় লেখেছেন । এ গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁর উদ্দেশ্য যে চার ইমাম থেকে হাদীস বর্ণনাকারী ব্যক্তিদের আলোচনা করা. তা তিনি গ্রন্থের ভূমিকাতে সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন । একইভাবে হাফিয আবু বকর ইবনে হামযা 'আল-হুসাইনী (রাহ) 'আত-তাযকিরা লি রিজালিল আশারা' নামে একটি কিতাব লেখেছেন । এতে বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীস গ্রন্থ এবং চার ইমাম থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের আলোচনা করেছেন । এতেও 'কিতাবুল আছার' -এর সব বর্ণনাকারীর আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে ।

ইমাম আ'যম (রাহ)-এর অমর কীর্তি 'কিতাবুল আছার' সহ আরও যত হাদীস তিনি সংগ্রহ করেছিলেন এর সংখ্যা ছিল ৭০ হাজারের বেশি । বড় বড় মুহাদ্দিস তথা হাদীসবিশারদগণ ইমাম আ'যম বর্ণিত ও সংগৃহীত হাদীসগুলো নিয়ে মুসনাদ সংকলন করেছেন । এসব মুসনাদের সংখ্যা বিশের অধিক । প্রধান বিচারপতি আল্লামা আবু মুয়ীদ খাওয়ারিযমী (রাহ) ১৫টি মুসনাদ একত্র করে 'জামেউ মাসানীদ' তৈরি করেন (বিষয়টি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) । এ গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে, ইমাম আযম (রাহ) পাঁচ লাখ ফিকাহর মাসয়ালা নির্ধারণ করেছেন । সুতরাং তাঁর সংগৃহীত হাদীস ও আছারের সংখ্যা অন্তত লাখের নিকট হবে । অথচ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তিনি সতেরটি হাদীস জানতেন । তিনি চার হাজার উস্তাদ থেকে হাদীসের জ্ঞান আহরণ করেছেন । এতো সব উস্তাদের নিকট থেকে তিনি কি মাত্র সতেরটি হাদীস শিখলেন? বড়ই আশ্চর্যের কথা, তিনি কি অসংখ্য মাসয়ালা নির্ধারণ করলেন এই সতেরটি হাদীস থেকে? প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন (রাহ) ক্বীলা শব্দ যোগ করে অত্যন্ত দুর্বল শব্দ দ্বারা উদ্ধৃত করে 'আবু হানিফা সতেরটি হাদীস জানতেন' বলেছেন । এর বক্তার কোন খবর নেই, সনদ-সূত্র নেই, কথিত আছে, কার থেকে কথিত আছে? কিছু এতে বলা নেই । একথাই প্রমাণ করে যে, ইবনে খালদুন (৭৩২-৮০৮হি) নিজেই তা বিশ্বাস করতেন না । তাছাড়া ইমাম আ'যম সম্পর্কে ইবনে খালদুনের কথিত সতের হাদীসের কথা আমাদের পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরাম কেউ জানেন না । ইবনে খালদুনই প্রথম ব্যক্তি যিনি একথা বলেছেন বলে কথিত আছে । বরং আমরা এর বিপরীত অভিমত পাই যে, উলামায়ে মুতাকাদ্দিমীন বলেছেন, 'আবু হানিফার নিকট বিপুল সংখ্যক

সহীহ হাদীস মওজুদ ছিল' । এমন কি ইবনে খালদুন (রাহ) তাঁর মোকদ্দমা গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৪৪৫ মিসরে মুদ্রিত) বলেছেন, 'এলমে হাদীসে ইমাম আবু হানিফাকে বড় বড় মুজতাহিদদের মধ্যে গণ্য করার দলীল হলো, তাঁর মাযহাবের ওপর গ্রহণ-বর্জন হিসাবে উম্মত ভরসা করেছে । এখানেই ইমাম আ'যমের বড় মুহাদ্দিস হওয়ার প্রমাণ রয়েছে' ।

ইমাম আ'যম (রাহ)-এর সতেরটি প্রসিদ্ধ মুসনাদ রয়েছে । ইবনে খালদুন (রাহ) হয়তো সেই সতেরটি মুসনাদের কথা বলে থাকবেন । এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য হলো, আল্লামা মুহাম্মাদ যাহেদ কাওসারী মিসরী রাহ. (মৃ.১৩৭১ হি) তাঁর 'শুরুতুল আইম্মাতিল খামসা লিল হাযিমী' গ্রন্থের পার্শ্বটীকার ৫০ পৃষ্ঠায় লেখেছেন যে, প্রকৃত পক্ষে ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর প্রচলিত হাদীসগুলো এরূপ সতেরটি ভলিউমে আছে, যেগুলোর সবচে' ছোট ভলিউমটিও 'সুনানুস শাফেয়ী বি রিওয়ায়েতিত তাহাভী' এবং 'মুসনাদুস শাফেয়ী বি রিওয়ায়েতি আবিল আব্বাস আল-আসাম্ম' এর চেয়ে বড় । আল্লামা ইবনে খালদুন (রাহ) উপরোক্ত সতেরটি ভলিউমের কথা বলেছেন, সতেরটি হাদীসের কথা নয় । যা অবাস্তব ও মিথ্যা । আর সতেরটি হাদীস জেনে তো কেউ 'হাফিযে হাদীস' হতে পারে না । অথচ ইমাম আবু হানিফা (রাহ)কে প্রখ্যাত হাদীস-বিশেষজ্ঞ আল্লামা যাহাবী (রাহ) 'হাফিযে হাদীস' বলে আখ্যায়িত করেছেন । আসলে আসহাবে সিহাহ সিত্তাহর অনেক বর্ণনাকারী ইমাম আযম (রাহ) সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি অনেক হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন । এসব বর্ণনাকরী মিথ্যা বলে থাকলে তো বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ ইত্যাদি হাদীসের গ্রন্থ দোষযুক্ত হয়ে অগ্রহণীয় হয়ে যায় । সুতরাং ইমাম আ'যম (রাহ)-এর হাদীসের জ্ঞান সম্পর্কে মন্তব্য করার সময় সাবধান হতে হবে । নতুরা ঈমানহীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে ।

মিসরীয় মুহাদ্দিস হাফিয মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহানী (রাহ) বলেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রাহ) শ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদীস ও শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস ছিলেন । তিনি সেই সতেরটি মুসনাদের সংকলনকারী মুহাদ্দিসদের সনদসমূহের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন (উকুদুল জুম্মান) । সিরীয় মুহাদ্দিস হাফিয শামসুদ্দীন ইবনে তুলুন (রাহ) তাঁর 'আল-ফিরিস্তি আল-আওসাত' গ্রন্থে সেই সতেরটি মুসনাদের সনদসমূহ বর্ণনা করেছেন ।

ইমাম আ'যম (রাহ)-এর জনৈক শিষ্যের উক্তি হচ্ছে যে, ইমাম আ'যমের রচনাবলীতে সত্তর হাজার হাদীস পাওয়া যায় । প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও হাদীস নিরীক্ষক মোল্লা আলী কারী (রাহ) ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সামআ (রাহ) থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, 'ইমাম আবু হানিফা (রাহ) স্বীয় গ্রন্থসমূহে সত্তর হাজারের বেশি হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন' (মানাকিব) । অর্থাৎ ইমাম আ'যম (রাহ)-এর নিকট বহু হাদীস মওজুদ ছিল । যারা তাঁর সংগৃহীত হাদীস সংখ্যা কম উল্লেখ করেছে তারা মূর্খ, অর্বাচীন ও মিথ্যাবাদী ।

এখানে আরও একটি বিষয় রয়েছে । হাদীস শাস্ত্রবিদদের নিকট হাদীস বর্ণনা করার পন্থা ছিল দু'টি ।

১ । কখনো বর্ণনাকরী সরাসরি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্কিত করে হাদীস বর্ণনা করেন । ২ । কখনো সতর্কতার জন্য নবী (ছা)-এর সাথে সম্পর্কিত করার পরিবর্তে নিজস্ব উক্তিরূপে ফিকাহ শাস্ত্রের মাসয়ালার আকারে বর্ণনা করে দিতেন । এটা ছিল তাঁদের চূড়ান্ত সতর্কতা । যাতে তাদের উদ্ধৃতিতে যদি কোন ত্রুটি হয়ে

যায় সেটা যেন নবী করিম (ছা)-এর সাথে সম্পর্কিত না হয়। সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্যকার যেসব মনীষী হাদীসের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতাপরায়ণ ছিলেন, তাঁরা সাধারণত দ্বিতীয় পদ্ধতিই অবলম্বন করতেন। যেমন হযরত ওমর (রা)-এর অধিকাংশ বর্ণনা এ প্রকারেরই ছিল। এর প্রমাণ হলো, হযরত ওমর (রা) থেকে যেসব মারফু হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর সংখ্যা পাঁচ শতাধিক কিন্তু হাজারের কম। মুহাদ্দিসদের পরিভাষা অনুসারে তাঁকে মধ্যস্তরের বর্ণনাকারীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। কিন্তু শাহ ওয়ালীউল্লাহ, রাহ. (১১১৪-১১৭৬ হি) 'ইযালাতুল খাফা আন খেলাফাতিল খোলাফা' গ্রন্থে বলেছেন, তাঁকে অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে গণ্য করা উচিত। মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় 'মুকাসসিরীন' সেসব হাদীস বর্ণনাকারীকে বলা হয়, যাঁদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হাজারের বেশি। শাহ সাহেব হযরত ওমর (রা)কে অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে গণ্য করার কারণ বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলো নিজস্ব উক্তি আকারে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপ কোন কোন তাবেয়ীর প্রসিদ্ধ উক্তি হলো, "রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এ কথা বলার চেয়ে আলকামা বলেছেন অথবা আবদুল্লাহ বলেছেন, এরূপ বলা আমাদের কাছে অধিকতর পছন্দনীয়"।

এ ধরনের আরও কিছু ঘটনা মাওলানা যাফর আহমদ ওসমানী, রাহ. (১৩১০-১৩৯৪হি) তাঁর 'ইনজাউল ওয়াতান আনিল ইযদিরাই বি-ইমামিয্ যামান' নামক গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ববর্তী মনীষীরা অনেক মারফু হাদীস নিজস্ব উক্তিরূপে ফিকাহর মাসয়ালার আকারে উল্লেখ করে দিতেন। যদি এ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়, তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা সত্তর হাজার হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ইমাম আ'যম (রাহ) এ পদ্ধতিটা অবলম্বন করেছিলেন। এ বাস্তবতা সামনে রেখে ইমাম মুহাম্মদ (রাহ) প্রমুখ ইমাম, ইমাম আবু হানিফা (রাহ) থেকে যেসব মাসয়ালা বর্ণনা করেছেন, যদি সেসব অধ্যয়ন করা হয়, তাহলে সে সবের মধ্যে এরূপ অসংখ্য মাসয়ালা পরিলক্ষিত হবে যা সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ছা)-এর হাদীস থেকে উদ্ধৃত। এমতাবস্থায় ইমাম আ'যম (রাহ)-এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা সত্তর হাজারের অধিক হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। বাস্তব ঘটনা হলো, ইমাম আবু হানিফা (রাহ) হাদীস বর্ণনাকে নিজের আসল কর্মব্যস্ততায় পরিণত করার পরিবর্তে তা হতে শরীয়তের আহকাম বা বিধি-বিধান উদ্ভাবনকে নিজের অভীষ্ট লক্ষ্য রূপে বেছে নিয়েছিলেন। তাই তাঁর অনেক বর্ণনা হাদীস আকারে আর অবশিষ্ট থাকে নি। বরং সেগুলো ফিকাহ শাস্ত্রের মাসয়ালার আকারে পরিণত হয়ে অবশিষ্ট রয়েছে (কাশফুল বারী শারহুল বুখারী, ১ম খন্ড ভূমিকা)।

তৃতীয় অধ্যায়

ইমাম আ'যম (রাহ) সম্পর্কে জ্ঞানী-গুণী মনীষী ও ফিকাহ-হাদীসের খ্যাতনামা ইমাম সাহেবদের অভিমত

শাস্ত্রীয় জ্ঞানে মহাপন্ডিত ইমাম আ'যম সম্পর্কে প্রতি যুগের জগৎ বিখ্যাত উলামা কিরাম ও ইমামগণের উক্তি ও প্রশংসা বাণী একত্রিত করলে একটি বড় গ্রন্থ নির্মিত হবে। আর 'মানাকিবে ইমাম আবু হানিফা' শিরোনামে রচিত অসংখ্য গ্রন্থেও তাঁর জ্ঞান-গরিমার বিশ্লেষণমূলক, মর্যাদা-সূচক বাণী রয়েছে। সে সব হতে এখানে সামান্য উদ্ধৃতি দেয়া হলো। এসব থেকে দিবালোকের মত প্রতীয়মান হবে যে, ইমাম আবু হানিফা (রাহ) ছিলেন,

(ক) এক অসাধারণ পন্ডিত ব্যক্তিত্ব। অত্যন্ত এবাদতগোযার, দুনিয়া-বিমুখ, উঁচুস্তরের আল্লাহভীরু ও রাসূল-প্রেমিক আবেদ ও যাহেদ।

(খ) মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছা) এবং উম্মতে মুসলিমার কল্যাণ কামনায় নিবেদিত প্রাণ এবং অত্যন্ত দানশীল ও দয়ালু ব্যক্তি।

(গ) মানবপ্রেমিক পরোপকারী, ন্যায়পরায়ণ, সত্যপরায়ণ, ধৈর্যশীল ও সর্বদা নিষিদ্ধ কাজ হতে পরহিযকারী ব্যক্তিত্ব।

(ঘ) আহকামে ফিকাহ তথা ফিকাহ শাস্ত্রের জন্মদাতা, শ্রেষ্ঠতম ও বিজ্ঞ ফকিহ এবং মুজতাহিদ ইমাম।

(ঙ) ইমামুল মুফাসসির ও ইমামুল মুহাদ্দিসীন, শ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদীস ও হাফিযে কোরআন এবং হাদীসের পরিচর্চায় ও প্রচার-প্রসারে নিবেদিত-প্রাণ সফল ব্যক্তি।

১। শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, যুক্তিবিদ, মুনাযির ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরিস আস-শাফেয়ী রাহ. (১৫০-২০৪ হি) ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বলেন, " ফিকাহর জ্ঞানে মানব জাতি ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর পরিবারভুক্ত"। অর্থাৎ তিনি এলমে ফিকাহর মূল শিক্ষক আর সবাই ছাত্র।

২। সাইয়েদুল মুহাদ্দিসীন ইমাম সোলায়মান আমাশ (রাহ) বলেন, "নি:সন্দেহে আবু হানিফা একজন মহান ফকিহ"।

৩। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবদুল আযীয ইবনে জুরাইজ, রাহ. (মৃ.১৫০হি) বলেন "এলেম তথা জ্ঞানে তিনি (ইমাম আবু হানিফা) উচ্চ মাকাম দখল করে নিয়েছেন। তিনি উচ্চস্বরে বলতেন, 'আবু হানিফা (রাহ) একজন মহান ফকিহ, একজন মহান ফকিহ'।

৪। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, জ'রাহ ও তা'দীলের ওপর প্রথম কিতাব লেখক এবং ইমাম বোখারী (রাহ)-এর দাদা উস্তাদ ইমাম ইয়াহিয়া ইবনে সায়ীদ আল-কাত্তান, রাহ. (১২০-১৯৮) বলেন, "আল্লাহর কছম, আবু হানিফা (রাহ) বর্তমান মুসলিম উম্মতের মধ্যে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নত সম্পর্কে বেশি বিজ্ঞ ফকিহ আলিম"।

ইমাম আল-কাত্তান (রাহ) স্বীয় যুগের বড় মাপের মুহাদ্দিস ও আসমায়ে রিজাল শাস্ত্রের প্রথম স্তরের সংকলক এবং সিহাহ সিত্তাহর সব কিতাবে তাঁর থেকে রিওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'আল্লাহ সাক্ষী, আমরা মিথ্যা কথা বলতে পারি না। আমরা ইমাম আবু হানিফা (রাহ) থেকে বড় কোন 'সাহেবুর রায়' তথা সঠিক সিদ্ধান্তদাতা

পাই নি। আর আমরা তাঁর কথা সংকলন করেছি। আমরা তাঁর মজলিসে বসতাম, তাঁর থেকে ফায়েয অর্জন করতাম। আল্লাহর কছম, যখনই আমি তাঁর চেহারার দিকে তাকাতাম, তখন আমার ইয়াকিন হতো যে, তিনি মহাশক্তিধর আল্লাহর ভয়ভীতিতে সর্বতোভাবে গুণান্বিত ও চরিত্রবান।

৫। বিখ্যাত মুহাদ্দিস কায়েস ইবনে রাবী (রাহ) বলেন, "যে সব মাসয়ালা সংঘটিতব্য সেগুলো সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন"।

৬। বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা কিরমানী শাফেয়ী, রাহ. (মৃ. ৭৮৬ হি) সহীহ বোখারীর ভাষ্যগ্রন্থে বলেন, "ফিকাহ হানাফীতে যদি মহান আল্লাহর গোপন রহস্য না থাকতো, তাহলে ইসলামের অর্ধেক জ্ঞানের সমাবেশ এর মধ্যে করতেন না এবং এতো বিপুল সংখ্যক লোক এর অনুসরণ করতো না, এমন কি আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকও তাঁর (ইমাম আবু হানিফার) ফিকাহ গ্রহণ করতেন না। আর আজ থেকে সাড়ে চারশো বছর পর্যন্ত তাঁর ফিকাহ ও রায়ের ওপর গণ-মানুষ আমল করতো না। আর এটাই তাঁর বিশুদ্ধতার প্রথম দলীল" (আল-মুগনী)।

৭। আল্লামা মুওয়াফফেক ইবনে আহমদ আল-মক্কী আল-খাওয়ারিযমী, রাহ. (মৃ. ৫৬৮হি) স্বীয় সনদে আবু মুকাতিল হাফ্স ইবনে সালেম সমরকান্দী (রাহ) এর সূত্রে বর্ণনা করেন, "ইমাম আবু হানিফা (রাহ) বলেন, প্রত্যেকটি হাদীস যা নবী করিম (ছা) বলেছেন এবং যা সহীহ সনদে প্রমাণিত চাই তা আমরা আমাদের উস্তাদের নিকট থেকে শুনেছি অথবা শুনি নি তা আমাদের মাথার মুকুট বা শিরোমণি"।

৮। মালিকী মাযহাবের প্রবর্তক ইমাম মালিক, রাহ (৯৩-১৭৯ হি) বলেন, "নিঃসন্দেহে ইমাম আবু হানিফা (রাহ) একজন মস্ত বড় ফকিহ" (মাদারিক, কাযী আয়ায)। ইমাম মালিক (রাহ) ইমাম আবু হানিফার প্রশংসা করতেন এবং তাঁর সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। ইমাম মালিক (রাহ) থেকে ইমাম আবু হানিফা (রাহ) সম্পর্কে যেসব সমালোচনা বর্ণিত আছে, তাঁর ছাত্ররা ও মালিকী গ্রন্থকারগণ এর জবাব দিয়েছেন।

৯। সূফী সাধক আল্লামা শায়খ ফুযায়েল ইবনে ইয়ায (রাহ) বলেন, " তিনি (আবু হানিফা) ছিলেন মহান ফকিহ, অগাধ সম্পদশালী, অত্যন্ত দানশীল, দিবা-রাত্র জ্ঞান অন্বেষণে আত্মনিয়োজিত, এবাদতগোযার, চিন্তামগ্ন ও স্বল্পভাষী"।

১০। ইমাম জাফর ইবনে রাবী (রাহ) বলেন, "আমি পাঁচ বছর তাঁর সান্নিধ্যে অবস্থান করেছি। তাঁর ন্যায় কম কথার লোক আর দেখি নি। যখন ফিকাহ সংক্রান্ত কোন কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করা হতো, তখন নীরবতা ভেঙ্গে যেতো এবং নদীর প্রবাহের মত কথামালার স্রোত বয়ে যেতো। তাঁর গলার স্বর ছিল বেশ উচ্চ ও স্পষ্ট"।

১১। শায়খুল ইসলাম হাফিয ইবনে তায়মিয়া, রাহ. (৬৬১-৭২৮ হি) মুহাদ্দিস ও ফকিহদের মধ্যে বিশেষ মর্তবার অধিকারী ছিলেন। তিনি বলেন, " "অধিকাংশ আইম্মায়ে হাদীস ও ফিকাহ যেমন হযরত ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমদ.... আবু ইউসুফ যিনি ইমাম আবু হানিফার সঙ্গী এবং স্বয়ং আবু হানিফারও এতে ওই মর্তবা ও স্থান রয়েছে, যা তাঁদের শানের উপযোগী", এভাবে তিনি ইমাম আযম (রাহ)কে হাদীস ও ফিকাহর ইমামদের মাঝে গণ্য করে পরিচ্ছন্ন অন্তরের পরিচয় দিয়েছেন।

১২। ইমাম আ'যম (রাহ)-এর সমকালীন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব মালীহ ইবনে ওকী (রাহ) বলেন, "ইমাম আবু হানিফা (রাহ) ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও সাহসী ব্যক্তিত্ব। আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই তিনি সব কিছুর ওপর প্রাধান্য দিতেন। আল্লাহর রাহে তলোয়ারের আঘাতও সহ্য করে যেতেন। মহান আল্লাহ তাঁকে রহম করুন ও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন। কেননা তিনি অত্যন্ত নেককার ব্যক্তি ছিলেন"।

১৩। বলখের ফকিহ হযরত মুসলিম ইবনে সালেম (রাহ) বলেন, " আমি বড় বড় আলিমদের সাথে সাক্ষাত করেছি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছা)-এর উম্মতের ইহতেরাম (সম্মান)-এর জযবা যত বেশি ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর মাঝে পেয়েছি, এর দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও দেখি নি"।

১৪। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হযরত ইমাম ইসরাঈল রাহ. (মৃ ১৬২ হি) বলেন, "তিনি (আবু হানিফা, রাহ) এমন সব হাদীস উত্তমরূপে আয়ত্ত করতেন, যেগুলো থেকে কোন না কোন মাসয়ালা বের করা যেতো এবং তিনি হাদীসের ব্যাপারে খুব কঠোর আলোচনাকারী ও হাদীসের মাঝে ফিকাহর মাসয়ালা সম্পর্কে খুব বেশি অবগত ছিলেন"।

১৫। অনুসরণীয় ইমাম হাফিয আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ খুরাইবী, রাহ. (মৃ. ২১৩ হি) ছিলেন সিকাহ, মা'মুন, আবেদ ও নাসিক। তিনি ইমাম আ'যমের প্রতি পরম ভক্তি, মহব্বত, একনিষ্ঠতা ও ইচ্ছা নিয়ে বলেন, "মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব যে, তারা স্বীয় (নফল) নামাযে ইমাম আবু হানিফার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করবে। কেননা, তিনি সুন্নত (হাদীস) ও ফিকাহকে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ করেছেন"।

১৬। আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস, প্রসিদ্ধ পরহিযগার ব্যক্তিত্ব এবং ইমাম বোখারী, রাহ. (১৯৪-২৫৬ হি)-এর দাদা উস্তাদ ছিলেন ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, রাহ. (১১৮-১৮১ হি)। জামে বোখারী ও জামে মুসলিম গ্রন্থে তাঁর সূত্রে বহু রিওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে। তিনি হাদীস শাস্ত্রে এক মহান স্তম্ভ ছিলেন। তিনি বলেন,

"ইমাম আবু হানিফা (রাহ) হলেন এলেম ও জ্ঞানের খাঁটি নির্যাস", "ফিকাহর ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর মত কাউকে দেখি নি"।

"আমি কুফায় পৌঁছে আহলে এলেম অর্থাৎ জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের শহরে সবচে' বড় আলিম কে? তাঁরা বললেন, 'ইমাম আবু হানিফা'। এরপর জিজ্ঞেস করলাম, 'সবচে' বেশি পরহিযগার কে' ? সকলে বললেন, 'ইমাম আবু হানিফা'। আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'সবচে বেশি এবাদতগোযার ও এলেম অর্জনে ব্যস্ত কে'? সকলে বললেন, 'ইমাম আবু হানিফা'। মোট কথা, আমি আখলাকে হাসানা ও প্রশংসিত গুণাবলী থেকে যে গুণ সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করেছি, সকলেই উত্তরে ইমাম আ'যমকেই উত্তম, উন্নত ও মহান বলে ব্যক্ত করেছেন"।

"যদি আছার ও হাদীস মা'রূফ (পরিচিত) হয় এবং এতে রায় (মন্তব্য)-এর প্রয়োজন অনুভূত হয়, তবে ইমাম মালিক, ইমাম সুফিয়ান এবং ইমাম আবু হানিফার রায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। আর আবু হানিফা তো তাঁদের সকলের মাঝে ফিকাহর চূঁড়ায় আরোহণকারী এবং উক্ত তিন জনের মধ্যেও উঁচু স্তরের ফকিহ ছিলেন"।

"হাদীস ও আছারের এলেম হাসিল করা তোমাদের জন্য অত্যাবশ্যক। কিন্তু আছারের জন্য ইমাম আবু হানিফার প্রয়োজন। যেন তাঁর ওয়াসিলায় হাদীসের তাফসীর ও এর অর্থ বোঝা যায়"। "তোমরা একথা বলো না যে, আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির রায় (মন্তব্য) বরং এভাবে বলো যে, এটা হাদীসের ব্যাখ্যা"। (আসলে ইমাম আযমের সব মাসয়ালা, কোন না কোন হাদীসেরই ব্যাখ্যা)।

১৭। স্বীয় যুগের জরাহ ও তা'দীল এর ইমাম, ইমাম বোখারী (রাহ)-এর উস্তাদ এবং ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, (২০১-২৮৯ হি), ইমাম ইবনে খোযায়মা (২২৯-৩১১হি) ও ইমাম তাবারানীর (২৬০-৩৬০হি) দাদা উস্তাদ আল্লামা হাফিয মক্কী ইবনে ইবরাহীম, রাহ. (মৃ. ২১৫হি) নিম্নরূপ বর্ণনা করেন,

"ইমাম আবু হানিফা (রাহ) ছিলেন এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। তাঁর জ্ঞান থেকে সে ব্যক্তি বিমুখ হতে পারে যে তাঁকে বুঝতে পারে নি ও চিনতে পারে নি"। তিনি আরও বলেন,

(ক) "তাঁর সকল চেষ্টা-সাধনা ছিল কবরমুখী।"

(খ) "ইমাম আবু হানিফার যুগে তাঁর চেয়ে বড় কোন আলিম ছিলেন না"। ইমাম সাদরুল আইম্মা মুওয়াফফেক মক্কী হানাফী, রাহ. (মৃ.৫৬৮ হি) আল্লামা মক্কী ইবনে ইবরাহীম (রাহ) সম্পর্কে বলেন যে, তিনি ইমাম আ'যমের খেদমতে থেকে হাদীস ও ফিকাহ শিক্ষা করেছেন এবং তা অধিক পরিমাণে বর্ণনা করেছেন।

১৮। জামে বোখারী-মুসলিমের শ্রেষ্ঠ রাবী ইমাম শো'বা ইবনে হাজ্জাজ রাহ. (মৃ. ১৬০ হি) বলেন, "আল্লাহর কছম করে বলছি যে, আবু হানিফার অনুধাবন শক্তি অতি আকর্ষণীয় এবং স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল" (খায়রাতুল হিসান)।

১৯। সুহায়েল ইবনে মুযাহিম (রাহ) বলেন, "আমরা ইমাম আ'যমের নিকট তাঁর গৃহে যেতাম, সেখানে চাটাই ব্যতীত বসার আর কিছুই থাকতো না"।

২০। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে ওসমান যাহাবী আস-শাফেয়ী, রাহ, (মৃ.৭৪৮ হি) বলেন, "ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহ)-এর তাহাজ্জুদ-গোযারী এবং শব-বেদারীর (রাত্রি জাগরণ) ঘটনা এতো বেশি বর্ণিত হয়েছিল যে তা তাওয়াতুর পর্যায়ে পৌঁছেছিল, শব-বেদারী ও রাত জেগে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে মানুষ তাঁকে 'খুঁটি' বলতো।"

"ইমাম আবু হানিফা (রাহ) যদিও হিফযে হাদীসে বিরাট কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন, তবুও তাঁর থেকে কম হাদীসই বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ শুধু এই ছিল যে, তিনি হাদীস রিওয়ায়েতের পরিবর্তে হাদীস থেকে ফিকাহর মাসয়ালা উদ্ভাবনে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন"।

"ইমাম সাহেব আমলদার আলিম, আবেদ ও যাহেদ ছিলেন এবং জলিলুল কদর আলিমদের অন্তর্গত ছিলেন। তিনি রাজা-বাদশাহদের হাদিয়া-তোহফা কবুল করতেন না। বরং নিজের কামাই নিজে করতেন। ইবনে হারুনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, ইমাম সাওরী ও ইমাম আবু হানিফার মাঝে কে বড় ফকিহ। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আবু হানিফা বড় ফকিহ এবং সুফিয়ানের বেশি হাদীস মুখস্থ ছিল। ইবনে মুবারক বলতেন যে, আবু হানিফা সবচে' বড় ফকিহ। ইমাম শাফেয়ী বলতেন যে, সমস্ত ফকিহ ইমাম সাহেবের এলমী

সন্তান। ইয়াযিদ বলতেন যে, আবু হানিফার চেয়ে বেশি পরহিযগার ও বুঝদার আর কাউকে দেখি নি। ইবনে মঈন বলতেন, আবু হানিফা সিকাহ, তাঁর মাঝে কোন ত্রুটি নেই। ইমাম আবু দাউদ (রাহ) বলেন যে, ইমাম আবু হানিফা হাদীসের ইমাম ছিলেন। কাযী আবু ইউসুফ বলেন, একদা আমি ইমাম সাহেবের পিছনে যাচ্ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি বললো, 'তিনি হলেন আবু হানিফা, যিনি রাতভর ঘুমান না'। ইমাম সাহেব একথা শুনে বললেন, আল্লাহর কসম, এখন মানুষ এরূপ বর্ণনা না করুক, যা আমি করি না। এর পর থেকে তাঁর সমস্ত রাত নামায, দোয়া ও কান্নায় কেটে যেতো। এই ইমামের মানকিবকে আমি পৃথকভাবে লেখেছি"।

২১। বলখের ইমাম ইবনে আইউব (রাহ) বলেছেন, "প্রকৃত জ্ঞান (এলেম) আল্লাহতায়ালার নিকট থেকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছেছে। তাঁর পরে তাঁর সাহাবিগণ তা লাভ করেছেন। সাহাবীদের নিকট হতে পেয়েছেন তাবেয়িগণ। আর তাবেয়ীদের নিকট থেকে সে এলেম কেন্দ্রীভূত হয়েছে ইমাম আবু হানিফাতে" (তারীখে বাগদাদ' আবু হানিফা অধ্যায়)।

২২। ইমাম মুহাদ্দিস নযর ইবন মুহাম্মদ মারওয়াযী (রাহ) বলেন, "আমি আবু হানিফা (রাহ) এর চেয়ে অধিক আর কাউকেও হাদীস সন্ধানে উৎসাহী ও মনোযোগী দেখতে পাই নি। একবার ইয়াহিয়া ইবনে সায়ীদ আল-আনসারী, হিশাম ইবনে ওরওয়া ও সায়ীদ ইবনে আবু আরুবা আগমন করলেন। তখন ইমাম আবু হানিফা (রাহ) আমাদের বললেন, 'যেয়ে দেখো ওই লোকদের নিকট হাদীসের এমন কোন সম্পদ আছে কিনা, যা আমি তাদের থেকে শুনে গ্রহণ করতে পারি" (আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন)।

এরূপ আরও ঘটনা রয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম আ'যম (রাহ) নিত্য-নতুন হাদীসের সন্ধান লাভ করে অধিকতর সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য সব সময়ই চেষ্টিত ও যত্নবান ছিলেন। সুতরাং তাঁকে হাদীসের ব্যাপারে অমনোযোগী বলা অর্বাচীনতারই পরিচয় বহন করে।

২৩। ড. মুস্তফা হুসনী আস-সুবায়ী আস-শাফেয়ী রাহ. (১৯১৫-৬৪ খ্রি.) স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহ) রাসূলের হাদীসের ওপর কখনো কোন কিছুকে প্রাধান্য দিতেন না। যখন সে হাদীসটির সনদ নির্ভরযোগ্য এবং তা নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাবীদের মাঝে সুপরিচিত হতো, এমতাবস্থায় তিনি কখনো 'রায়' কিংবা 'কিয়াস' কিংবা 'ইসতিহসান' কোন কিছুকেই হাদীসের ওপর কখনো প্রাধান্য দেন নি (আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা.....)।

২৪। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে নাদীম (মৃ. ৩৮৫ হি) সমকালীন মুহাদ্দিসদের সামনে ঘোষণা করেছেন, "জলে স্থলে, পূর্ব-পশ্চিমে, দূরে ও নিকটে সর্বত্রই এলেম ইমাম আবু হানিফারই আবিষ্কার" (ফিহরিস্ত)। তৎকালে এলেম বলতে কোরআন ও হাদীসের এলেম (জ্ঞান) ছাড়া অন্য কোন এলেম ছিল অস্তিত্বহীন ও অপরিচিত। আল্লামা যাহাবী (রাহ) বলেন, " মানতেক, জাদাল, ফলাসাফা ইত্যাদি সাহাবা, তাবেয়ী, আওযায়ী, সাওরী, মালিক ও আবু হানিফার এলেম ছিল না। বরং তাঁদের এলেম ছিল কোরআন, হাদীস ও তৎজাত জ্ঞান" (তাযকিরাতুল হুফফায. ১ম খন্ড)।

২৫। ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী, রাহ. (৫০-১২৪হি) ছিলেন হাদীসের হুজ্জাহ। তাঁর শিষ্য ইয়াসীন যাইয়াত কুফী (রাহ) মক্কা শরীফে চিৎকার করে করে বলতেন, "হে লোক সকল, আবু হানিফার মজলিসে গিয়ে বসো, তাঁকে গনিমত মনে করো, তাঁর এলেম ও কালাম থেকে উপকৃত হও, এমন ব্যক্তি আর পাবে না, হারাম-হালাল ব্যক্তকারী এমন আলিমকে যদি হারাও তবে এলেমের বড় দৌলত ও পরিমাণকে হারাবে"।

২৬। আল্লামা ইমাম আবদুল করিম শাহরাস্তানী , রাহ. (মৃ. ৪৯৯হি) তাঁর 'আল-মিলাল ওয়ান্নাহাল, (১ম খন্ড ১৩০ পৃ) গ্রন্থে বলেন, " হাসান ইবনে মুহাম্মদ, সায়ীদ ইবনে যোবায়ের, তলক ইবনে হাবিব, আমর ইবনে মুররা, মাহারিব ইবনে যিয়াদ, মুকাতিল ইবনে সোলায়মান, যর, আমর ইবনে যর, হাম্মাদ ইবনে আবু সোলায়মান, আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ইবনে হাসান ও কাদীদ ইবনে জা'ফর রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম, এঁরা সবাই হাদীসের ইমাম ছিলেন"।

২৭। বিখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খুল ইসলাম ইমাম ইয়াযিদ ইবনে হারুন, রাহ. (মৃ ২০৬ হি) বলেন, "ইমাম আবু হানিফা মুত্তাকী, পবিত্র পরিচ্ছন্ন গুণের অধিকারী, মহাসাধক, আরিফ, আলিম, দুনিয়া-বিমুখ, সত্যভাষী এবং সমকালীনদের মধ্যে সবচে' বড় হাফিযে হাদীস ছিলেন" (ইবনে মাজাহ ও উলূমুল হাদীস' এর বরাতে মানকিবে দামিরী)। অন্যত্র তিনি বলেছেন, " আবু হানিফা সবচেয়ে বড় ফকিহ"। তিনি আরও বলেন, " আমি এক হাজার উস্তাদ থেকে এলেম শিখেছি ও লেখেছি কিন্তু আল্লাহর শপথ, তাঁদের মধ্যে আবু হানিফা থেকে বড় মুত্তাকী, পরহিযগার এবং স্বীয় জবানের হিফাযতকারী আমি আর কাউকে দেখি নি"। তিনি হাদীসের এক দরসে বলেন, " যদি তোমাদের উদ্দেশ্য এলেম অর্জন করা হতো, তবে হাদীসের ব্যাখ্যা এবং এর অর্থও অন্বেষণ করতে এবং আবু হানিফার কিতাবসমূহ ও তাঁর উক্তিসমূহ দেখতে এবং তোমাদের নিকট হাদীসের তাফসীর স্পষ্ট হয়ে যেতো"।

২৮। আমিরুল মু'মিন ফিল হাদীস আল্লামা ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রাহ) এর ছাত্র মুহাদ্দিস হযরত ইয়াহিয়া ইবনে মঈন (রাহ) বলেন, " ইমাম আবু হানিফা (রাহ) খুবই নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি নিজের মুখস্থ ও সুরক্ষিত হাদীসই বর্ণনা করতেন। যা তাঁর মুখস্থ নেই বা কিতাবে লেখা আছে, তা তিনি কখনো বর্ণনা করতেন না"।

"তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত ভুল-ভ্রান্তিমুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। হাদীসের বিষয়ে কেউ তাঁকে দুর্বল বা অগ্রহণযোগ্য বলেছেন বলে আমি শুনি নি"।

" আমাদের নিকট হাদীসের আলিম শুধুমাত্র চারজন, সুফিয়ান সাওরী, আবু হানিফা, মালিক ও আওযায়ী।"

ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিমের উস্তাদ এবং জরাহ ও তা'দীলের ইমাম ইয়াহিয়া ইবনে মঈন (১৫৮-২৩৩হি)-এর বর্ণনায় ইমামুল মুহাদ্দিসীন ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর এরশাদ তাঁর 'মানাকিব'-এ এভাবে উল্লেখ রয়েছে, "আমি আল্লাহর কিতাব দ্বারা দলীল গ্রহণ করি। যদি এতে না পাই তবে রাসূলের সুন্নত ও সহীহ আছার-এর ওপর আমল করি। যা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে হাতে পৌছেছে। যদি এতেও সফল না হই তবে রাসূলের সাহাবীদের উক্তিসমূহ হতে যা পছন্দ হয়, গ্রহণ করি। অতঃপর যখন এ প্রক্রিয়ায়

ইবরাহীম, আতা, শা'বী, হাসান পর্যন্ত পৌছে তখন আমি ইজতিহাদ করি যেমন তাঁরা ইজতিহাদ করেছেন"।

২৯। সত্তর বার হজ্ব পালনকারী আল্লামা ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, রাহ. (মৃ.১৯৮হি) ছিলেন হাদীসের স্তম্ভ ও রোকন। তিনি বলেন, " যিনি সর্বপ্রথম আমাকে মুহাদ্দিস বানিয়েছেন, তিনি হলেন ইমাম আবু হানিফা (রাহ)"।

"সর্বপ্রথম আমাকে হাদীস পড়ানোর জন্য আবু হানিফাই বসিয়েছেন"।

এভাবে ইমাম আযম (রাহ) শুধু ইমামুল মুহাদ্দিসীনই ছিলেন না। তিনি মুহাদ্দিস তৈরিকারীও ছিলেন। হাজার হাজার আলিম তাঁর নিকট হাদীস শিখে মুহাদ্দিস হয়েছেন।

৩০। শায়খুল ইসলাম প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিয ইবনে আবদুল বার মালেকী (রাহ.) তাঁর 'আল-ইনতিকা' গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর একথাটি উল্লেখ করেছেন,

"যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছা)-এর কোন কথার বিরুদ্ধাচরণ করলো, তার ওপর আল্লাহর লা'নত। (কারণ) তাঁরই বদৌলতে আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে ঈমানের মর্যাদা দান করেছেন এবং তাঁরই দ্বারা তিনি আমাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন"।

হাফিয ইবনে আবদুল বার মালেকী (রাহ) পূর্ববর্তী উঁচুস্তরের মুহাদ্দিস ও আসহাবে সিহাহ সিত্তাহর উস্তাদ ওকী ইবনে জাররা (রাহ)-এর উচ্চ মর্যাদা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, "ওকী ইবনে জাররা ইমাম আবু হানিফা থেকে বহু হাদীস শুনেছেন এবং সে সব হাদীস মুখস্থ করেছেন"। তিনি আরও বলেন, "হাম্মাদ ইবনে যায়িদ (রাহ) ইমাম আবু হানিফা (রাহ) থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন।"

৩১। ইমাম আ'যম (রাহ)-এর সমকালীন মুহাদ্দিস হাদীস-নিরীক্ষক তাবে-তাবেয়ী আবদুর রহমান ইবনে মাহদী, রাহ. (মৃ. ১৯৮হি) বলেন, "আমি হাদীসগুলো নকল করতাম। আমি পুরো স্বজ্ঞানের সাথে বলছি যে, সুফিয়ান সাওরী (রাহ) আমিরুল মু'মিনীন ছিলেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রাহ) আমিরুল উলামা ছিলেন, শো'বা (রাহ) হাদীসের কষ্টিপাথর ছিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রাহ) হাদীসের পরখকারী ছিলেন, ইয়াহিয়া ইবনে সায়ীদ আল-কাত্তান (রাহ) উলামাদের কাযী ছিলেন। আর ইমাম আবু হানিফা (রাহ) বিচারক উলামাদের বিচারক ছিলেন। যে ব্যক্তি তোমাদের নিকট এর বিপরীত কোন কথা বলে, তবে তা বনি সালেমের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করো। অর্থাৎ সে ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য নয়"।

৩২। শাফেয়ী মাযহাব-পন্থী ইমাম আল্লামা শায়খ আবদুল ওয়াহহাব শা'রানী (রাহ) তাঁর 'আল-মীযানুল কোবরা' গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এভাবে,

" আল্লাহর কছম, সে ব্যক্তি মিথ্যা বললো এবং আমাদের ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলো, যে ব্যক্তি এ কথা বলে যে, আমরা কিয়াসকে কিতাব ও সুন্নতের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকি। কোরআন ও সুন্নতে দলীল থাকলে কিয়াসের প্রয়োজন আছে কি?"

"ইমাম শায়খ শা'রানী (রাহ) বলেন, ইমাম আ'যম ও তাঁর সাথীদের দলীলসমূহ আমি লক্ষ্য করেছি যে তা নিশ্চিতরূপে সহীহ হাদীস দ্বারা হয় অথবা হাসান হাদীসের দিকে ফিরে বা এমন যয়ীফ হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত হয় যা বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়ে হাসান বা সহীহ

হাদীসের সাথে গিয়ে মিলে এবং তা তিন থেকে দশবার বর্ণিত বলে এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা সহীহ হয়"।

"যে ব্যক্তি ওই সব (হানাফী) ইমামদের কারো কথার সমালোচনা করেছে, সে হয়তো শুধু অজ্ঞতার ভিত্তিতে করেছে অথবা সে দলীলকে বুঝতে পারে নি বা সে কিয়াসের পদ্ধতিগুলোর সূক্ষ্মতা বুঝতে অক্ষম রয়েছে। বিশেষ করে ইমাম আ'যম আবু হানিফা নো'মান বিন সাবিত (রাহ)-এর ওপর কটূক্তি ও সমালোচনা তো দৃষ্টিযোগ্যই হয় না। কেননা, হযরতে সালফ ও খালফ (পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ইমামগণ) তাঁর অপরিমেয় এলেম, পরহিযগারী, এবাদত, কিয়াসের বিভিন্ন পদ্ধতি, অনুধাবন শক্তি ও মাসয়ালা আহরণ করার সঠিক পারঙ্গমতার ওপর একমত"।

" আমি যখন 'আদিল্লাতুল মাযাহিব' কিতাব লেখি তখন ইমাম আ'যম ও তাঁর সাথীদের দলীলসমূহের ওপর চিন্তা করেছি। তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের প্রতিটি কথা ও মাসয়ালা কোন আয়াত অথবা হাদীস ও সাহাবীর আছার (বাণী) অথবা এর ভাবার্থের দ্বারা মুস্তানাদ (প্রমাণপুষ্ট) পেয়েছি অথবা এরূপ যয়ীফ হাদীস যা বহুবার বহু তরিকায় বর্ণিত বা এরূপ কিয়াস যা সহীহ মূলনীতির ওপর ভিত্তিশীল, এর দ্বারাও দলীল গ্রহণ করতে পেয়েছি"। এই কথাগুলো ইমাম আ'যম সাহেবের প্রতি মুহাদ্দিস আবু বকর আজরী (মৃ. ৩৬০ হি)-এর ভুল ধারণার নিরসনে বলা হয়েছে।

"যারা বলে যে, ইমাম আবু হানিফা (রাহ) কিয়াসকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন, তাদের এই মন্তব্য এই পরিচ্ছেদে আমি নাকচ করছি। জেনে রাখো, ইমাম সাহেব সম্পর্কে এরূপ উক্তি ওই ব্যক্তি করেছে, যে স্বয়ং তাঁর বিরোধী, দীন সম্পর্কে বল্গাহীন এবং সে কথাবার্তায় পরিহযগার নয়। নিশ্চয়ই সে আল্লাহতায়ালার এই বাণী থেকে উদাসীন, 'নিঃসন্দেহে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ, এসব কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে"।

"আমাদের আলোচনায় এ কথা ভালভাবে সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নস্ (কোরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট দলীল) বিদ্যমান থাকাবস্থায় কখনো কিয়াসকে গ্রহণ করেন নি। যেমন বিরোধীরা তাঁর ওপর অভিযোগ চাপিয়েছে। হ্যাঁ, তিনি ওই বিষয়ে কিয়াস করেছেন, যেখানে নস্ বিদ্যমান ছিল না"।

"কিছু সংখ্যক বিরোধী লোক এ ধারণা প্রকাশ করেছে যে, ইমাম আযম আবু হানিফা আন-নোমান বিন সাবিত (রাহ)-এর রায় (সিদ্ধান্ত) শরীয়ত বিরোধী হয়। এতে ইমাম আবু হানিফা (রাহ) সর্বপ্রথম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এরূপ কট্টরপন্থী বিরোধীরা কিয়ামতের দিন কেমন অপমানিত হবে, যখন তারা ইমাম সাহেবের মুখোমুখী হবে।"

৩৩। আল্লামা ইমাম ইবনে হাজার মক্কী শাফেয়ী (রাহ) বলেন, "তিনি (আবু হানিফা, রাহ) মাসয়ালা নির্ধারণে সহীহ হাদীস পেলে এর অনুসরণ করতেন এবং যদি সাহাবা (রা) বা তাবেয়ীদের থেকে নির্দেশ পেতেন এর অনুসরণ করতেন, অন্যথায় কিয়াস করতেন। তাঁর কিয়াসও অত্যন্ত চমৎকার হতো"।

তিনি আরও বলেন, "তোমার এটা জানা অবশ্যক যে, যেসব আলিম ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর সঙ্গীদেরকে 'আহলে রায়' বলে তাঁদের ত্রুটি বর্ণনা করেন নি। আর তিনি

নিজের রায়কে রাসূলুল্লাহ (ছা) এবং তাঁর সাহাবীদের বাণীর ওপর অগ্রাধিকার দিতেন বলাও তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তা বলা অসম্ভব, তিনি তো এ থেকে মুক্ত ছিলেন। কেননা ইমাম আবু হানিফা থেকে বহু বার বহু তরিকায় এ কথা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সর্বপ্রথম কোরআনের ওপর আমল করেন, যদি এতে দলীল না পাওয়া যেতো তবে হাদীসের ওপর আমল করতেন। যদি হাদীসে পাওয়া না যেতো তবে সাহাবা কিরামের উক্তি গ্রহণ করতেন। যদি তাঁদের মতবিরোধ হতো, তবে তাঁদের ওই উক্তি গ্রহণ করতেন যা কোরআন হাদীসের বেশি নিকটবর্তী হতো, যদি তাঁদের উক্তিও না পাওয়া যেতো, তবে এমতাবস্থায় তিনি তাবেয়ীদের উক্তি গ্রহণ করতেন না বরং যেরূপ তাঁরা ইজতিহাদ করতেন সেরূপ তিনিও ইজতিহাদ করতেন"।

ইমাম ইবনে হাজার মক্কী (৯০৯-৯৭৩ হি) আরও বলেন, "খবরদার এমন ধারণা থেকে বিরত থাকো যে, ইমাম আবু হানিফা ফিকাহ ছাড়া আর কোন এলেমের অধিকারী ছিলেন না। তাওবা, তাওবা! ইমাম আবু হানিফা তো উলূমে শরীয়ত, তাফসীর এবং উলূমে আদাবিয়া ও ফুনুনে কিয়াসিয়াতে এক অকূল সমুদ্র এবং এমন ইমাম ছিলেন যাঁর মুকাবিলা করা যায় না। আর তাঁর কয়েকজন দুশমনের তাঁর সম্পর্কে বিপরীত কিছু বলা হলো শুধু হিংসা ও সমসাময়িকতার বিরোধিতার কারণ এবং মিথ্যা অভিযোগ ও অপবাদ আরোপ"।

" তিনি তাঁর একই গ্রন্থে (খায়রাতুল হিসান) আরও বলেন, 'অধিকাংশ আলিম ও মুহাদ্দিস ইমাম আবু হানিফার তাকলিদ করে দুর্বোধ্য হাদীসগুলোর ব্যাখ্যার মধ্যে এবং কিয়াসী মাসয়ালা, ফায়সালা ও আহকামের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁর অনুগ্রহ গ্রহণ করার নসিব হয়েছে। তাঁর ও তাঁর সাথীদের থেকে কাওম ও মিল্লাতের যে পরিমাণ ফায়দা লাভ হয়েছে এর দশ ভাগের এক ভাগও অন্য কারো থেকে হয় নি। আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন"।

এখানে স্মর্তব্য যে, ফিকাহ শাস্ত্র সৃষ্টির উষালগ্নে সব আলিম-মুহাদ্দিস দু'টি দলে পরিচিতি ছিলেন। (এক) আসহাবে হাদীস ও (দুই) আসহাবুর রায়। এ দু'টি শ্রেণীতে বড় ধরনের কোন পার্থক্য নেই। 'আসহাবে হাদীস' আখ্যায়িত আলিম-মুহাদ্দিসগণ হাদীস সংকলন, সংরক্ষণ ও বর্ণনার কাজকে নিজেদের প্রধান কর্তব্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরাও কিয়াস, ইজমা ইত্যাদিকে অস্বীকার করতেন না। ফকিহ আলিমদেরকে 'আসহাবুর রায়' বলার ভিত্তি ছিল যে, তাঁরা ইসলামী বিধি-বিধান উদ্ভাবনকে নিজেদের কর্মব্যস্ততায় পরিণত করেছিলেন। হাদীস সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসারের প্রতি তাঁদের অধিক মনোযোগের পরিবর্তে হাদীসগুলো থেকে উদ্ভাবিত আহকাম ও আইন-কানুনের প্রচার-প্রসারের প্রতি তাঁরা অধিক মনোযোগী ছিলেন। তখন 'আসহাবুর রায়' উপাধিটি চার মাযহাবের ফকিহদের জন্যই ব্যবহৃত হতো। ইমাম ইবনে কুতায়বা, রাহ. (২১৩-২৭৬ হি)-এর 'মা আরিফ, ইমাম ইবনে হারিস আল-খুশানী (রাহ)-এর 'কুযাতুল কুরতবা' প্রভৃতি গ্রন্থে সব মাযহাবের ফকিহরা 'আসহাবুর রায়' বলেই আলোচিত হয়েছেন। কালক্রমে উন্নত ও ইসলামী দলীল-প্রমাণে পরিপুষ্ট হানাফী ফিকাহর সার্বিক প্রয়োগ ও সুষ্ঠু-সফল কার্যকারিতার কারণে অন্যান্য মাযহাবেও হানাফী বিধি-বিধান অনুশীলিত হতে থাকে। এতে মাযহাববিহীন গোমরা শ্রেণীটি

ও অন্যান্য হিংসুকরা বর্তমানে কেবল হানাফীদের প্রতি এই পরিভাষাটি অন্যায়ভাবে প্রয়োগ করছে।

৩৪। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আলী ইবনে খাশরাম (রাহ) বলেন, 'আমরা ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রাহ)-এর মজলিসে ছিলাম। তিনি বললেন, হে আসহাবে হাদীস, তোমরা হাদীসে তাফাক্কুহ (ফিকাহ) অর্জন করো যেন আসহাবে রায় তোমাদের ওপর জয়ী হয়ে না যায়। ইমাম আবু হানিফা এমন কোন বিষয় বলেন নি যাতে আমরা দু'একটি (হাদীসের) বর্ণনা করি নি' (অর্থাৎ তাঁর কথা ছিল হাদীস সম্মত)।

৩৫। হাফিয ইবনে কাইয়িম, রাহ. (৬৯১-৭৫১হি) বলেন, "ইমাম আবু হানিফার শিষ্যগণ এ বিষয়ে একমত যে, ইমাম আবু হানিফা (রাহ) যয়ীফ হাদীসকেও কিয়াস ও ইজতিহাদী রায়ের ওপর প্রাধান্য দিতেন এবং এই নীতির ওপরই হানাফী মাযহাবের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত"।

৩৬। মাওলানা আবদুল আউয়াল জৈনপুরী (রাহ) 'আল-নাওদিরুল মুনিফা ফি মানাকিবে আল-ইমাম আবি হানিফা' শীর্ষক গ্রন্থে বহু মৌলিক পুস্তক অবলম্বনে ইমাম আ'যম আবু হানিফার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি প্রধানত এটাই প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রাহ) অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী, ফিকাহর সর্বশ্রেষ্ঠ উস্তাদ, ফিকাহ স্কুলের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠাতা, হাদীস বর্ণনাকারী, হাফিযে হাদীস, বিভিন্ন বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী, অসাধারণ আবেদ ও আল্লাহভীরু ছিলেন।

৩৭। বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস ইমাম বশির ইবনে মুসা, রাহ. (মৃ ২৮৮ হি) স্বীয় উস্তাদ শায়খুল ইসলাম মুহাদ্দিস ইমাম আবু আবদুর রহমান মুকরী (রাহ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইমাম আবু হানিফা (রাহ) এর সূত্রে নয়শো (৯০০) হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন (মানাকিবে কারদারী, ২য় খন্ড, পৃ. ২১৬)। "আর তিনি যখন তাঁর সূত্রে কোন হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন, আমাদেরকে শাহানশাহ হাদীস বর্ণনা করেছেন" (আল-ইনতিকা)।

আবদুল্লাহ ইবনে যায়িদ অর্থাৎ ইমাম মুহাদ্দিস মুকরী (রাহ) ছিলেন আসহাবে হাদীসের হুফফায এবং বড় স্তরের ইমামদের অন্তর্গত। তিনি ২৫০ হিজরীতে উপরোক্ত কথা বলেন। এতেই প্রমাণিত হয় যে, ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ) ছিলেন হাদীসের সম্রাট ও ইমামুল মুহাদ্দিসীন।

আল্লামা মুহাদ্দিস সাদরুল আইম্মা মক্কী, রাহ (মৃ. ৫৬৮ হি) বলেন,

"তিনি ইমাম মুকরী, (রাহ) ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর সূত্রে অনেক হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন"।

"ইমাম আবু হানিফা (রাহ) শুধু উস্তাদ ইমাম হাম্মাদ (রাহ) থেকেই দু'হাজার হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন।"

"ইমাম ঈসা ইবনে ইউনুস রাহ. (মৃ.১৮৭ হি) ইমাম আবু হানিফা (রাহ) থেকে অধিক পরিমাণে হাদীস ও ফিকাহ রিওয়ায়েত করেছেন"।

" যাকারিয়া ইবনে আবি যায়িদা, আবদুল্লাহ ইবনে আবু সোলায়মান, লাইছ ইবনে আবু সালেম, মাতরাফ ইবনে তুরাইফ ও হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান রাহমাতুল্লাহ আলাইহিমের মত বড় বড় মুহাদ্দিস ইমাম আবু হানিফার নিকট আসতেন এবং এরূপ সূক্ষ্ম

মাসয়ালাসমূহ তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন, যা তাঁদের প্রয়োজন হতো এবং যে হাদীসের ব্যাপারে তাঁদের সংশয় হতো, সে সম্পর্কেও তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন"।

৩৮। ইমাম মুহাদ্দিস মুসইর ইবনে কিদাম, রাহ. (মৃ. ১৫৫ হি) বলেন, "আমি ইমাম আবু হানিফার সঙ্গে হাদীস অন্বেষণ করেছি, কিন্তু তিনি আমাদের ওপর জয়ী হন এবং তাকওয়া-পরহিযগারীতে আত্মনিয়োগ করি, এতেও তিনি আমাদের ওপর অগ্রগামী হন এবং আমরা তাঁর সাথে ফিকাহ অন্বেষণ করি, এতে তাঁর কামাল তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছো। যা অস্পষ্ট নয়' (মানাকিব লিল যাহাবী)।

তিনি আরও বলেন, "ইমাম আবু হানিফার এই অভ্যাস ছিল যে, যখন স্বীয় পরিবার-পরিজনের জন্য কোন কিছু ক্রয় করতেন, তখন ওই পরিমাণে বড় বড় আলিমদের জন্য ব্যয় করতেন। যখন নিজের পরিবারের সদস্যদের জন্য কাপড় খরিদ করতেন, তখন উলামা-মাশায়েখদের জন্যও সে পরিমাণ কিনতেন। আর যখন খেজুর ইত্যাদির মওসুম আসতো, তখন সে পরিমাণ প্রথমে উলামা-মাশায়েখদের জন্য খরিদ করতেন যে পরিমাণ পরে নিজের জন্য কিনতেন" (উকুদুল জুম্মান)।

৩৯। প্রধান বিচারপতি ও ফাতাওয়া বিভাগের প্রধান রোকন ইমাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব (রাহ) বলেন, "আমি হাদীসের ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর চেয়ে বড় আলিম অন্য কাউকে পাই নি। আমি ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর সাথে এলমী আলোচনার জন্য মাসয়ালার ওপর মতভেদ করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চিন্তা করার পর তাঁর রায় ও মাযহাবই আখিরাতের ব্যাপারে বেশি নাযাতের কারণ সাব্যস্ত হয়েছে। কখনো কখনো হাদীসের দিকে আমার ঝোঁক হয়ে যেতো, আমি সেদিকে আকৃষ্ট হতাম, কিন্তু পরে জানা যেতো যে, আবু হানিফা (রাহ) সহীহ হাদীস আমার চেয়ে বেশি জানতেন" (তারীখে বাগদাদ, ১৩/৩৪১)।

৪০। আল্লামা মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহানী শাফেয়ী, রাহ. (মৃ. ৯৪২ হি) 'উকুদুল জুম্মান ফি মানকিবিল ইমাম আবি হানিফাতুন নোমান' নামে একটি গ্রন্থ লেখেন। এতে আবু হানিফা (রাহ) সম্পর্কে অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এক স্থানে তিনি বলেন, "ইমাম আবু হানিফা (রাহ) একজন শ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদীস ও শীর্ষ স্থানীয় মুহাদ্দিস ছিলেন। যদি তিনি হাদীস মুখস্থ করতে গভীর মনোযোগ না দিতেন, তবে এতো অধিক ফিকাহর মাসয়ালা বের করতে পারতেন না।

তিনি আরও বলেন, আবু হানিফা (রাহ.) স্বীয় যুগের একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ দিয়ানতদার, আমানতদার, মালদার, কাপড়ের বড় ব্যবসায়ী এবং স্বীয় যুগের কোটিপতি হওয়ার সাথে সাথে ঐশ্বর্য, প্রশস্ত মন ও সীমাহীন দয়া প্রদর্শনেও মহান ছিলেন। নিজের ব্যবসায় অর্জিত লাভ দ্বারা কাপড়, খাদ্য-সামগ্রী ইত্যাদি ক্রয় করে মুহাদ্দিসীনে কিরাম ও ফোকাহায়ে ইযামকে হাদিয়া দিতেন। আর বেঁচে যাওয়া অর্থ তাঁদের হাদিয়া দিয়ে বলতেন, "দেখো, আল্লাহর প্রশংসা করো, আমার নয়, কেননা আমি নিজের সম্পদ থেকে কিছুই দেই নি, বরং আল্লাহর অনুগ্রহ (দান) থেকে দিয়েছি, যা তিনি আমাকে দিয়েছেন। আল্লাহর কছম, এগুলো আপনাদের আমানত, যা আল্লাহ আমার হাতে পৌঁছিয়েছেন"।

গ্রন্থের আরও একটি ঘটনা, "হযরত শফিক ইবনে ইবরাহীম বলেন, একবার আমি ইমাম আবু হানিফার সাথে চলছিলাম। সম্মুখ থেকে এক লোক আসতে আসতে থেমে গিয়ে লুকিয়ে গেল। তার প্রতি ইমাম আযমের দৃষ্টি পড়লো এবং সাথে সাথে আওয়ায দিয়ে বললেন, 'হে অমুক, থেমে যাও, সে থেকে গেল'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ' তুমি এরূপ করলে কেন? সে বললো, 'আপনার দশ হাজার দিরহাম (টাকা) আমার ওপর ঋণ এবং সময় অনেক হয়েছে। কিন্তু আমি শোধ করতে অক্ষম'। তিনি বললেন, 'সোবহান-আল্লাহ, শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা হলো যে, তুমি আমাকে দেখে লুকিয়ে থাকবে? শোন, আমি সে সব টাকা তোমাকে মাফ করে দিলাম"।

গ্রন্থটিতে ইমাম আযম (রাহ)-এর অপূর্ব জ্ঞানের (আকলমন্দির) ওপর উনিশজন সাক্ষী পেশ করা হয়েছে। গ্রন্থকার বলেন, তাঁদের থেকে পাঁচ জনের নাম এখানে আপনাদের সামনে রাখছি।

(১) ইমাম আলী ইবনে আছেম থেকে বর্ণিত, "ইমাম আবু হানিফার আকলকে অর্ধ দুনিয়ার আকলের সাথে ওজন করা হলে ইমাম সাহেবের আকল ভারী হবে"। (২) ইমাম খারিজা ইবনে মুসয়াব থেকে বর্ণিত, 'আমি এক হাজার আলিমের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তাদের মধ্যে আকলমন্দ (জ্ঞানী) শুধু তিন বা চার জন পেয়েছি এর মধ্যে একজন ইমাম আবু হানিফা'। (৩) শায়খুল ইসলাম ইমাম ইয়াযিদ ইবনে হারুন থেকে বর্ণিত, "আমি বড় বড় আলিমদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, কিন্তু ইমাম আবু হানিফা থেকে বেশি আকলমন্দ (জ্ঞানী), "তাঁর থেকে উত্তম পরহিযগার ও আল্লাহভীরু কাউকে দেখি নি"।

(৪) ইমাম বকর ইবনে খুনাইস বলেন, 'যদি ইমাম আবু হানিফার যুগের সমস্ত লোকের আকল একত্র করা হয়, তবে ইমাম সাহেবের আকল সকল মানুষের আকলের সমষ্টি থেকে ভারী হবে'।

(৫) একদা খলিফা হারুন-অর-রশীদের সামনে ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর আলোচনা হলো। তখন খলিফা রহমতের দোয়া করলেন। তিনি বললেন, 'ইমাম আবু হানিফা স্বীয় আকলের চক্ষুতে ওই সব বিষয় দেখতেন, যা অন্যরা মাথায় চোখ দ্বারা দেখতে সক্ষম হতো না'।

ইমাম আযম (রাহ)-এর আকলমন্দির অসংখ্য ঘটনা ইতিহাসে ও তাঁর জীবনী গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। অতি অল্প বয়সেই তাঁর আল্লাহ-প্রদত্ত জ্ঞান-বুদ্ধির ওয়াসিলায় একজন খ্যাতিমান পাদরীর ইসলাম গ্রহণের কথা ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। এরূপ বহু ঘটনা তাঁর জীবনে রয়েছে।

৪১। মাওলানা নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান, রাহ (মৃ. ১৩০৭ হি) তাঁর 'দলীলুত তালেব' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, 'ইমাম ইবনে হাযম ইবনে আলী (মৃ. ৪৫৬ হি) বলেছেন যে, ইমাম আবু হানিফার মাযহাব হলো, যয়ীফ হাদীস তাঁর নিকট কিয়াস ও রায় থেকে উত্তম, যখন এই পর্বে এ ছাড়া অন্য কিছু না মিলবে"। দূরদর্শী মুহাক্কিক আলিম ইবনে হাযমের উক্তি তাঁর কিতাবে সন্নিবেশিত করে নওয়াব সাহেব সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

ইমাম আ'যম (রাহ)-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও অপবাদ আরোপ

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ হতে সুধী পাঠক জানতে পারলেন যে, ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ) আহকামে শরীয়া নির্ধারণে হাদীসের প্রয়োগ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। লাখের অধিক মাসয়ালা নির্ণয় করতে গিয়ে তাঁকে নিশ্চয়ই শত শত হাদীস পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছে। সুতরাং তিনি হাদীসে দুর্বল ছিলেন বা তিনি সামান্য কয়েকটি হাদীস জানতেন, এ কথা বলা খুবই অন্যায় হবে। মোতাওয়াতির, মশহুর ও মুত্তাসিল হাদীস ছাড়াও তিনি দুর্বল হাদীসকে কিয়াসের ওপর প্রাধান্য দিতেন বলেও প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন। আবার মুরসাল ও খবরে আহাদকেও তিনি যথাযথ গুরুত্ব দিতেন। তবে একথা ঠিক যে তিনি এসব হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে সূক্ষ্মতম ও কঠিনতর শর্ত আরোপ করেছিলেন। আল্লাহর দীন সম্পর্কে চরম সতর্কতার জন্য তিনি এমন কঠোরতা অবলম্বন করেছিলেন। ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ)-এর প্রধান শর্তগুলো নিম্নরূপ, (অবশ্য তিনি বিজ্ঞ মুহাদ্দিসদের হাদীস পরীক্ষার শর্তাবলীর প্রতিও নযর রাখতেন)।

১। আহকামে শরীয়া-এর উৎস অনুসন্ধানের পর যে সব দলীল তাঁর মতে নির্ভরযোগ্য ছিল, 'খবরে ওয়াহিদ' অবশ্যই এর সাংঘর্ষিক হতে পারবে না। সুতরাং যখনই কোন 'খবরে ওয়াহিদ' সেই সব দলীলের প্রতিকূল হতো, তখন তিনি সে হাদীস গ্রহণ করতেন না। কেননা, দু'টি দলীলের যেটি অধিকতর শক্তিশালী এর ওপরই আমল করা উচিত। আর সেই ভিত্তিতে তিনি এরূপ 'খবরে ওয়াহিদ'কে 'শায' বলে গণ্য করতেন।

২। এই হাদীস কোরআনের সাধারণ আহকাম এবং স্পষ্টভাবে বর্ণিত বিষয়গুলোর বিপরীত অবশ্যই হতে পারবে না। সুতরাং যখনই কোন হাদীস কিতাবুল্লাহর স্পষ্ট হুকুমের সাথে সাংঘর্ষিক হতো, তখনই তিনি কিতাবুল্লাহর ওপর আমল করতেন এবং সেই 'খবরে ওয়াহিদ' পরিত্যাগ করতেন। এখানেও তিনি শক্তিশালী দলীলের ওপরই আমল করতেন। কিন্তু যদি হাদীস কোরআনের কোন অস্পষ্ট হুকুমের বর্ণনা হতো, অথবা কোন এক নতুন বিষয়ের দলীল হতো, যে বিষয়ে কোরআন নীরব, তবে তিনি সে হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ হলেও গ্রহণ করতেন।

৩। খবরে ওয়াহিদ হাদীসে মশহুরের বিপরীত হতে পারবে না, চাই সে হাদীস কাওলী বা ফে'লী হোক। যদি খবরে ওয়াহিদ মশহুর হাদীসের বিরোধী হতো, তবে তিনি শক্তিশালী দলীল হিসাবে মশহুর হাদীসের ওপরই আমল করতেন।

৪। কোন খবরে ওয়াহিদ অনুরূপ খবরে ওয়াহিদের বিপরীত হওয়া চলবে না। আর যদি দু'টি খবরে ওয়াহিদের মধ্যে বিরোধ হতো, তবে তিনি তাঁর নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী কোন একটিকে প্রাধান্য দিতেন এবং অপরটি ত্যাগ করতেন। যেমন যদি উক্ত দু'টি হাদীসের রাবীদের মধ্যে উভয়ে সাহাবা হতেন তবে যিনি ফকিহ অথবা বয়োজ্যেষ্ঠ হতেন, তাঁর হাদীস তিনি গ্রহণ করতেন।

৫। হাদীসের রাবীর আমল তাঁর বর্ণিত হাদীসের বিপরীত হওয়া চলবে না। এমনটি হলে ইমাম আ'যম (রাহ) তা গ্রহণ করতেন না। যেমন আবু হোরায়রা (রা) বর্ণিত

হাদীস, “যদি কুকুর কোন পাত্রে মুখ দেয়, তবে সেই পাত্রটি সাত বার ধৌত করতে হবে।” তবে স্বয়ং আবু হোরায়রা (রা) সেই হাদীসের বিপরীত ফাতাওয়া দিতেন। সুতরাং ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ) হাদীসটি গ্রহণ করেন নি।

৬। হাদীসের সনদ কিংবা মতনে কোনরূপ পরিবর্ধন থাকা চলবে না। যদি মতনে এমন কিছু হতো, তবে তিনি পরিবর্ধিত অংশের ওপর আমল করতেন না।

৭। খবরে ওয়াহিদে এমন কোন হুকুম বর্ণিত হওয়া চলবে না, যা সর্বসাধারণ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কারণ এমনটি হলে সে হাদীসটি মশহুর বা মোতাওয়াতির হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যখন হাদীসটি মশহুর বা মোতাওয়াতির হলো না, তখন বোঝা গেল যে, এতে নিশ্চয়ই কোন দুর্বলতা রয়েছে। সুতরাং তিনি এতে আমল করতেন না।

৮। এমন খবরে ওয়াহিদ তিনি গ্রহণ করতেন না, যে হাদীসের বিষয়ে সাহাবাদের মধ্যে মতভেদ আছে এবং এ হাদীস দ্বারা কেউ দলীল গ্রহণ করেন নি। সুতরাং বোঝা গেল যে হাদীসটি প্রমাণিত নয়। কেননা, হাদীসটি প্রমাণিত হলে কেউ না কেউ এটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করতেন।

৯। সাহাবা বা তাবেয়ীদের মধ্যে কেউ যে হাদীসটির বিষয়ে সমালোচনা বা আপত্তি করেন নি, ইমাম আবু হানিফা (রাহ) এমন হাদীস গ্রহণ করতেন, আর সমালোচনা হয়ে থাকলে তা তিনি গ্রহণ করতেন না। কারণ এরূপ সমালোচনা হওয়ার অর্থ হলো হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়।

১০। যে সব হাদীসে হুদুদ বা শরয়ী সাজা বর্ণিত হয়েছে, আর যদি সে সবে রাবীদের মতভেদ পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে ইমাম আ'যম (রাহ) যে রিওয়ায়েতে সবচেয়ে হালকা সাজার বা শাস্তির বর্ণনা রয়েছে, সে দলীল গ্রহণ করতেন। কারণ, সর্বজনমান্য উসূল হলো, “শরয়ী সাজা সামান্য সন্দেহের কারণে মওকুফ হয়ে যায়”।

১১। হাদীসের রাবীর স্মৃতিশক্তি হাদীস শ্রবণ থেকে অপরের নিকট বর্ণনা করা পর্যন্ত একই ধরনের হওয়া চাই। এই স্মৃতিশক্তিতে কোনরূপ ভ্রম হওয়া চলবে না। এরূপ হলে তিনি তা গ্রহণ করতেন না।

১২। খবরে ওয়াহিদ হাদীস এমন কোন সর্বজন প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া চলবে না, যা কোন শহর বা এলাকা বিশেষে সাহাবা ও তাবেয়ীদের মধ্যে প্রচলিত নয়।

১৩। খবরে ওয়াহিদের রাবী শুধুমাত্র স্বীয় লেখনীর ওপরই নির্ভর করবেন না, বরং তাঁকে অবশ্যই স্মৃতিতে হাদীসকে হিফয রাখতে হবে। যদি রাবী শুধু লেখনীর ওপর নির্ভরশীল হতেন, তবে এমন হাদীস ইমাম আবু হানিফা (রাহ) গ্রহণ করতেন না।

এই হলো খবরে ওয়াহিদের ব্যাপারে ইমাম আ'যম (রাহ)-এর বিশেষ বিশেষ শর্তসমূহ। এভাবে নিরীক্ষা করেই এসব হাদীস তিনি গ্রহণ ও বর্জন করেছেন। তারপরও তাঁর ওপর অপবাদ দেয়া হয়েছিল যে, “তিনি সুন্নত (হাদীস) ত্যাগ করে স্বীয় 'রায়' দ্বারা কাজ করতেন”। অথচ তিনিই হলেন প্রথম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ফকিহ যিনি খবরে ওয়াহিদকে হুজ্জতের উপযোগী সাব্যস্ত করেছেন। 'কিতাবুল আছার'-এ তাঁর এরূপ হাদীস গ্রহণ-বর্জনের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তবে তিনি শিষ্যগণকে 'খবরে ওয়াহিদ' গ্রহণের বিষয়ে উৎসাহ দিতেন।

ইমাম আ'যম (রাহ)-এর যুগে মুরসাল হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণের প্রচলন ছিল। কেননা, যে সব বিশ্বস্ত তাবেয়ী ও তাঁদের ছাত্রদের সাথে ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ)-এর সাক্ষাত হয়েছিল, তাঁরা নির্দ্বিধায় স্বীকার করতেন যে, যখন তাঁরা কোন রিওয়ায়েত কয়েকজন সাহাবী থেকে আহরণ করতেন, তখন সে সব সাহাবীর নাম প্রকাশ করতেন না। ইমাম আযম (রাহ) যাচাই-বাছাই ছাড়া মুরসাল হাদীস গ্রহণ করতেন না। অতি বিশ্বস্ত ও পরিচিত তাবেয়ীদের বর্ণিত মুরসাল হাদীস তিনি গ্রহণ করতেন। 'কিতাবুল আছার' গ্রন্থ থেকে বোঝা যায় যে, মুরসাল হাদীসকে তিনি 'খবরে ওয়াহিদ'-এর সমান মনে করতেন এবং সে হিসাবে যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করতেন। ইমাম আ'যম (রাহ) মুরসাল হাদীসকে দলীল হিসাবে গ্রহণের উপযুক্ত মনে করতেন, তবে শর্ত ছিল যে, তা কিতাবুল্লাহ, হাদীসে মশহুর এবং শরয়ী সিদ্ধান্তের বিপরীত হবে না।

ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ) অনুসৃত ইজতিহাদের মূলনীতি বা উসূলের সঙ্গে ইমামগণের মধ্যে প্রধান তিন জন (ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ) পুরোপুরি ঐকমত্য পোষণ করেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর নাম ফিকাহ ও ইজতিহাদের ইতিহাসে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সারা বিশ্ব অকপটে এ কথা স্বীকার করে নিয়েছে যে, ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ)ই ফিকাহ ইসলামীর ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখে গেছেন। তিনি ইজতিহাদের মজবুত বুনিয়াদ স্থাপন করেছেন। এ কৃতিত্বের একমাত্র হকদার তিনিই। তাছাড়া ইমাম আ'যম (রাহ)ই চিন্তা-গবেষণার পথ নির্দেশ করে বড় বড় ফকিহ ও মুজতাহিদ সৃষ্টি করেছেন। এর বিপরীতে এই মহান ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর ওফাতের পরও চরম হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ, অপবাদের ঝড় তোলা হয়েছে। এক দল তাঁর ফিকাহ ও ইজতিহাদের বিষয়ে পুরোপুরি বিশ্বাসী এবং তাঁকে 'ইমাম আ'যম বলে মান্য করেন। এরা হলেন জমহুর উলামায়ে কিরাম ও আইম্মা-ই-মুজতাহিদীন।

অপর দল প্রকৃতপক্ষে ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বে জ্বলে পুড়ে মরছে এবং তাঁর প্রতি অহরহ কালিমা লেপন করছে। আর তাঁর এলমে ফিকাহ সম্পর্কে জনসাধারণের মাঝে ঘৃণার বহ্নি ছড়াতে সর্বদা ব্যাপৃত। তারা সর্বদা ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ) ও তাঁর ছাত্র-সাথী-শিষ্য ইমামদের সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত। খতীবে বাগদাদী (রাহ) তাঁর 'তারীখে বাগদাদ' গ্রন্থে ইমাম আ'যমের প্রশংসা ও কুৎসা সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ আলিমদের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। মালিকুল মুয়াযযাম ঈসা ইবনে আবু বকর আইউবী (রাহ)-এর মতে “আবু হানিফা সম্পর্কে সমালোচনার উদ্দেশ্যে এসব মিথ্যা উদ্ধৃতি শ্রেষ্ঠ ইমামদের নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছিল। ইমাম আ'যমের বিরুদ্ধে যে সব আলিমের নামে সমালোচনা বা অপবাদ দেয়া হয়েছিল তারা ছিলেন তাঁর ছাত্র এবং শাফেয়ী মাযহাবের বড় বড় মুহাদ্দিস-মনীষী বা পরবর্তী কালের খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণ”। আর সমালোচনাগুলোর বিষয়বস্তু প্রধানত ছিল,

(১) ইমাম আবু হানিফা (রাহ) হাদীসে নিঃস্ব ছিলেন। তিনি অতি অল্প সংখ্যক হাদীস জানতেন।

(২) তিনি স্বীয় রায় ও কিয়াসকে সহীহ হাদীসের ওপর প্রাধান্য দিতেন।

(৩) তিনি হাদীসে খুবই দুর্বল ছিলেন।

ইমাম আ'যম (রাহ) সম্বন্ধে এমন সব কটূক্তি ও অপবাদ আরোপ করা হয়েছে যা মুখে উচ্চারণ করাও কষ্টসাধ্য। তাঁর সম্পর্কে এমন আকিদা জনগণকে দেয়া হয়েছিল, যার সাথে আদৌ ইমাম আ'যমের কোন সম্পর্ক ছিল না। দুশমনদের কেউ বলেছিল যে তিনি মুরজিয়া ছিলেন। কেউ বলেছে, তিনি 'কাদারিয়া' ছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে পুনঃজন্মে বিশ্বাসী বলে প্রচার করেছিল। একদল তাঁকে হাদীস অমান্যকারী বলে আখ্যায়িত করেছিল। এমন কি অনেক সাধারণ অজ্ঞ মানুষের মতে তিনি আল্লাহর দীনে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজের রায়-এর সংমিশ্রণ ঘটাতে চেয়েছেন (না-উযুবিল্লাহ)।

ইমাম আ'যমের মৃত্যুর পর বিশ্বের দেশে দেশে তাঁর ফিকাহর নীতি সর্বজনীনভাবে গৃহীত হওয়ার পর, সত্য প্রকাশের সাথে সাথে তাঁর প্রতি আরোপিত অপবাদ শুষ্ক খড়কুটোর মত বাতাসে মিশে যায়। এর কোন নাম-নিশানা বাকি থাকে নি। তবে (১) ও (২)- এ আরোপিত অভিযোগ-অপবাদ আজও আছে হয়তো ভবিষ্যতেও থাকবে। অবশ্য অভিযোগ দু'টি এক দিকে মাযহাবী গোঁড়ামী ও অন্য দিকে আইম্মায়ে মুজতাহিদীন কর্তৃক আহকামে শরীয়া উদ্ভাবনের পদ্ধতি ও নীতিমালা সম্পর্কে অনবহিতের বা না-জানার কারণেই হয়েছে।

এখানে স্মরণীয় যে, ইমাম আ'যম (রাহ) সম্পর্কে তাঁর বড় বড় শিষ্য ও সাথীদের অসংখ্য প্রশংসা-বাক্য বিভিন্ন কিতাবে রয়েছে। তাঁরা উস্তাদ থেকে হাদীস ও ফিকাহর জ্ঞান অর্জন করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। উস্তাদের জ্ঞান-গরিমা, পরহিযগারী ও অন্যান্য গুণাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করে কিতাবে আলোচনা করেছেন। সুতরাং তাঁদের নামে প্রচারিত সমালোচনা কিছুতেই ধর্তব্য হতে পারে না। আর শাফেয়ী মাযহাবের অনেক পন্ডিত-মনীষী ইমাম আবু হানিফা (রাহ) সম্পর্কে বহু গ্রন্থ লেখেছেন। এতে তাঁর ফযল ও বৈশিষ্ট (মানাকিব) নিয়ে তাঁরা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমালোচনারও তাঁরা উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন। আধুনিক যুগেও ড. মুহাম্মদ আবু যোহরা মিসরী (রাহ) ও ড. মুসতাফা হুসনী আস-সুবায়ী এরূপ কিতাব লেখেছেন। এখানে ড. আস-সুবায়ী (রাহ)-এর 'আস সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিল তাশরীয়িল ইসলামী' (ইসলামী শরীয়াহ ও সুন্নাহ নামে বঙ্গানুবাদিত) গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা যায়। ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর বিরুদ্ধে অন্যান্য সমালোচনার জবাব প্রখ্যাত মনীষীদের উক্তিসমূহে রয়েছে যা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

এ পর্যায়ে সুধী পাঠক নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিয়েও চিন্তা করতে পারেন।

(ক) ইমাম আ'যম আবু হানিফার (রাহ.) অনুগামী-অনুসারী ও তাঁর বিরোধী সবাই এ বিষয়ে একমত যে, তিনি মুসলিম জাতির এক অবিসংবাদিত ইমাম ও মুজতাহিদ ছিলেন। মুজতাহিদের শর্তসমূহের একটি হলো, তিনি অবশ্যই আহকাম সম্পর্কিত সকল হাদীস সম্বন্ধে পূর্ণভাবে জ্ঞাত হবেন। অবশ্য আহকাম সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যা প্রায় এক হাজার। ইমাম আবু দাউদ (রাহ) এই সংখ্যা চার হাজার আটশো বলে অভিমত দিয়েছেন। ইবনে মুবারক (রাহ) বলেছেন যে, এর সংখ্যা নয়শো। আর 'নূরুল আনোয়ার' কিতাবে এর সংখ্যা তিন হাজার বলে উল্লেখিত আছে। ইবনে মাহদী (রাহ) ও ইবনে সায়ীদ আল-কাত্তান (রাহ) এর সংখ্যা আটশো বলেছেন। আহকামে শরীয়া সম্পর্কে ইজতিহাদ করা ইমাম আবু হানিফার পক্ষে কিভাবে জায়েয হলো যে তিনি মুজতাহিদের শর্তই পূরণ করলেন না। আর অন্যান্য মুজতাহিদ ইমাম তাঁর ইজতিহাদে কিভাবে এমন আস্থা স্থাপন করলেন এবং তাঁর ফিকাহ কিভাবে তাঁরা এমন গুরুত্ব সহকারে পৃথিবীর সবখানে পৌঁছিয়ে দিলেন? আর আবু হানিফার ইজতিহাদ ও ফিকাহর ওপর তাঁরা পর্যালোচনা বা এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন তাঁদের সময় নষ্ট করলেন, যখন তাঁর ফিকাহর গোড়াতে কোন ভিত্তি ছিল না? সুতরাং ইমাম আ'যমের অনেক হাদীসের ওপর পুরাপুরি দখল ছিল বলে বিশ্বাস করতেই হবে।

(খ) যে কেউ ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহ)-এর মাযহাব সম্পর্কে অধ্যয়ন করবেন তিনি অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে, তাঁর মাযহাবের শত শত ফিকাহর মাসয়ালা সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ হাদীসের অনুকূল। 'কামূস' গ্রন্থের ব্যাখ্যাতা সাইয়েদ মুরতাযা যুবাইদী ইবনে মুহাম্মদ হুসাইনী, রাহ. (১১৪৫-১২০৫হি) যে সব হাদীসের ওপর ইমাম আ'যমের মাযহাব প্রতিষ্ঠিত সেগুলো 'উকুদুল জাওয়াহির আল-মুনিফা ফি উসুলে আদিল্লাতে মাযহাবে আবু হানিফা' (১২৯২ হি) নামক গ্রন্থে একত্র করেছেন। যদি আবু হানিফা (রাহ)-এর মাত্র দশ, সতের, পঞ্চাশ বা দেড়শো হাদীসই জানা ছিল, তবে গ্রন্থকার কিভাবে শত শত হাদীস তাঁর মাযহাব ও ইজতিহাদের অনুকূলে একত্র করলেন?

(গ) ইমাম আবু হানিফা (রাহ) সে সব আইম্মায়ে হাদীসের মধ্যে গণ্য, যাঁদের 'রায়' এলমে উসুলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এমন ব্যক্তি কিভাবে হাদীসে নিঃস্ব হতে পারেন? শুধু তাই নয়, মুহাদ্দিসদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা (রাহ) হাদীসের এমন এক জন ইমামের মধ্যে গণ্য যার 'রায়' ও দৃষ্টিভঙ্গি এলমে উসূলে হাদীসে ও রিজালে হাদীসের কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং তাঁর নীতিমালা হাদীসের ইমাম ও রিজালে হাদীসের মধ্যে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত। হাদীস গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্যকরণে তাঁর ওপর নির্ভর করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে হাদীস ও হাদীসের রাবীকে তিনি অগ্রাহ্য করেন তা প্রত্যাখ্যাত এবং যাকে ও যে হাদীসকে গ্রাহ্য করেন তা গ্রহণযোগ্য। তবে কি এমন ইমামকে হাদীসে নিঃস্ব বলা তাঁর ওপর তোহমত নয়?

(ঘ) ইমাম আবু হানিফা (রাহ) চার হাজার মুহাদ্দিস থেকে হাদীস লেখেছেন বা শিক্ষা করেছেন। এমন কি ইমাম যাহাবী (রাহ) 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' গ্রন্থে ইমাম আ'যমের উস্তাদগণের তালিকাকে 'ছাবত আল হুফ্ফায' বলে গণ্য করেছেন। ইয়াহিয়া ইবনে নাসর একটি বর্ণনা এরূপ দিয়েছেন, "আমি আবু হানিফার গৃহে গিয়ে দেখলাম, তাঁর গৃহ হাদীসের কিতাবে (পান্ডুলিপিতে) ভরপুর। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম 'এসব কি? তিনি বললেন, 'এসব হাদীস'। এর থেকে সামান্য হাদীসই, যা ফিকাহর মাসয়ালার ক্ষেত্রে জনগণের জন্য ফলদায়ক, তা-ই আমার শিষ্যদের নিকট বর্ণনা করেছি"।

(ঙ) ইমাম আবু হানিফা (রাহ) অন্য সব মুহাদ্দিসের মত দরসে হাদীসের মজলিসে হাদীস বর্ণনার জন্য বসতেন না এবং তিনি স্বয়ং কোন হাদীস ও আছারের গ্রন্থ লেখেন নি, যেমনটি লেখেছেন ইমাম মালিক (মুয়াত্তা)। তাঁর শিষ্যগণ তাঁর লেখা হাদীসসমূহ গ্রন্থাকারে ও মুসনাদ আকারে সাজিয়েছেন যেগুলোর সংখ্যা বিশের অধিক। এতেই প্রমাণিত হয় যে ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ) বহু হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন।

ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ) ছিলেন এমন একজন ইমাম যিনি বহু মহান ব্যক্তির সাহচর্য পেয়েছেন, যাঁর পারিপার্শ্বিক এলমী অবস্থা ছিল পরম বিশুদ্ধ, সাহাবায়ে

কিরামের নিকটবর্তী যুগ। তিনি আল্লাহর দীনের বিষয়াদি অনুধাবনে উচ্চতর বোধশক্তির অধিকারী এবং ইজতিহাদে চরম ও পরম দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রতি অন্যায়মূলক হামলা সমীচীন হতে পারে না। ব্যক্তি বিদ্বেষ ও কোন কোন রাবীর চরম মূর্খতা, যাচাই-বাছাই ছাড়া শিশুসুলভ বাগাড়ম্বরতার কারণে এই অপবাদ রূপ হামলার শুরু হয়েছিল ইমামুল মুহাদ্দিসীনের জীবন-কালেই (সে হামলা আজও কিছু জারি রয়েছে)। অবশেষে কোরআন সৃষ্ট, 'খালকে কোরআন' ফিতনার পর সে হামলা চরম আকার ধারণ করলো। (বর্তমানেও লা-মাযহাবী তথাকথিত 'আহলে হাদীস সম্প্রদায়' তাঁর ও তাঁর সহচরদের ওপর নির্লজ্জ হামলা করে যাচ্ছে এবং চরম অপবাদের ঝড় তুলছে)। এই চরম নিকৃষ্ট হামলার একমাত্র কারণ মু'তাযিলাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ। মু'তাযিলারা 'খালকে কোরআন' বিষয়ে আব্বাসীদের পৃষ্ঠপোষকতায় মুহাদ্দিসদের ওপর চরম নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করে। আর দুর্ভাগ্যবশত মু'তাযিলারা সাধারণভাবে ফিকাহর মাসয়ালায় ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ)-এর অনুসরণ করে। এ কারণেই অত্যাচারিত মুহাদ্দিসগণ মু'তাযিলাদের পরিবর্তে ইমাম আবু হানিফা (রাহ) ও তাঁর সাথীদের প্রতি অপবাদের ঝড় চালিয়ে দেয়। সুতরাং ইমাম আ'যমের ও তাঁর সাথীদের ওপর পরবর্তীদের হামলার জন্য মু'তাযিলাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ এবং পূর্ববর্তীদের হামলার রহস্য ছিল ব্যক্তি-বিদ্বেষ ও চরম মূর্খতা। খতীব বাগদাদী বলেন, " আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, যুফার, মুহাম্মদ এবং তাঁর অন্য কোন সহচর 'খালকে কোরআন' সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। ' খালকে কোরআন' সম্পর্কে বিশর মরিসী ও ইবনে আবু দাউদ উচ্চবাচ্য করেছেন। আর এটাই আবু হানিফা ও তাঁর সাথীদেরকে সমালোচনার টার্গেটে পরিণত করেছিল"।

বিরোধীরা ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর বিরুদ্ধে চরম বাড়াবাড়ি করে সীমা লংঘন করেছিল। তাদের দৃষ্টিতে ইমাম আ'যম আবু হানিফার বিরুদ্ধে অপবাদ এই ছিল যে, তিনি 'রায়' ও 'কিয়াস'কে হাদীস ও আছারের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। এমন কি দলীল গ্রহণ কালে 'রায়' ও কিয়াসকে সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের মতে 'যখন হাদীস বিশুদ্ধ প্রমাণিত হবে, তখন 'কিয়াস' ও 'রায়' বাতিল বলে গণ্য হবে। অবশ্য ইমাম আবু হানিফা (রাহ) যখন কোন হাদীসকে অগ্রাহ্য করেছেন, সে ক্ষেত্রে তিনি কোন না কোন কারণ অবশ্যই দেখিয়েছেন। তাঁর এই নীতি তাঁর পূর্ববর্তী বহু মুজতাহিদ ইমাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তখন এই নীতি গ্রহণ করেন নি। তিনি যা গ্রহণ করেছিলেন, তা কুফার সকল ইমাম যেমন ইবরাহীম নখয়ী ও ইবনে মাসউদের শিষ্যগণও করেছেন। তবে তিনি যা করেছিলেন তা হলো, কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমার ভিত্তিতে এক সার্বজনীন ও সর্বকালে ব্যবহার উপযোগী, মুসলমানদের পথ-নিদের্শক হিসাবে 'ফিকাহ ইসলামীকে ঢেলে সাজানোর পবিত্র লক্ষ্যে মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কে হতে পরে 'এমন বিষয়গুলোকে ঘটেছে' ধরে নিয়ে কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে এর আহকাম বের করে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। যাতে অনাগত মুসলিম জাতি, উলামায়ে কিরাম ও ফকিহগণ এটাকে আলোকবর্তিকা হিসাবে পেতে পারে। একারণেই সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ ও সত্যের অনুরাগী সকল মুহাদ্দিস ও উলামায়ে কিরাম "তাঁকে ইমামুল আইম্মা বা ইমামে

আ'যম" বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। যা সব মাযহাবপন্থীরা মেনে নিয়েছিলেন। একমাত্র হিংসুক ও পরশ্রীকাতর কিছু লোকই তাঁর নিন্দাবাদ করে বেড়ায়, এটা বড়ই বেদনাদায়ক।

হাফিয ইবনে আবদুল বার মালেকী (রাহ) বলেছেন, "মুহাদ্দিসগণ ইমাম আবু হানিফাকে 'মুরজিয়া' হওয়ার দোষারূপ করেছেন"। ড. মুসতাফা সুবায়ী (রাহ) বলেন, "আমার একনিষ্ঠ বিচার-বিবেচনায় আবু হানিফার 'মুরজিয়া' হওয়া বিশুদ্ধ সুন্নাহ-সম্মত"। আসলে উলামায়ে কিরামের মধ্যে বহু ব্যক্তি রয়েছেন যারা 'মুরজিয়া' বলে গণ্য, কিন্তু 'মুরজিয়া' বিষয়ে আবু হানিফার বিরুদ্ধে যে ঝড় উঠেছিল, এমন আর কারো বিরুদ্ধে হয় নি। তিনি প্রায় বিশ বছর 'আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত' এর পৃষ্ঠপোষকতায় খারিজী ও মুতাযিলাদের প্রত্যক্ষভাবে মুকাবিলা করেছেন। এজন্য তাঁকে 'মুরজিয়া' বলা হতো। তবে ইমাম আ'যমের বিরোধীরা তাঁকে অপবাদ দিয়েই 'মুরজিয়া' বলতো। সত্যিকার অর্থেই এটা তাঁর প্রতি একটি চরম অপবাদ। এরূপ আর কারো বিরুদ্ধে হয় নি। এর একমাত্র কারণ, তিনি আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের নিকট একজন সর্বসম্মত ইমাম ছিলেন। অনেক মুহাদ্দিস তাঁর প্রতি ভীষণ ক্ষিপ্ত ছিলেন। তাঁরা তাঁর প্রতি এমন সব কথাবার্তা নিক্ষেপ করেছিলেন যা থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র ছিলেন। তারা নিজেরা এমন সব মনগড়া অপবাদ তাঁর প্রতি আরোপ করেছিলেন, যা তিনি নন বরং সাধারণ আলিমের প্রতিও আরোপিত হতে পারে না। অথচ একথা সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট যে, বিরাট একদল ব্যক্তিত্বশীল, দায়িত্বশীল, জ্ঞানী-গুণী ও বিজ্ঞ উলামা-মুহাদ্দিস ইমাম আবু হানিফার ব্যক্তিত্বের ও জ্ঞান-গরিমার প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

এক নযরে ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অপবাদ ও সমালোচনার কারণ ও এ সবের জবাব

১। ইমাম আবু হানিফা (রাহ) তাঁর যুগের প্রথম ইমাম, যিনি কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূলুল্লাহ (ছা) হতে ফিকাহর বিষয় সম্পর্কে আহকাম বের করেন, উসূলের ওপর ফুরূ-এর বিন্যাসে এবং এমন সব কিয়াসী মাসয়ালা জিজ্ঞেস-করণে "যা এখনো সংঘটিত হয় নি, তবে অচিরেই ঘটতে পারে", অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সমাধানে পৌঁছেছেন। অবশ্য এর পূর্বে উলামায়ে কিরাম ও মুজতাহিদীনে ইযাম এ পদ্ধতি মোটেই পছন্দ করতেন না। তাঁরা এ হেন কিয়াসী বা অনুমানভিত্তিক মাসয়ালা জিজ্ঞেস করাকে সময়ের অপচয় বলে মনে করতেন। তাদের দৃষ্টিতে ফিকাহ সম্পর্কে এহেন প্রচেষ্টায় দীনের কোন সুফল থাকতে পারে না। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর নীতি ছিল ভিন্নরূপ। তিনি মনে করতেন, একজন মুজতাহিদের দায়িত্ব হলো যে, তিনি জনসাধারণের জন্য ফিকাহর মাসয়ালা বের করার পথ উন্মুক্ত করে দেবেন। একজন মুজতাহিদকে অবশ্যই এমন সব মাসয়ালা ও বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে, যা এখনো সংঘটিত হয় নি তবে সংঘটিত হতে পারে। ফিকাহর উসূল ও ফুরূ-এর শাখা-প্রশাখা বিন্যাস ও বিভিন্ন প্রকার ফিকাহর মাসয়ালার আহকাম নিরূপণে আবু হানিফার কর্মপদ্ধতির বিশালতার ফলে হানাফী ফিকাহর মাসয়ালার সংখ্যা বিরাট আকার ধারণ করেছিল। যা অন্য যে কোন মুজতাহিদ ইমামের বর্ণিত মাসয়ালার সংখ্যার চেয়ে

অনেক বেশি। এতে ইমাম আ'যমের বিরুদ্ধে সমালোচনাকারীরা জ্বলে পুড়ে মরছিলেন এবং নিজেদের অন্তর্জ্বালা এই বলে নিবারণ করেছিলেন, "আবু হানিফা সংঘটিত হয়েছে এমন মাসয়ালা সম্পর্কে সবচে' অজ্ঞ ছিলেন এবং সংঘটিত হতে পারে এমন মাসয়ালা সম্পর্কে সবচে' বেশি জ্ঞানী ছিলেন"।

২। ইমাম আবু হানিফা (রাহ) হাদীস গ্রহণে সাধারণ মুহাদ্দিসদের তুলনায় কঠোরতা অবলম্বন করতেন এবং হাদীস গ্রহণে কঠিন শর্ত আরোপ করতেন। সেকালে হাদীস জালকরণের ফিতনা ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। ইরাক মুসলিম বিশ্বের মাঝে চিন্তা-গবেষণা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সামরিক দিক থেকে কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। এসব কারণে হাদীস গ্রহণে ইমাম আবু হানিফাকে বিশেষ ব্যবস্থা ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। আর এ কারণেই তিনি এমন সব নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত হাদীসই গ্রহণ করতেন যা বিশ্বস্ততার দিক থেকে ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

এ দিক থেকে শুধু ইমাম আবু হানিফা (রাহ) সাধারণ মুহাদ্দিসদের চেয়ে হাদীস গ্রহণে অধিক সতকর্তা ও কঠোরতা অবলম্বন করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি অন্যান্য মুহাদ্দিসদের থেকে অনেক অগ্রবর্তী ছিলেন বিধায় সাধারণ মুহাদ্দিসদের দৃষ্টিতে যেসব হাদীস বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য ছিল, তা ইমাম আবু হানিফার নিকট দুর্বল বলে সাব্যস্ত হতো।

৩। এক দিকে ছিল উপরোক্ত কঠোরতা, অপর দিকে ইমাম আবু হানিফা (রাহ) সাধারণ মুহাদ্দিসদের মতের বিরুদ্ধে এমন সব মুরসাল হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ বৈধ মনে করতেন, যে সব মুরসাল হাদীসের রাবী স্বয়ং নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত হতেন। অথচ জমহুর মুহাদ্দিসগণ এ নীতির বিরুদ্ধে ছিলেন। তারা মুরসাল হাদীসকে গ্রহণযোগ্য মনে করতেন না বরং মুরসাল হাদীসকে দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য মনে করতেন। আর এমন সব মুরসাল হাদীস দ্বারা ইমাম আ'যম কর্তৃক দলীল গ্রহণ করার কারণে সকলেই তাঁর ওপর ক্ষেপে যান।

৪। হাদীসের ক্ষেত্রে আমলের পরিসীমায় উপরোক্ত স্বয়ং প্রবর্তিত শর্তের গন্ডির মধ্যে অবস্থানের একটি ফল এই হলো যে, তাঁকে ফিকাহর মাসয়ালার জন্য কিয়াসের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হয়েছিল এবং 'রায়' দ্বারা কাজ সমাধা করতে হয়েছিল বেশি। অবশ্য নিঃসন্দেহে আল্লাহতায়ালা ইমাম আবু হানিফাকে এ বিষয়ে অতি আশ্চর্যজনক ক্ষমতা এবং অতুলনীয় যোগ্যতা প্রদান করেছিলেন যা অপর কারো ভাগ্যে ঘটে নি বললেই চলে। তাই তাঁর 'কিয়াস' ও 'রায়' হাদীসের আলোকেই উদ্ভাবিত হতো। সন্দেহাতীতভাবে আবু হানিফা (রাহ) কর্তৃক 'কিয়াস'-এর এমন ব্যাপক ব্যবহারই প্রকৃতপক্ষে মুহাদ্দিসগণ ও তাঁর মাঝে বিরাট দূরত্ব সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনিভাবে কিয়াসের এই ব্যাপক ব্যবহার তাঁর ও অন্যসব ফকিহদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে যারা অপারগ অবস্থায় কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ সংগত মনে করতেন। আর এই দূরত্বই মুহাদ্দিস ও ফকিহদের এবং ইমাম আবু হানিফার মধ্যকার দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৫। ফিকাহর আহকাম নিরূপণে ইমাম আবু হানিফার নীতি ছিল অতি আশ্চর্যজনক ও সূক্ষ্ম। তিনি প্রত্যেকটি মাসয়ালার দলীল গ্রহণে এবং হুকুম নিরূপণে বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তনে এমন সুদক্ষ ছিলেন যে, তাঁর বিজ্ঞ শিষ্যগণও এতে হতবাক হয়ে যেতেন। তাঁর এমন আশ্চর্যজনক ক্ষমতা সম্পর্কে ইমাম মালিক (রাহ) বলেন, "এই লোকটি (ইমাম আবু

হানিফা) তো এমন ব্যক্তিত্ব যে, তিনি যদি ইচ্ছা করেন যে, এই স্তম্ভটি সোনার প্রমাণিত করবেন, তবে নিশ্চয়ই এর স্বপক্ষে দলীল উপস্থিত করতে পারবেন।"

সুতরাং ইমাম আবু হানিফার 'রায়' (কর্মনীতি) শরীয়তের আহকাম নির্ধারণে অন্য আলিমদের খেলাফ হওয়া ও যে সব মুহাদ্দিস প্রকাশ্য দলীলের ওপর এসে থমকে দাঁড়ায়, তাদের রায়েরও খেলাফ হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়। এসব আলিম মুহাদ্দিসরা কোনরূপ চিন্তা-গবেষণা করাকে অত্যন্ত খারাপ মনে করতেন। বিশেষত আলিমদের মাঝে এমন সাধারণ ব্যক্তিও এসে অতি সহজে মুহাদ্দিস হয়ে বসতেন যাদের সম্পর্কে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াহিয়া ইবনে ইয়ামান (রাহ) বলেন, "সেই নামেমাত্র মুহাদ্দিসদের মধ্যে এমনও কেউ আছেন, যিনি লেখতেন বটে কিন্তু চিন্তা-গবেষণা বা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করতেন না। যখন তাকে ফিকাহর কোন মাসয়ালা জিজ্ঞেস করা হয়, তখন তিনি বসে পড়েন এবং পড়াতে শুরু করেন, যেমনটি করেন কোন মুন্সী"। কোন কোন সময় অজ্ঞতার কারণে তারা হাদীসের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে থাকেন, এমন কি হাস্যাস্পদ ফাতাওয়া দিয়ে থাকেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এসব নামেমাত্র মুহাদ্দিসরা কখনো ইমাম আবু হানিফার সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টি, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ এবং ফিকাহর আহকাম নিরূপণে গভীর প্রজ্ঞা বুঝতে সক্ষম হন নি। সেহেতু এসব নামেমাত্র মুহাদ্দিসরাই আবু হানিফা (রাহ) সম্পর্কে অপবাদ রটায়। তাঁর সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টিতে, তাঁর বিশ্বস্ততা, দীনদারী ও সত্যনিষ্ঠা সম্পর্কে জঘন্য কথা ছড়াতে ও তিনি হাদীস অগ্রাহ্য করতেন বলে মিথ্যা অপবাদ আরোপে তারাই অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।

৬। এ কথা সত্য যে ইমাম আবু হানিফার সময়ে অনেক উলামায়ে কিরাম ছিলেন। বলতে গেলে সে সময়টি ছিল 'আহলে এলেম' এর যুগ। মানুষ জন্মগতভাবে একে অপরের অগ্রগামী হতে চায়, শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায়। এই চাওয়ার দাবি হলো যিনি তাদের মাঝে বিদ্যা-বুদ্ধিতে, সম্মান ও মাহাত্ম্যে শ্রেষ্ঠ হন বা লোক সমাজে যার সুখ্যাতি ব্যাপক অথবা যিনি লোক সমাজে শ্রদ্ধার পাত্র, তারা তাঁর সম্পর্কে অন্তরে এক প্রকার ঈর্ষা অনুভব করেন। যদি তাঁর বিরুদ্ধে কিছু নাও করতে পারেন তবুও তাঁর কিছুটা অপবাদ রটাতে চান। এটি এমন একটি বদ-অভ্যাস, যদি কেউ এই হীন অভ্যাস থেকে বেঁচে থাকেনও, তবুও কিছু কিছু আলিম এতে জড়িয়ে পড়েন। তবে আল্লাহতায়ালা যাঁদের অন্তরকে স্বীয় রহমতে পবিত্র রেখেছেন এবং যাঁরা নবী (ছা)-এর হিদায়েত বা শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

হাফিয ইমাম ইবনে আবদুল বার (রাহ) 'জামিউ বায়ানিল উলুম' গ্রন্থে 'উলামায়ে কিরামের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতা' শীর্ষক বিশেষ অধ্যায় লেখেছেন। গ্রন্থের প্রথমেই তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন।

"আলিমদের কথা তোমরা কান লাগিয়ে শুনবে। তবে একে অপরের সমালোচনার কথা বিশ্বাস করবে না। কারণ, কছম সেই মহান সত্তার, যাঁর হাতে আমার জীবন, ভেড়া যেমন নিজ শিং দ্বারা একে অপরকে গুতো মারে, এর চেয়েও চরমভাবে 'আহলে এলেম' পরশ্রীকাতরতায় একে অপরের ওপর সূক্ষ্ম হামলা চালায়"। গ্রন্থে আলিমদের অপবাদের কয়েকটি ঘটনাও উল্লেখিত হয়েছে।

এ কথা চিরসত্য যে, ইমাম আবু হানিফা (রাহ) এলেম, সম্মান ও সুখ্যাতিতে চরম শিখরে উন্নীত ছিলেন। এতে তাঁর সমসাময়িক যুগের কেউ কেউ তাঁর সম্পর্কে এমন জঘন্য উক্তিও করেছিল যা কোন অবস্থাতেই সমীচীন ছিল না। তৎকালীন শাসকবর্গের নিকট তাঁর সম্পর্কে অবাস্তব কথাবার্তা পৌঁছানো হতো, এমন কি শেষ পর্যন্ত স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা (রাহ) বাধ্য হয়েই তাঁর সমসাময়িক কুফার কাযী আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা সম্পর্কে এ কথা বলেছিলেন,

"প্রকৃত বিষয় এই যে, ইবনে আবু লায়লা আমার সম্পর্কে এমন জঘন্য কথা বলতে হালাল জ্ঞান করে যা আমি জন্তু-জানোয়ার সম্পর্কে বলাও হালাল মনে করছি না।"

৭। এভাবে নানা কারণে সাধারণ কিছু লোক ইমাম আবু হানিফা (রাহ) সম্পর্কে অবাস্তব ও অবান্তর কথাবার্তা বলাবলি শুরু করে দিল। ইমাম আবু হানিফার ইজতিহাদের পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে তারা বস্তুত এমন কথাবার্তা বলতো। অবশ্য দূরদেশে অবস্থানকারী আলিমদের কাছেও তাদের এসব জঘন্য উক্তি পৌঁছেছিল। তাঁদের সাথে ইমাম আ'যমের সাক্ষাত না হওয়ায় তাঁর ফাতাওয়া তাঁদের কাছে হাদীস বিরোধী বলে মনে হতো। সে জন্য তাঁদের মুখ থেকেও এমন সব উক্তি বের হতো যা ইমাম আ'যমের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াতে সহায়ক ছিল। অবশ্য এ ধরনের কোন আলিমের সাথে ইমাম আবু হানিফার সাক্ষাত ঘটলে তাঁর সাথে আলোচনার পর, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর অবশ্যই তাঁরা ইমাম আ'যমের তাকওয়া, কোরআন-হাদীসের জ্ঞান গ্রহণে পারঙ্গমতা ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তি অকপটে স্বীকার করে তাঁর প্রশংসায় উচ্ছসিত হয়ে যেতেন। মহাত্মা ইমামের প্রতি বিরূপ মন্তব্য করার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হতেন। এ ধরনের অনেক ঘটনা রয়েছে।

ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ)-এর প্রতি আরোপিত অনেক আপত্তি ও বাদ-অপবাদের জবাব এরই মধ্যে স্বাভাবিকভাবে হয়ে গিয়েছে। আরও কিছু আপত্তির ইনসাফ-ভিত্তিক পর্যালোচনা এখানে করা হলো,

১। ইমাম নাসায়ী, রাহ. (২১৫-৩০৩হি) স্বীয় কিতাব 'আয-যুআফা'তে ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর আলোচনা করতে গিয়ে লেখেছেন, "সাবিত পুত্র নো'মান ওরফে আবু হানিফা হাদীস শাস্ত্রে শক্তিশালী নন"। ইমাম দারাকুতনী (রাহ), ইমাম বায়হাকী (রাহ) প্রমুখ ইমাম আবু হানিফা (রাহ) সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, হাদীস বর্ণনায় তাঁর দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম ইবনে আদী (রাহ)ও প্রথমে এরূপ ধারণা পোষণ করতেন। পরে তিনি ইমাম তাহাভী, রাহ. (২২৯-৩২১হি)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ইমাম আ'যমের ব্যাপারে প্রকৃত অবস্থা অবহিত হন। তিনি 'মুসনাদে আবু হানিফা' গ্রন্থও সংকলন করেন। হিংসুকের ষড়যন্ত্রের কারণে ইমাম বোখারী (রাহ)ও ইমাম আ'যমের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়েছিলেন। অথচ তিনিও হানাফী ফিকাহ পড়তেন।

মুহাদ্দিস মাওলানা আবদুল আউয়াল জৈনপুরী (রাহ) বলেন, ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর প্রতি হাদীস বর্ণনায় দুর্বলতার অভিযোগ যথাযথ হতে পারে না। তিনি কয়েকটি নকশার মাধ্যমে ইমাম আবু হানিফার শিষ্যদের এবং অনু-শিষ্যদের মধ্যে যে যোগসূত্র ও ধারাবাহিকতা রয়েছে তা তুলে ধরে প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম আ'যমকে দুর্বল বলা হলে মুহাদ্দিসদের জামাতকেই দুর্বল বলতে হবে, এমন কি 'সিহাহ সিত্তাহ' (হাদীসের ছয়টি

বিশুদ্ধ গ্রন্থ)-এর সংকলকরাও দুর্বল বলে আখ্যায়িত হবেন। ফলে এসব হাদীস গ্রন্থে ইমাম আযমের শিষ্যত্বের ধারাবাহিকতায় যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকেও দুর্বল না বলে পারা যাবে না। উল্লেখ যে 'সিহাহ সিত্তাহ'র গ্রন্থসমূহে ইমাম আ'যমের ছাত্র ও অনু-ছাত্রদের থেকে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়ে সংকলিত হয়েছে। সুতরাং ইমাম আবু হানিফাকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল বলা হলে 'সিহাহ সিত্তাহ' সংকলনকারী ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসায়ী, ইমাম ইবনে মাজাহ এঁরা সবাই দুর্বল বলে আখ্যায়িত হবেন। এমন কি ফিকাহর বড় বড় ইমাম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস, যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিষ্যত্বের ধারাবাহিকতায় ইমাম আবু হানিফার সাথে গ্রথিত রয়েছেন, তাঁরাও দুর্বল বলে আখ্যায়িত হবেন। 'জামেউ মাসানীদিল ইমামিল আযম' যা আল্লামা শায়খ আবু মুয়ীদ মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ ইবনে মুহাম্মদ খাওয়ারিযমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সংকলন করেছেন এর দ্বিতীয় খন্ডে আল্লামা খাওয়ারিযমী সাইয়্যেদোনা ইমাম আ'যম রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বিশেষ নামকরা শাগরিদদের নামের একটি বিরাট ও লম্বা তালিকা পেশ করেছেন। যাতে গ্রন্থকার 'আসহাবুল ইমাম' বলে এক বিশেষ পর্ব স্থাপন করেছেন এবং সাথেই তাদের উচ্চ মর্যাদার দিকে বিস্তৃত ইঙ্গিতও করেছেন যে, তাঁরা আসহাবে সিহাহ সিত্তাহ (তথা বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)-এর উস্তাদগণের মধ্য থেকে হন অথবা তাদের উস্তাদগণের উস্তাদ। অর্থাৎ কোথাও উস্তাদ এবং কোথাও দাদা উস্তাদ হন। আর তাঁরা সকলেই একই সাথে মুহাদ্দিসও ছিলেন এবং ফকিহও। কাজেই ইমাম আ'যমকে দুর্বল বলা এতো সহজ নয়, যেখানে তাঁর বিশ্বস্ততার প্রমাণ অসংখ্য খ্যাতিমান মনীষীর বাক্যাবলীতে রয়েছে যার কিছু পূর্বে দেখানো হয়েছে।

এখানে আরও কিছু বিষয় বিবেচ্য রয়েছে। যেমন জরাহ ও তা'দীলের ইমামগণ কিছু নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। হাদীসে কোন বর্ণনাকারী সম্বন্ধে জরাহ ও তা'দীলের ভিত্তিতে ফয়সালা করতে হলে এসব নীতিমালা দৃষ্টির সামনে রাখা অত্যন্ত জরুরী। অন্যথায় যে কোন বড়র চেয়ে বড় মুহাদ্দিসেরও আদালত ও বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হবে না। কেননা, সব বড় বড় ইমাম সম্পর্কে কারো না কারো সমালোচনা অতি অবশ্যই বিদ্যমান রয়েছে। যেমন ইয়াহিয়া ইবনে মঈন (রাহ) ইমাম শাফেয়ী (রাহ)-এর ওপর, ইমাম হুসাইন কারাবেসীর (মৃ.২৪৮হি) ওপর ইমাম আহমদের (রাহ), ইমাম বোখারী (রাহ)-এর ওপর ইমাম যুহলীর (রাহ), ইমাম আওযায়ী (রাহ)-এর ওপর ইমাম আহমদ (রাহ)-এর সমালোচনা রয়েছে। যদি সবই গ্রহণ করা হয় তবে তাঁদের মধ্যে কেউই আর বিশ্বস্ত থাকবেন না। ইমাম হাযম (রাহ) ইমাম তিরমিযী (রাহ) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (রাহ)কে অজ্ঞাত বলেছেন। স্বয়ং নাসায়ী (রাহ)কে বহু সংখ্যক আলিম-মুহাদ্দিস শিয়াপন্থী হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন এবং এরই ভিত্তিতে তাঁর সমালোচনা করেছেন।

আসল কথা হলো, জরাহ ও তা'দীলের ইমামগণ কিছু মৌলিক নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন। প্রথম নীতি হলো, যে ব্যক্তি ইমাম হওয়ার ব্যাপারে মর্যাদা ও বিশ্বস্ততায় মোতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন, তাঁর ব্যাপারে দু'এক জনের সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর ন্যায়পরায়ণতা ও ইমাম হওয়া মোতাওয়াতির পর্যায়ে

উত্তীর্ণ হয়ে আছে। হাদীসের বড় বড় ইমাম তাঁর এলেম ও তাকওয়ার প্রশংসা করেছেন। সুতরাং ইমাম আ'যম সম্পর্কে কোন ব্যক্তি বিশেষের সমালোচনা গ্রহণযোগ্য হয় না।

জরাহ ও তা'দীল নীতির প্রতি অসচেতনার কারণে কেউ কেউ মনে করেন যে, "প্রত্যয়নের ওপর সমালোচনা অগ্রগণ্য হবে। ইমাম আ'যমের ব্যাপারে যখন সমালোচনা ও প্রত্যয়ন উভয়ই রয়েছে, তখন সমালোচনার দিকটিই প্রধান্য পাবে।" এখানে দ্বিতীয় মূলনীতির প্রয়োগ হয়। তা ইমাম খতীব বাগদাদী (রাহ) তাঁর 'আল-কিফায়াহ ফি উসূলিল হাদীসি ওয়ার রিওয়ায়াহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এরূপ ক্ষেত্রে দেখতে হবে, সমালোচকদের সংখ্যা বেশি না প্রত্যয়নকারীদের সংখ্যা অধিক, যেদিকে সংখ্যাধিক্য হবে, সে দিকটাই অবলম্বন করতে হবে। শাফেয়ী মাযহাবের আল্লামা তাজউদ্দীন সুবকী (মৃ.৭৭১ হি), রাহও এ অভিমতই পোষণ করেন। যদি এ কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয় তবে ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর বিশ্বস্ততার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে না। কেননা, ইমাম আ'যম (রাহ)-এর সমালোচনাকারীদের সংখ্যা নিতান্তই হাতেগোনা অল্প কয়েক ব্যক্তি। অর্থাৎ ইমাম নাসায়ী (রাহ), ইমাম বোখারী (রাহ), ইমাম বায়হাকী (রাহ) এবং ইমাম দারাকুতনী (রাহ)। অপর দিকে ইমাম আ'যম আবু হানিফার সূত্রে হাদীস বর্ণনাকরীদের সংখ্যা এতো অধিক যা গণনা করাও সম্ভব নয়। নমুনা স্বরূপ কিছু উক্তি দেখুন,

'জরাহ ও তা'দীল' শাস্ত্রের সর্বপ্রথম আলিম, যিনি হাদীস বর্ণনাকরী ব্যক্তিদের সম্পর্কে সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিক কথা বলেছেন, তিনি হলেন ইমাম শো'বা ইবনে হাজ্জাজ (রাহ)। যিনি 'আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস' (হাদীস শাস্ত্রে বিশ্বাসীদের নেতা) উপাধিতে খ্যাত, সেই মনীষী আবু হানিফা (রাহ) সম্বন্ধে বলেছেন,"আল্লাহর শপথ করে বলছি, তিনি (ইমাম আবু হানিফা) ছিলেন বিশ্বস্ত।"

'জরাহ ও তা'দীল'-এর দ্বিতীয় ইমাম ইয়াহিয়া ইবনে সায়ীদ আল-কাত্তান (রাহ) ছিলেন ইমাম আবু হানিফার ছাত্র। ইমাম যাহাবী (রাহ) ও ইমাম ইবনে আবদুল বার (রাহ) বলেছেন যে, তিনি ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর উক্তি অনুযায়ী ফাতাওয়া দিতেন। তিনি বলেন, "আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমরা ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর সংসর্গ অবলম্বন করেছি এবং তাঁর কাছ থেকে জ্ঞানের কথা শ্রবণ করেছি। আমি যখনই তাঁর দিকে তাকাতাম, তখনই তাঁর চেহারায় দেখতে পেতাম, তিনি প্রবল প্রতাপশালী মহাসম্মানিত আল্লাহকে ভয় করছেন।" তাঁর অন্য একটি বক্তব্য হলো, "তিনি (ইমাম আবু হানিফা) হচ্ছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছা) থেকে এ যাবত যা বর্ণিত হয়েছে, সে সম্বন্ধে মুসলিম জাতির মধ্যকার সর্বাধিক অবগত ব্যক্তি" (কিতাবুত তা'লীম কৃত আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী, রাহ.)।

'জরাহ ও তা'দীল-'এর তৃতীয় ইমাম ইয়াহিয়া ইবনে মঈন, রাহ. (১৫৮-২৩৩ হি) ছিলেন ইমাম ইয়াহিয়া ইবনে সায়ীদ আল-কাত্তান (রাহ)-এর ছাত্র এবং ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিমের উস্তাদ। তিনি ইমাম আবু হানিফা (রাহ) সম্পর্কে বলেন, " তিনি হচ্ছেন বিশ্বস্ত হাদীস সংরক্ষণকারী। নিজের সংরক্ষিত হাদীস থেকেই তিনি বর্ণনা করতেন, কেউ তাঁর সমালোচনা করেছেন বলে আমি শুনি নি"। তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি (ইমাম আ'যম) কি বিশ্বস্ত? এর উক্তরে তিনি বলেন, "হ্যাঁ, তিনি বিশ্বস্ত, তিনি বিশ্বস্ত। মিথ্যা

পরিপন্ন করার চেয়ে অনেক উর্ধ্বের পরহিযগার মানুষ। তিনি এর চেয়ে অধিক সম্মানের অধিকারী"। আল্লামা কারদারীর (রাহ) প্রণীত 'মানাকিবে ইমামিল আযম (রাহ)' নামক গ্রন্থে এরূপই লিখিত রয়েছে।

'জরাহ ও তা'দীল'-এর চতুর্থ বড় ইমাম হযরত আলী ইবনুল মদীনী রাহ. (১৬১-২৩৪হি) ছিলেন ইমাম বোখারী (রাহ)-এর উস্তাদ এবং হাদীস বর্ণনাকারীদের সম্বন্ধে যাচাই-বাছাই ও সমালোচনায় অতীব চরমপন্থী। হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ) 'ফাতহুল বারী'-র ভূমিকায় এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "আবু হানিফা (রাহ) হলেন বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রাহ), ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রাহ), ইমাম হিশাম (রাহ), ইমাম ওকী (রাহ), ইমাম আব্বাদ ইবনে আওয়াম (রাহ) ও ইমাম জাফর ইবনে আওন (রাহ) প্রমুখ। তিনি অতিশয় বিশ্বস্ত। তাঁর মধ্যে দোষের কিছু নেই।" ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রাহ) বলেন, "যদি আল্লাহ আমাকে আবু হানিফা (রাহ) ও সুফিয়ান সাওরী (রাহ) দ্বারা সাহায্য না করতেন, তাহলে আমি সাধারণ মানুষের পর্যায়ে পড়ে থাকতাম।" ইমাম মক্কী ইবনে ইবরাহীম (রাহ)সহ বহু ইমামের বক্তব্য এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মক্কী তো তাঁকে সে সময়ের সবচে' বড় আলিম বলেছেন।

তাছাড়াও ইয়াযিদ ইবনে হারুন (রাহ), সুফিয়ান সাওরী (রাহ), সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, রাহ. (১০৭-১৯৮হি), ইসরাঈল ইবনে ইউনুস (রাহ), ইয়াহিয়া ইবনে আদম (রাহ), ওকী ইবনে জাররা (রাহ), ইমাম শাফেয়ী (রাহ) এবং ফযল ইবনে দাকীন (রাহ) প্রমুখের মত হাদীস শাস্ত্রের ইমামদের উক্তিতেও ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা বর্ণিত হয়েছে। হাদীস শাস্ত্রের সব বড় বড় বিখ্যাত ব্যক্তির বিপরীতে দু'চার ব্যক্তির সমালোচনা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? সুতরাং সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে যদি সিদ্ধান্ত গৃহীহ হয়, তাহলে ইমাম আযমের বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতার দিকটা নিশ্চয়ই ভারী থাকবে।

তৃতীয় মূলনীতি যা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিসদের নীতি বলে সাব্যস্ত হয়ে আছে, তা হলো সমালোচনা যদি সুস্পষ্ট কারণ-ভিত্তিক না হয় তাহলে সর্বদা এ সমালোচনার ওপর "বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতার অভিমত' প্রাধান্য পাবে। বিশ্বস্ততার অভিমত সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট যাই হোক। এ মূলনীতির ভিত্তিতে যদি দেখা হয়, তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর বিরুদ্ধে যতগুলো সমালোচনা রয়েছে, এর সবগুলোই অস্পষ্ট একটিও সুস্পষ্ট নয়। সুতরাং সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নেই। পক্ষান্তরে বিশ্বস্ততার অভিমতের সবগুলোই সুস্পষ্ট। কেননা, তাঁর বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কিত অভিমতগুলোতে তাঁর তাকওয়া, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি বিষয়ের সবই প্রমাণিত করা হয়েছে। বিশেষত যদি বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণের সাথে সাথে সমালোচনার কারণসমূহের প্রতিবাদ করা হয়, তাহলে সেটিই সর্বাধিক অগ্রগণ্য হবে। ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণের জন্য এ ধরনের প্রচুর অভিমত বিদ্যমান রয়েছে। যেমন হাফিয ইবনে আবদুল বার মালেকী (৩৬৮-৪৬৩হি) তাঁর 'আল-ইনতিকাউ ফি ফাযায়িলিস সালাসাতি লি আইম্মাতিল ফোকাহা' নামক

কিতাবে লেখেছেন, " অধিকাংশ ব্যক্তি ইমাম আ'যমের ওপর যে দোষারূপ করেছেন, সেটি হচ্ছে তাঁর যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা অথচ এটি কোন দোষ নয়"।

২। আরেকটি আপত্তি হলো আল্লামা হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী (রাহ) "মীযানুল এতেদাল ফি আসমায়ির রিজাল', গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা (রাহ) সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "কুফার অধিবাসী সাবিতের পুত্র নো'মান হলেন যুক্তিবাদীদের নেতা। তাঁকে ইমাম নাসায়ী, ইবনে আদী, দারাকুতনী (৩০৫-৩৮৫ হি) প্রমুখ দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন"।

এর উত্তর। 'মীযানুল এতেদাল' গ্রন্থে এ বাক্য নিঃসন্দেহেই পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে। এটা গ্রন্থকারের কথা নয়। বরং অন্য কোন ব্যক্তি এটা পাদ-টীকায় লেখে দিয়েছেন, যা পরে মূল পাঠের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে। অথবা কোন লিপিকার অসতকর্তায় বা কেউ জেনে শুনে এটা মূল পাঠের অন্তর্ভূক্ত করে দিয়েছেন। এর প্রমাণাদি এরূপ,

(ক) হাফিয যাহাবী, রাহ. (৬৭৩-৭৪৮হি) 'মীযানুল এতেদাল' গ্রন্থের ভূমিকায় সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, 'আমি এ গ্রন্থে সে সব বড় বড় ইমামের আলোচনা করবো না, যাঁদের অত্যুচ্চ সম্মান-সুখ্যাতি ধারাবাহিকতার সীমায় পৌঁছে গেছে। তাঁদের ব্যাপারে কেউ কোন কথাবার্তা বললেও তাঁদের আলোচনা করা হবে না'। অত্যন্ত সম্মান-সুখ্যাতির কারণে যে সব ইমামের আলোচনা করা হবে না বলে তিনি বলেছেন, তাঁদের উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর নামও উল্লেখ করেছেন। তাহলে এটা আবার কিরূপে সম্ভব হলো যে, তিনি উক্ত কিতাবে ইমাম আ'যম (রাহ)-এর সমালোচনা করেছেন।

(খ) আবার যে সব বড় বড় ইমামের আলোচনা হাফিয যাহাবী (রাহ) 'মীযানুল এতেদাল' কিতাবে করেন নি তাঁদের আলোচনার জন্য তিনি 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' নামক একটি পৃথক গ্রন্থ লেখেছেন। এ কিতাবটিতে ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর শুধু যে আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে তা নয় বরং তাঁর বহু প্রশংসা ও গুণগত বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে আল্লামা হাফিয যাহাবী (রাহ) ইমাম আযমকে 'হুফ্ফাযে হাদীস' নয় বরং 'হুফ্ফাযে হাদীস'-এর উস্তাদ বলে অভিহিত করেছেন।

(গ) হাফিয ইবনে হাজার (রাহ) তাঁর কিতাব 'লিসানুল মীযান' রচনার সময় 'মীযানুল এতেদাল'-এর ওপরই নির্ভর করেছেন। অর্থাৎ যাঁদের উল্লেখ মীযানুল এতেদাল-এ নেই, কয়েকজন ছাড়া তাঁদের আলোচনা 'লিসানুল মীযান' গ্রন্থেও নেই। লিসানুল মীযান গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর আলোচনা নেই। সুতরাং আলোচিত কথাগুলো মূলত 'মীযানুল এতেদাল' গ্রন্থেও ছিল না, যা পরবর্তীতে কেউ বৃদ্ধি করেছে।

(ঘ) সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুহাদ্দিস শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ হালাবী, রাহ. (১৯১৭-১৯৯৭খ্রি) 'আর রাফউওয়াত তাকমীল' নামক কিতাবের ১০১ পৃষ্ঠার পার্শ্বটীকায় লেখেছেন, "আমি সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের 'আল-মাকতাবাতুয যাহেরিয়া' নামক গ্রন্থাগারে 'মীযানুল এতেদাল'-এর একটি কপি দেখেছি (কোড নং ৩৬৮-হাদীস) যা আগাগোড়া হাফিয যাহাবী (রাহ) এর এক ছাত্র আল্লামা শারফুদ্দীন আল-ওয়ানী (রাহ)-এর কলমে লিখিত এবং ইমাম যাহবীর সম্মুখে তাঁর পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে তিনবার পঠিত। সেই কপিতে ইমাম আবু হানিফা (রাহ) এর কোন আলোচনা নেই। এমনিভাবে আমি মরক্কোর রাজধানী রাবাতের বিখ্যাত গ্রন্থাগার 'আল-খাযানুল আমেরা'তে 'মীযানুল এতেদাল'

এর কলমে লেখা একটি কপি (ক্রমিক নং ১৩৯) দেখেছি। এর ওপর হাফিয যাহাবীর বহু শিষ্য গ্রন্থটি তাঁর সামনে মৃত্যুর এক বছর পূর্বে পড়েছিলেন বলে লেখা রয়েছে। এতেও ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর কোন আলোচনা নেই। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, 'মীযানুল এতেদাল' গ্রন্থে এই সমালোচনামূলক বাক্যটি পরবর্তীতে কেউ বাড়িয়ে দিয়েছে, যা মুল কপিতে নেই। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, ইমাম আবু হানিফা (রাহ)কে দুর্বল আখ্যায়িত করার ও তাঁর খুঁত বর্ণনার অভিযোগ থেকে হাফিয যাহাবী (রাহ) সম্পূর্ণ পবিত্র।

তাছাড়া ইমাম যাহাবী (রাহ) এ ধরনের কথা কিভাবেই বা লেখতে পারেন যেখানে তিনি স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর জীবন চরিত্র সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লেখেছেন। সেখানে এই মহান ইমামের অসংখ্য গুণাবলীর কথা অকপটে বর্ণিত হয়েছে। এর পর ইমাম ইবনে আদী (রাহ) সম্পর্কে পূর্বে বলা হয়েছে যে, তিনি প্রথমে ইমাম আ'যমের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি যখন ইমাম তাহাভী (রাহ)-এর ছাত্রত্ব গ্রহণ করেন, তখন ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি তাঁকে নাড়া দেয়। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী ভুলের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইমাম আ'যমের মুসনাদকে বিন্যস্ত করেন। অতএব, ইমাম আ'যমের বিরুদ্ধে তাঁর পূর্ববর্তী উক্তি প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যায় না। ইমাম নাসায়ীর সমালোচনার উত্তর প্রথমে দেয়া হয়েছে।

৩। আর একটি আপত্তি ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ)-এর প্রতি করা হয়ে থাকে যে, তাঁর বর্ণনাগুলো 'সিহাহ সিত্তাহ'এর ছয়টি বিশুদ্ধ গ্রন্থে নেই।

এর জবাব। এটা অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধি-প্রসূত এবং অজ্ঞতাপূর্ণ আপত্তি। ছয়টি হাদীস গ্রন্থের সংকলকগণ তাঁদের গ্রন্থে উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ ইমামের বর্ণনা অন্তর্ভূক্ত না করা সংশ্লিষ্ট ইমামের দুর্বল হওয়া অবশ্যম্ভাবী করে দেয় না। ইমাম বোখারী (রাহ) ইমাম শাফেয়ী (রাহ)-এর কোন বর্ণনাও তাঁর গ্রন্থে নেন নি। এমন কি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহ) যিনি ইমাম বোখারীর উস্তাদ ছিলেন, তিনি বহু কাল তাঁর সংগ লাভ করেছিলেন। সেই ইমাম সাহেবের বর্ণনাও সমগ্র বোখারী শরীফে মাত্র দু'টি স্থান পেয়েছে। তাও একটি হাদীস মুয়াল্লাকরূপে বর্ণিত। অপরটি ইমাম বোখারী (রাহ) কোন এক মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম, রাহ. (২০৪-২৬১হি) সহীহ মুসলিম গ্রন্থে ইমাম বোখারী (রাহ) থেকে কোন বর্ণনা উদ্ধৃত করেন নি। অথচ ইমাম বোখারী ছিলেন ইমাম মুসলিমের উস্তাদ। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহ) ইমাম মালিক (রাহ) থেকে কেবল তিনটি হাদীস তাঁর মুসনাদে গ্রহণ করেছেন। অথচ ইমাম মালিক (রাহ)-এর সনদকে বিশুদ্ধতর সনদ হিসাবে গণ্য করা হয়। এতে কি এ সিদ্ধান্ত নেয়া চলে যে, ইমাম শাফেয়ী (রাহ), ইমাম মালিক (রাহ) ও ইমাম আহমদ (রাহ) তিন জনই দুর্বল? এ বিষয়ে প্রকৃত কথা বলেছেন আল্লামা মুহাম্মদ যাহেদ আল-কাওসারী (রাহ) তাঁর গ্রন্থ 'শুরুতুল আইম্মাতিল খামসা লিল হাযিমী (রাহ)'এর পার্শ্ব-টীকায়। তিনি বলেছেন, 'প্রকৃতপক্ষে হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণের হাদীস সংরক্ষণ করার মাঝে অধিকতর লক্ষ্য ছিল সে সব হাদীসের জন্য যেগুলো বিনষ্ট হওয়ার আশংকা ছিল।

অন্য দিকে ইমাম আবু হানিফা (রাহ), ইমাম মালিক (রাহ), ইমাম শাফেয়ী (রাহ) ও ইমাম আহমদ (রাহ)-এর অনুরূপ মহান ব্যক্তিদের শিষ্য ও অনুসারীদের সংখ্যা এতো অধিক ছিল যে, তাঁদের বর্ণনাগুলো বিনষ্ট হওয়ার আশংকা ছিল না। সে জন্য তাঁরা

সেগুলোর সংরক্ষণে উদ্যোগ গ্রহণের তেমন প্রয়োজন মনে করেন নি। অবশ্য ইমাম আবু হানিফা (রাহ) ও অন্যান্য ইমামদের অসংখ্য ছাত্র ও অনু-ছাত্রের বহু বর্ণনা সিহাহ সিত্তাহর কিতাবসমূহে রয়েছে। তাছাড়া সিহাহ সিত্তাহর সংকলকগণ তো ইমাম আ'যম আবু হানিফ (রাহ)-এর জীবনকালে জন্মগ্রহণই করেন নি। সুতরাং তাঁর ওপর এ আপত্তি মোটেই টিকতে পারে না।

৪। ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর প্রতি সবচে' বড় আপত্তি করা হতো যে, তিনি কোরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনার ওপর কিয়াসকে প্রাধান্য দিতেন।

এর জবাব। এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব কথা। বরং এর বিপরীতে ইমাম আবু হানিফা (রাহ) তো কখনো কখনো বিতর্কিত হাদীসের প্রেক্ষিতেও কিয়াসকে ত্যাগ করেছেন। যেমন অট্টহাসিতে অযু ভঙ্গের মাসয়ালায় তিনি কিয়াসকে পরিহার করেছেন। অথচ এ বিষয়ে হাদীসগুলো বিতর্কিত এবং অন্যান্য ইমামগণ সেগুলো পরিহার করে কিয়াসের ওপর আমল করেছেন।

এ বিষয়ে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ইমাম শায়খ আবদুল ওয়াহহাব শা'রানী (রাহ) তাঁর 'মীযানুল কোবরা' গ্রন্থে একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ লেখেছেন। এর শিরোনাম হলো "ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কিয়াসকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করেন, এ কথা যিনি তাঁর প্রতি সম্পর্কিত করেন তার দুর্বলতা প্রসঙ্গে"। এই পরিচ্ছেদে তিনি লেখেছেন, "জেনে রাখুন, একথা যার মুখ দিয়ে বের হয়েছে, সে ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর প্রতি কঠোর মনোভাবাপন্ন। সে দীনী বিষয়ে হটকারী, কথাবার্তায় অসাবধান এবং আল্লাহতায়ালার বাণী, 'নিঃসন্দেহে শ্রবণ শক্তি, দর্শনশক্তি ও অন্তঃকরণ এ সবের প্রতিটি সম্পর্কে পরকালে জিজ্ঞেস করা হবে' এবং আল্লাহতায়ালার বাণী, 'মানুষ মুখ থেকে যে কথাই বের করুক, তার সন্নিকটে উপস্থিত রয়েছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োজিত দুই পর্যবেক্ষক ফিরিশতা' (সূরা বনি ইসরাঈল-৩৬ এবং সূরা কাফ-১৭,১৮) সম্বন্ধে অসচেতন।" ইমাম আবু জা'ফর শীযামারী (রাহ) ইমাম আবু হানিফা (রাহ) থেকে নিরবচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করেন, "আল্লাহর কছম, যে ব্যক্তি আমাদের সম্বন্ধে বলে, আমরা কোরআন-হাদীসের প্রকাশ্য বক্তব্যের ওপর যুক্তিকে প্রাধান্য দেই, সে মিথ্যা বলে এবং আমাদের ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। নস্ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কিয়াসের কোন প্রয়োজন পড়ে কি?" ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ) প্রায়ই বলতেন, " আমরা একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কিয়াসের আশ্রয় নেই না। আর তা এ জন্য যে, আমরা প্রথমত যে কোন মাসয়ালা সম্পর্কে কোরআন, সুন্নাহ ও সাহাবা কিরামের সিদ্ধান্তের প্রতি নযর দেই। সেখানে কোন প্রমাণ না পেলে শুধু তখনই আমরা কিয়াসের আশ্রয় নেই। অন্যথায় নয়"। অপর বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলতেন, "রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আমাদের নিকট যা বর্ণিত হয়েছে তা নতশিরে মান্য, এতে মতবিরোধ করার কোন অবকাশ নেই। আর তাঁর সাহাবীদের মতামত আমরা বাছাই করে গ্রহণ করবো। তাছাড়া অন্যদের যে অভিমত আমাদের কাছে পৌছেছে, সে সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হলো, তাঁরাও আমাদের মত মানুষ"।

শায়খ শা'রানী (রাহ) আরও বলেন, "হে ভ্রাত, জেনে রাখো, ইমাম আবু হানিফার প্রতি সুধারণা ও আন্তরিকতাবশত আমি তাঁর পক্ষে সাফাই বর্ণনা করি নি যেমন কিছু লোক করে থাকে, বরং আমি কিতাবসমূহে তাঁর বর্ণিত দলীলাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান, পর্যালোচনা ও গবেষণার পরেই তাঁর পক্ষে সাফাই বর্ণনা করছি। ইমাম আবু হানিফার মাযহাবই সর্বপ্রথম সংকলিত মাযহাব এবং তা-ই সর্বশেষ মাযহাব যেমন কিছু দিব্যদৃষ্টির অধিকারী বলেছেন"।

আবু হানিফা (রাহ) সম্পর্কে এ অভিযোগও আনা হয় যে, তিনি যে সব হাদীস দলীল হিসাবে ব্যবহার করেছেন, এর অধিকাংশই দুর্বল।

এটাও একটা মিথ্যা অভিযোগ। এ সম্পর্কে ইমাম শায়খ আবদুল ওয়াহহাব শা'রানী (৮৯৮-৯৭৬ হি) বলেন, ইমাম আবু হানিফা (রাহ)-এর সকল দলীল খুব ভালভাবে পর্যালোচনা করে আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, ইমাম সাহেবের দলীলসমূহের উৎস হচ্ছে কোরআনুল করিম, সহীহ হাদীস, হাসান হাদীস এবং এমন দুর্বল হাদীস যা অন্যভাবে কয়েক পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়ে হাসান হাদীসে পরিণত হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রাহ) কোন দুর্বল হাদীস দলীল হিসাবে ব্যবহার করেন নি।

তাছাড়া হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয়ের বিধানসমূহ স্মরণে রাখলে ইমাম আবু হানিফা (রাহ) ও হানাফী মাযহাব সম্পর্কে উত্থাপিত সকল অভিযোগের উত্তর সহজেই জানা যাবে। ইমাম আ'যম ও ইমামুল মুহাদ্দিসীন ইমাম আবু হানিফা (রাহ) সম্পর্কে গ্রন্থে উল্লেখিত কথাগুলো ও উক্তিসমূহই তাঁর সম্বন্ধে উত্তম ধারণা পোষণ করার জন্য যথেষ্ট।

হযরত আবু হানিফা (রাহ)-এর 'আল-ফিকাহুল আকবার' মূল বক্তব্য

১। তাওহীদের মূল এবং যার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরী তা হলো অনিবার্যভাবে একথা বলা, 'আমি ঈমান এনেছি আল্লাহতে, তাঁর ফিরিশতায়, তাঁর কিতাবে, তাঁর রাসূলে, মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ায়, অদৃষ্টে যার ভালমন্দ সবই আল্লাহ্র তরফ থেকে এবং হিসাব, মীযান, জান্নাত, জাহান্নাম সবই সত্য'।

২। আল্লাহ্ তা'আলা এক, এটা সংখ্যার দিক দিয়ে নয়, বরং এদিক দিয়ে যে, তাঁর কোন শরীক নেই। আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ্, এক অদ্বিতীয়, আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। তিনি তাঁর সৃষ্টির কোন বস্তুর মত নন এবং তাঁর সৃষ্টির কোন বস্তুও তাঁর মত নয়। তিনি অনাদি, তিনি অনন্ত স্বীয় সত্তাগত ও ক্রিয়াগত নাম ও গুণাবলীসহ। তাঁর সত্তাগত গুণ : জীবন, শক্তি, জ্ঞান, কথা, শ্রবণ, দর্শন, ইচ্ছা। আর তাঁর ক্রিয়াগত গুণ : সৃষ্টি করা, আহার্য দান করা, আরম্ভ করা, উদ্ভাবন করা, তৈরি করা, এরূপ অন্যান্য ক্রিয়াগত গুণ।

৩। তিনি অনাদি, তিনি অনন্ত স্বীয় নাম ও গুণসহ। কোন নতুনত্ব নেই তাঁর নামে আর গুণে। তিনি স্বীয় জ্ঞানে সর্বদা জ্ঞানী, আর জ্ঞান তাঁর স্থায়ী গুণ এবং তিনি স্বীয় শক্তিতে শক্তিমান, আর শক্তি তাঁর স্থায়ী গুণ। তিনি স্বীয় বাণীতে ব্যঙময়, আর বাণী তাঁর স্থায়ী গুণ।

তিনি স্রষ্টা স্বীয় সৃষ্টিতে, আর সৃষ্টি তার স্থায়ী গুণ। তিনি কর্তা স্বীয় কর্মে, আর কর্ম তাঁর স্থায়ী গুণ। আল্লাহ তা'আলাই কর্তা এবং তাঁর ক্রিয়া স্থায়ী গুণ। কর্ম হলো সৃষ্ট এবং আল্লাহ তা'আলার ক্রিয়া অবিনশ্বর। আর তাঁর গুণাবলী চিরন্তন, শাশ্বত ও অবিনশ্বর। সুতরাং যে বলে, এসব সৃষ্ট অথবা নশ্বর, অথবা সিদ্ধান্ত প্রকাশে চুপ থাকে, অথবা এতে সন্দেহ পোষণ করে, সে তো অস্বীকার করে আল্লাহ তা'আলাকেই।

৪। আল-কোরআন আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী যা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ, অন্তরে সুরক্ষিত, রসনায় পঠিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ। আল-কোরআনে আমাদের উচ্চারণ সৃষ্ট, এতে আমাদের লেখন সৃষ্ট, এতে আমাদের পঠন সৃষ্ট, কিন্তু আল-কোরআন সৃষ্ট নয়,শাশ্বত। যা কিছু আল্লাহ্ তা'আলা আল-কোরআনে ঘটনা হিসাবে বর্ণনা করেছেন, মুসা ও অন্যান্য আম্বিয়া আলাইহিস সালাত ওয়াস সালাম এবং ফিরআউন ও ইবলীস সম্পর্কে, তা সবই আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী তাদের সংবাদ সম্বলিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী সৃষ্ট নয়, শাশ্বত। মুসা ও অন্যান্য সৃষ্ট জীবের কথা সৃষ্ট, নশ্বর। আল-কোরআন আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী, যা চিরন্তন, কিন্তু তাদের কথা চিরন্তন নয়।

৫। মুসা (আ) আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী শ্রবণ করেছিলেন, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, 'আর কথা বলেছিলেন আল্লাহ্ মুসার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে' (সূরা নিসা-১৬৪)। আল্লাহ্ তা'আলা হলেন শাশ্বত বক্তা। কিন্তু মুসা (আ) কথা বললেন সেরূপ নন। আল্লাহ্ তা'আলা হলেন শাশ্বত স্রষ্টা এবং কোন কিছু তাঁর মত নয় আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। যখন আল্লাহ্ মুসার সঙ্গে কথা বলেছেন তখন স্বীয় বাণী দিয়েই বলেছেন যা তাঁর শাশ্বত গুণ, আর তাঁর যাবতীয় গুণ সৃষ্ট জীবের গুণ থেকে আলাদা। তিনি জানেন তবে আমাদের জানার মত নয়। তিনি শক্তি রাখেন তবে আমাদের শক্তির মত নয়। তিনি দেখেন তবে আমাদের দেখার মত নয়। তিনি শুনেন তবে আমাদের শোনার মত নয়। তিনি কথা বলেন তবে আমাদের কথা বলার মত নয়। কেননা আমরা তো কথা বলি উপকরণ ও বর্ণের সাহায্যে আর আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলেন উপকরণ ও বর্ণ ছাড়া। বর্ণসমূহ সৃষ্ট আর আল্লাহ্ তা'আলার কথা সৃষ্ট নয়।

৬। তিনি বস্তু তবে অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মত নন। আর তাঁর বস্তু হওয়ার অর্থ তাঁর সত্তার নিত্যতার স্বীকৃতি দেয়া যে, তিনি দেহহীন, তিনি মৌল বস্তুও নন এবং পরাশ্রয়ী বস্তুও নন, তাঁর কোন সীমা নেই, তাঁর কোন প্রতিপক্ষ নেই, তাঁর কোন অংশিদার নেই এবং কোন সাদৃশ্যও নেই। তাঁর হাত আছে, চেহারা আছে এবং প্রাণ আছে, যেরূপ আল-কোরআনে আল্লাহ তা'আলা তা বর্ণনা করেছেন, তবে আল্লাহ্ তা'আলা আল-কোরআনে চেহারা, হাত ও প্রাণ সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন তা অবশ্যই তাঁরই গুণাবলী যার ধরন জানা নেই। একথা কখনো বলা যাবে না যে, তাঁর হাত মানে তাঁর শক্তি অথবা তাঁর দান। কেননা এতে রয়েছে গুণের অস্বীকৃতি। আর এটা কাদারিয়া ও মু'তাযিলাদের মতবাদ। বস্তুতঃ তাঁর হাত তাঁরই গুণ যার ধরন ও প্রকৃতি জানা নেই। অনুরূপভাবে তাঁর ক্রোধ এবং তাঁর সন্তুষ্টি তাঁর গুণাবলীর দু'টি গুণ যার ধরন ও প্রকৃতি জানা নেই।

৭। আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন তবে তা কোন বস্তু থেকে নয়। সব বস্তুর অস্তিত্বের পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা সে সম্পর্কে আদিতেই অবহিত ছিলেন।

৮। তিনিই নির্ধারণ করেছেন যাবতীয় বস্তু এবং নির্দেশ করেছেন তা। দুনিয়া ও আখিরাতে কোন কিছুই সংঘটিত হয় না তাঁর ইচ্ছা, তাঁর জ্ঞান, তাঁর সিদ্ধান্ত, তাঁর নির্ধারণ এবং লওহে মাহফুযে তাঁর লেখন ছাড়া। তবে তাঁর এ লেখন সংঘটনের বর্ণনারূপে, নির্দেশরূপে নয়। সিদ্ধান্ত, নির্ধারণ ও ইচ্ছা তাঁর শাশ্বত গুণ, যার প্রকৃতি ও ধরন জানা নেই। আল্লাহতায়ালা অনস্তিত্বময় বস্তুকে অস্তিত্বে না থাকা অবস্থায়ই অনস্তিত্বময় বস্তু হিসাবে জানেন এবং তা অস্তিত্বে আনয়ন করলে কিরূপ হতো তাও তিনি জানেন। আল্লাহ তা'আলা অস্তিত্বে থাকা অবস্থায়ই অস্তিত্বশীল বস্তু হিসাবে জানেন এবং তার বিলুপ্তি কিরূপে হবে তাও তিনি জানেন। যেমন তিনি কোন দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে তার দাঁড়ানো অবস্থায় দণ্ডায়মান হিসাবে জানেন এবং যখন সে উপবেশন করে তখন তাকে উপবিষ্ট হিসাবে জানেন তার উপবেশনের অবস্থায়, এতে তাঁর জ্ঞানে কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না, আর না কোন নতুন জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। কেননা পরিবর্তন ও বিবর্তন হয় সৃষ্টির মাঝে।

৯। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর সৃষ্টিকে ঈমান ও কুফর থেকে মুক্ত অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি তাদের সম্বোধন করেছেন, আদেশ দিয়েছেন তাদের ও নিষেধ করেছেন তাদের। অতঃপর তাদের কেউ কেউ কুফরী করেছে স্বীয় কর্মের দ্বারা, অস্বীকার ও অবাধ্যতার মাধ্যমে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্‌কে এবং তাদের কেউ কেউ ঈমান এনেছে স্বীয় কর্মের দ্বারা, স্বীকৃতির দ্বারা এবং অন্তরের প্রত্যয় দ্বারা, আল্লাহ্ তা'আলার তাওফীকে ও তার প্রতি আল্লাহর মদদে। আদম (আ)-এর পৃষ্ঠ থেকে তাঁর সন্তানদের বের করেছেন, অতি ক্ষুদ্র পিঁপড়ার মত। তাদের দিয়েছেন জ্ঞান, অতঃপর তাদের সম্বোধন করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন ঈমান আনতে আর বারণ করেছেন কুফরী করতে, তখন তারা স্বীকৃতি দিয়েছিল তাঁর রবুবিয়াতের। আর এটা হলো তাদের প্রকৃত ঈমান এবং এই প্রকৃতির ওপরই তারা ভুমিষ্ঠ হয়। কিন্তু যে পরে কুফরী করলো সে তো বদলে দিলো ও পরিবর্তন করে দিলো (তার ঈমান কুফরী দিয়ে)। আর যে ঈমান আনলো এবং সে সত্য প্রমাণ করলো (তার ঈমানের অঙ্গীকার)।

১০। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কাউকে বাধ্য করেন না কুফরী করতে আর না ঈমান আনতে, সে তো স্থির ও স্থায়ী রইলো (তার দীনে) এবং তাদের কাউকে তিনি সৃষ্টি করেন নি মু'মিন হিসাবে আর না কাফির হিসাবে। বরং তাদের সৃষ্টি করেছেন ব্যক্তি হিসাবে। ঈমান এবং কুফর বান্দার কর্ম। যে কুফরী করে তাকে আল্লাহ্ তা'আলা কুফরী করা অবস্থায় কাফির হিসাবে জানেন। পরে যখন সে ঈমান আনে তখন ঈমান আনা অবস্থায় তাকে মু'মিন হিসাবে জানেন, এতে তাঁর জ্ঞান ও তাঁর গুণের কোন পরিবর্তন হয় না।

১১. প্রকৃতপক্ষে বান্দার কার্যাবলী যেমন গতি ও স্থিতি সবই তাদের উপার্জন এবং আল্লাহ তা'আলা সে সবের স্রষ্টা এবং সে সবই সংঘটিত হয় তাঁর ইচ্ছায়, তাঁর জ্ঞানে, তাঁর ফায়সালায় এবং তার নির্ধারণে। যাবতীয় এবাদত আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে, তাঁর ভালবাসায়, তাঁর সন্তুষ্টিতে, তাঁর জ্ঞানে, তাঁর ইচ্ছায়, তাঁর ফয়সালায় ও তাঁর নির্ধারণ অনুযায়ী হয়। আর যাবতীয় পাপ সংঘটিত হয় তাঁর জ্ঞানে, তাঁর ফয়সালায়, তাঁর নির্ধারণ অনুসারে কিন্তু তাঁর ভালবাসায় নয়, তাঁর সন্তুষ্টিতে নয় এবং তাঁর নির্দেশেও নয়।

১২। সব নবী (আ) ছোট বড় পাপ থেকে পবিত্র, যেমন তাঁরা পবিত্র কুফর ও গর্হিত কাজ থেকে। কিন্তু তাঁদের থেকে সংঘটিত হয়েছে ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভুল-ভ্রান্তি।

১৩। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন আল্লাহ্‌র বন্ধু, তাঁর বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁর নবী, তাঁর মনোনীত, তাঁর নির্বাচিত এবং তিনি কখনো মূর্তিপূজা করেন নি আর না তিনি এক পলকের জন্যও আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে শরীক করেছেন। ছোট বা বড় কোন পাপ তিনি কখনো করেন নি।

১৪। নবীদের (আ) পরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), তাঁর পর হযরত ওমর ইবনে আল-খাত্তাব আল ফারূক (রা), তাঁর পর হযরত ওসমান ইবনে আফ্‌ফান যুন্নূরাইন (রা), তাঁর পর হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব আল মুরতাযা (রা)। এঁরা সবাই ছিলেন এবাদতকারী, সত্যের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং সর্বদা অবিচল। এঁদের সবাইকে আমরা ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ্ (ছা)-এর সাহাবীদের কাউকে আমরা উত্তম ছাড়া স্মরণ করি না।

১৫। কোন পাপের কারণে আমরা কোন মুসলিমকে কাফির বলবো না যদিও সে পাপ বড় পাপ হয় (কবিরা গুনাহ), যতক্ষণ না সে তা হালাল মনে করে এবং তাঁর ঈমান নেই একথাও বলবো না বরং তাকে প্রকৃত মু'মিন হিসাবেই নাম দেবো। এবং কোন মু'মিন ব্যক্তি ফাসিক হতে পারে কিন্তু কাফির নয়।

১৬। মোজার ওপর মাসেহ করা সুন্নতে রাসূল দ্বারা প্রমাণিত। রমযান মাসের রাতে তারাবীহ নামাযও অনুরূপ সুন্নত।

১৭। প্রত্যেক নেককার ও বদকার মু'মিনের পেছনে নামায আদায় করা বৈধ। আমরা একথা বলি না যে, মু'মিন ব্যক্তিকে তার পাপ ক্ষতি করে না এবং একথাও বলি না যে, সে দোযখে প্রবেশ করবে না, আর একথাও বলি না যে, সে চিরকাল তথায় থাকবে, যদিও সে হয় একজন ফাসিক আর দুনিয়া থেকে মু'মিন হিসাবে মৃত্যুবরণ করে থাকে। আমরা এ কথাও বলি না যে, আমাদের নেক কাজগুলো গৃহীত এবং আমাদের গুনাহগুলো মার্জনাকৃত, যেমন মুরজিয়ারা বলে থাকে। বরং আমরা বলি, যে কেউ ভাল কাজ করে এর যাবতীয় শর্ত সহকারে, যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ত্রুটিমুক্ত এবং যা কুফরী ও ধর্মচ্যুতি দ্বারা বিনষ্ট হয় নি এবং সে মু'মিন অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তার নেক কাজগুলো বিনষ্ট করবেন না বরং তা তার থেকে কবুল করবেন এবং সেজন্য তাকে প্রতিদান দেবেন।

১৮। শিরিক ও কুফর ছাড়া যেসব পাপ রয়েছে তা থেকে যদি কোন মু'মিন ব্যক্তি মৃত্যুর আগে তওবা না করে থাকে তাহলে তার ব্যাপার আল্লাহ্‌র ইচ্ছার ওপর, তিনি ইচ্ছা করলে তাকে দোযখে শাস্তি দেবেন অথবা মাফ করে দেবেন, তবে তাকে চিরকালের জন্য দোযখের শাস্তি দেবেন না।

১৯। যখন কোন কাজে রিয়া (লোক-দেখানো ভাব) অনুপ্রবেশ করে তখন তা সে কাজের প্রতিফল বিনষ্ট করে দেয় এবং অহঙ্কারও অনুরূপ।

২০। নবীদের মু'জিযা প্রতিষ্ঠিত আর অলীদের কারামত সত্য।

২১। কিন্তু যেসব অলৌকিক ঘটনা আল্লাহ্ তা'আলার দুশমন যেমন ইবলীস, ফিরআউন ও দাজ্জালের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, যা হাদীসে বর্ণিত আছে, সেগুলোকে আমরা মু'জিযা বা কারামত বলবো না, বরং সেসব তাদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য সংঘটিত হয়েছিল এ কথাই বলবো। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দুশমনদের প্রয়োজনসমূহ পূরণ করেন দুনিয়ায় তাদের কুমন্ত্রণার অবকাশের জন্য আর আখিরাতের শাস্তির জন্য। ফলে তারা এতে আরও উদ্ধত হয় এবং কুফরী ও অবাধ্যতায় বেড়ে যায়। এসবই বৈধ ও সম্ভব।

২২। আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করার পূর্বেই স্রষ্টা এবং রিযিক দানের পূর্বেই রিযিকদাতা ছিলেন।

২৩। আখিরাতে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখা যাবে। জান্নাতে মু'মিনরা তাঁকে পরিমাপ-পরিমাণ-তুলনা ছাড়া চাক্ষুষ দেখবেন। তাঁর ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোন দূরত্ব থাকবে না।

২৪। ঈমান হলো প্রকাশ্য স্বীকৃতি ও অন্তরের বিশ্বাস। আসমান ও যমীনের অধিবাসীদের ঈমান মু'মিন হিসাবে বাড়েও না এবং কমেও না।

২৫। তবে প্রত্যয় ও বিশ্বাস হিসাবে তা বাড়ে ও কমে।

২৬। তাওহীদ ও ঈমানের দিক দিয়ে সব মু'মিন সমান তবে আমলের নিরিখে মর্যাদায় তারতম্য হয়।

২৭। ইসলাম হলো আত্মসমর্পণ ও আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের আনুগত্য। তবে আভিধানিক দিক থেকে ঈমান ও ইসলামে পার্থক্য রয়েছে। বস্তুতঃ ঈমান কখনো ইসলাম ছাড়া হয় না এবং ইসলামও ঈমান ছাড়া পাওয়া যায় না। এ উভয়ের তুলনা যেন পিঠ ও পেট।

২৮। আর 'দীন' হলো ঈমান, ইসলাম ও যাবতীয় শরীয়তের সমন্বিত নাম।

২৯। যাবতীয় গুণাবলীসহ আল্লাহ্ তা'আলা যেভাবে নিজেকে স্বীয় কিতাবে বর্ণনা করেছেন আমরা তাঁকে ঠিক সেভাবেই জানি। আল্লাহ তা'আলা যেরূপ এবাদতের অধিকারী কোন বান্দাই সেরূপ এবাদত করার শক্তি রাখে না, তবে যেভাবে এবাদত করার জন্য আল্লাহ্‌র কিতাবে ও রাসূলের সুন্নাতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেভাবেই তাঁর এবাদত করে।

৩০। মু'মিনরা সবাই জানায়, প্রত্যয়ে, ভরসায়, ভালবাসায়, সন্তুষ্টিতে, ভয়ে, আশায় এবং ঈমানে সমান। তবে ঈমান ছাড়া বাকি সবগুলোতে বিভিন্ন হয়ে থাকে।

৩১। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ ও ন্যায়বিচারক। তাই কখনো তিনি অনুগ্রহ করে তাঁর বান্দাকে তার প্রাপ্যের চেয়ে অধিক ছওয়াব প্রদান করে থাকেন। আবার কখনো গুনাহর দরুণ ন্যায়বিচারের জন্য তাকে শাস্তি দেন এবং কখনো দয়া পরবশে তাকে মাফ করে দেন।

৩২। নবীদের (আ) শাফায়াত সত্য। গুনাহগার মু'মিন বিশেষ করে তাদের মাঝে যারা কবিরা গুনাহ করার জন্য শাস্তির হকদার হয়েছে, তাদের জন্য আমাদের নবী (ছা)-এর শাফায়াত প্রতিষ্ঠিত সত্য।

৩৩। কিয়ামতের দিন মীযানে আমলের ওজন করা সত্য।

৩৪। নবী (ছা)-এর হাওযে কাওসারও সত্য।

৩৫। কিয়ামতের দিন বাদী-বিবাদীদের মধ্যে নেক আমলের বদলা ও ফয়সালা সত্য। তবে যদি নেক আমল না থাকে তাহলে তাদের ওপর বদ-আমল চাপিয়ে দেয়া সত্য ও সংগত।

৩৬। জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে সৃষ্ট, কখনো তা লয় হবে না। আয়তলোচনা জান্নাতের হুরকুল কখনো মরবে না। আর কখনো বিলীন হবে না আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি আর তাঁর প্রতিদান হচ্ছে চিরায়ত।

৩৭। যাকে ইচ্ছা আল্লাহ্ তা'আলা সঠিক পথে পরিচালনা করেন, এ তাঁর অনুগ্রহ এবং যাকে চান বিপথগামী করেন, এ তাঁর ইনসাফ। বিপথগামী করার প্রকৃত অর্থ কাউকে পরিত্যাগ করা। আর পরিত্যাগ করার মর্মার্থ হলো, যে কাজ করলে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন বান্দাকে সে কাজ করার তওফীক না দেয়া। এ হলো তাঁর ইনসাফ। এভাবে পরিত্যাক্ত ব্যক্তিকে গুনাহর দরুণ শাস্তি প্রদান করাও তাঁর ইনসাফ।

৩৮। এ কথা বলা আমাদের জন্য বৈধ নয় যে, বল প্রয়োগ করে জোর-পূর্বক শয়তান বান্দার ঈমান ছিনিয়ে নেয়। বরং আমরা এ কথা বলতে পারি যে, বান্দা ঈমান পরিত্যাগ করে আর তখন শয়তান তা নিয়ে নেয়।

৩৯। কবরে মুনকির ও নাকিরের প্রশ্ন প্রতিষ্ঠিত সত্য। কবরে বান্দার দেহের মধ্যে আত্মার প্রত্যাবর্তন সত্য। সব কাফির ও কিছু গুনাহগার মু'মিনের ওপর কবরের সংকোচন ও এর আযাব সত্য।

৪০। মহিমান্বিত মহান আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী সম্পর্কে পন্ডিতরা ফারসী ভাষায় যেসব বর্ণনা দিয়েছেন তা বৈধ, কেবল 'আল্লাহর হাত' এর ফারসী অনুবাদ ছাড়া। তুলনা ও উপমা ছাড়া একথাও বলা যাবে : 'মহামর্যাদাশীল ও মহাপ্রতাপশালী খোদার ওয়াস্তে'। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও তাঁর দূরত্ব দীর্ঘত্ব বা হ্রাস্বত্ব পরিমাণের নিরিখে নয়। বরং তা হলো মর্যাদা ও অমর্যাদার নিরিখে অনুগত ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকটবর্তী কোন বিশ্লেষণ ছাড়া। আর গুনাহগার ব্যক্তি আল্লাহ্ থেকে দূরে কোন বিশ্লেষণ ছাড়া। নৈকট্য, দূরত্ব ও অগ্রগামিতা বিনীত প্রার্থনাকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এভাবেই জান্নাতে আল্লাহর পাশে ও তাঁর সম্মুখে অবস্থান এসবই বিশ্লেষণ ছাড়া।

৪১। আল-কোরআন রাসূল (ছা)-এর ওপর নাযিল হয়েছে এবং মাসহাফে লিপিবদ্ধ। কোরআনের আয়াতসমূহ আল্লাহ্র কালামের অর্থে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বে সমান। তবে এর কিছুর রয়েছে বর্ণনা ও বর্ণিতের মর্যাদা, যেমন আয়াতুল কুরছি। কেননা এতে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার মহিমা, শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলী। সুতরাং এতে সন্নিবেশিত হয়েছে দু'টো মর্যাদা, বর্ণনার মর্যাদা এবং বর্ণিতের মর্যাদা। এবং কিছু আয়াতে রয়েছে শুধু বর্ণনার মর্যাদা, যেমন কাফিরদের কাহিনী। এতে বর্ণিতের কোন মর্যাদা নেই, কারণ তারা হলো কাফির।

৪২। অনুরূপ মহান আল্লাহ্র নামসমূহ ও গুণসমূহ সম্মানে ও মর্যাদায় সমান, কোন পার্থক্য নেই এতে।

৪৩। আবু তালিব, রাসূলুল্লাহ্ (ছা)-এর চাচা এবং আলী (রা)-এর পিতা কাফির অবস্থায় মারা যান।

৪৪। কাসেম, তাহের ও ইবরাহীম রাসূলুল্লাহ্ (ছা)-এর পুত্র। ফাতেমা, রুকাইয়া, যয়নাব ও উম্মু কুলসুম তাঁর কন্যা। আল্লাহ্ এঁদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

৪৫। যখনই কোন মানুষের মনে তওহীদের জ্ঞান সম্পন্ন কোন প্রশ্নের উদ্রেক হয় তখনই তার উচিত তাৎক্ষণিকভাবে দৃঢ় প্রত্যয় স্থাপন করা যা আল্লাহ্র কাছে সত্য তার ওপর, যতক্ষণ না সে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির সন্ধান পায়, যার কাছে সে সত্য জেনে নেবে। এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে দেরী করার অবকাশ নেই। এ ব্যাপারে চুপ করে বসে থাকা কৈফিয়ত নয়। যদি চুপ করে বসে থাকে তাহলে সে কাফির হবে।

৪৬। মি'রাজের সংবাদ সত্য। যে এটা অস্বীকার করে সে তো বিদ'আতী ও বিপথগামী।

৪৭। দাজ্জালের আবির্ভাব এবং ইয়াজুজ ও মা'জুজের আগমন, পশ্চিমে সূর্যোদয়, আসমান থেকে ঈসা (আ)-এর অবতরণ এবং কিয়ামতের অন্যান্য আলামত, যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তা সবই যথার্থ সত্য।

৪৮। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা করেন সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

(এই ফিকাহ নির্ভুলভাবে বোঝার জন্য এর ব্যাখ্যা বা শরাহ গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে হবে। এর অনেক ব্যাখ্যা-গ্রন্থের মধ্যে মোল্লা আলী কারী (রাহ)-এর লিখিত শরাহটি উত্তম)।

তথ্য সূত্র,

১. আল-ফিকহুল আকবার (২০০৬) মুল, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)।
ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত।
প্রকাশক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

২. মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ (২০০৩)। অনুবাদ, মাওলানা মুহাম্মদ মুসা,
প্রকাশক, আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা।

৩. ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন (২০০৪)।
লেখক মন্ডলী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

৪. কাশফুল বারী শারহুল বুখারী, ১ম খন্ড, (২০০৩)।
মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ইদরীছ কাছেমী।
প্রকাশক, ইদরিছীয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, মিরপুর, ঢাকা-১২২১।

৫. ইসলামী শরীয়াহ ও সুন্নাহ (২০০৭)।
মূল, ড. মুসতফা হুসনী আস-সুবায়ী (১৯১৫-৬৪)।
অনুবাদ, এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম.
প্রকাশক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১০০০।

৬. ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) তৃতীয় সংস্করণ (২০০৭)।
কৃত এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম।
প্রকাশক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

৭. ইমাম আবু হানিফা (রাহ)। (১৯৭০), ঢাকা-১০০০।

মূল, সাইয়েদ মানাযির আহসান গিলানী (মৃ. ১৯৩৬)।
অনুবাদে মাওলানা আবদুল জলিল। প্রকাশক, সোসাইটি ফর পাকিস্তান।

৮. সীরাতে নু'মান (২০০৫)। মূল, আল্লামা শিবলী নো'মানী (রাহ)। অনুবাদ, মাওলানা আবদুল জব্বার সিদ্দিকী। মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা-১১০০।
৯. ইমামুল মুহাদ্দিছীন ইমাম আবু হানিফা (রাহ) ১ম সংস্করণ, (১৪২৭ হি)। মূল. মাওলানা হাকিম আফসার বাশাহ। অনুবাদ, মাওলানা যায়েদ সালীমুল্লাহ। নাদিয়াতুল কুরআন। প্রকাশনী। ঢাকা- ১২১১।
১০. তারীখে ইলমে ফিকাহ (অনূদিত)
মূল, আল্লামা মুফতি সাইয়েদ মুহাম্মদ আমিমুল ইহসান মুজাদ্দেদী (রাহ)।
১১. তারীখে ইলমে হাদীস (২০০০)।
মূল. আল্লামা মুফতি সাইয়েদ মুহাম্মদ আমিমুল ইহসান মুজাদ্দেদী (রাহ)।
অনুবাদে মাওলানা লোকমান আহমদ আমীমী।
প্রকাশক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
১২. হাদীস সংকলনের ইতিহাস (১৯৭০)।
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (১৯১৮-৮৭)।
প্রকাশক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
১৩. ইমাম তাহাভী (র) ঃ জীবন ও কর্ম (১৯৯৮)। ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
১৪. ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান (১৯৯৩)
কৃত ডক্টর মোহাম্মদ এছহাক (১৯১৩-২০০৮)।
অনুবাদে হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া।
প্রকাশক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
১৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ও তাঁর ফিকাহ (১৯৮৮)।
মূল, ড. হানাফী রাযী। অনুবাদ, আবুল বাশার, মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।
প্রকাশক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
১৬. আল-আকীদাতুল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল ইমাম মাতুরীদী (১৯৮৩)। কৃত ড. এ.কে.এম. আইউব আলী (১৯১৯-৯৫)। প্রকাশক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
১৭. তাবে'ঈদের জীবনকথা (তৃতীয় খন্ড-২০০৮)। কৃত ড. আবদুল মাবুদ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কাঁটাবন, ঢাকা।

লেখকের প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকার তালিকা

- মুসলিম ও মুসলিম বিশ্ব (১৯৭০)। প্রকাশক, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, ঢাকা।
- কাদিয়ানী ধর্মমত ঃ একটি পর্যালোচনা (১৯৮৫)। তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা।
- একটি পুণ্যময় জীবন (আল্লামা মুফতী সাইয়েদ মোহাম্মদ আমিমুল এহসান মুজাদ্দেদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এর জীবনী ও প্রাসঙ্গিক বিষয়। ১৯৮৮)।
- কাদিয়ানী ধর্মমত ঃ স্বরূপ ও পর্যালোচনা (১৯৮৯)। তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা।
- বাহাই ঃ একটি ভ্রান্ত ধর্ম (সম্পা. ১৯৯০)। প্রকাশক, তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা।
- পরধর্মগ্রন্থে সর্বশেষ নবী (সা) (১৯৯১)। প্রকাশক, তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা। (বর্ধিত ও মার্জিত সংস্করণ-১৯৯৭। প্রকাশক, মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা)।
- পুথি সাহিত্যে মহানবী (সা) (১৯৯২)। তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা-১২১৬।
- কাদিয়ানীরা অমুসলিম ঃ বিশ্ব-মুসলিমের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত (১৯৯৩)।
- ইমাম মাহদী পরিচিতি (১৯৯৪)। (পরিমার্জিত শুভ্র সংস্করণ-১৯৯৯)। (প্রেক্ষিত- কাদিয়ানী ধর্মমত)। প্রকাশক, তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা ১২১৬।
- হজ্বের ত্রুটিসমূহ (১৯৯৫)। প্রকাশক, তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা ১২১৬। (পরবর্তীতে বর্ধিত সংস্করণ "পবিত্র হজ্বের নিয়ম" নামে ২০০২ সালে প্রকাশিত)।
- শিশু সাহিত্যে সর্বশেষ রসূল (সা) (১৯৯৬)। তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা।
- সাহাবাদের (রা) কাব্যচর্চা (১৯৯৭)। তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা ১২১৬। (দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশক, মদীনা পাবলিকেশান্স, বাংলাবাজার, ঢাকা)।
- বাংলাভাষায় সীরাত চর্চা (১৯৯৮)। তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা ১২১৬। (বাংলাভাষায় সীরাত সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ)।
- কাদিয়ানী ধর্মমত বনাম ইসলামী দুনিয়ার অবস্থান (১৯৯৮)। তাওহীদ প্রকাশনী।
- রাসূলুল্লাহর (সা) এবাদত, দোয়া ও মোনাজাত (সম্পা.২০০০)। প্রকাশক, জাতীয় সীরাত গবেষণা ও প্রচার সংস্থা, ঢাকা-১০০০। পরবর্তী সংস্করণগুলোর প্রকাশক, মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা-১১০০।
- রাসূলুল্লাহর (সা) মি'রাজ ঃ তত্ত্ব ও রহস্য (সম্পা. ২০০১), তাওহীদ প্রকাশনী।
- হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম (২০০২)। তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা-১২১৬। (প্রেক্ষিত, কাদিয়ানী ধর্মমত)
- সহীহ মুসলিম (অখন্ড সংস্করণ) (সংকলন; যৌথ সম্পা. ২০০৩)। প্রকাশিকা, মিসেস গুলশান আরা বেগম, ১০/এ, ৩/৭ মিরপুর,ঢাকা-১২২১। দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশক, জাতীয় সীরাত গবেষণা ও প্রচার সংস্থা, ঢাকা-১০০০।
- বহুমাত্রিক চল্লিশ হাদীস ও প্রসঙ্গ কথা (২০০৪)। তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা।
- মুফতি সাইয়েদ মোহাম্মদ আমিমুল এহসান (র), (২০০৪)। প্রকাশক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১০০০।
- সর্বশেষ নবীর আনুগত্য ও অনুসরন, (২০০৫)। তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা

- ☞ Qadiani Religion (An Analytical View), 2005. (A Memo. presented to the members of the 8th Jatiya Sangsad in 2005-2006). Tauhid Prakashani, Dhaka-1216. (Revised edition printed in 2006 in the shape of a Booklet).
- ☞ হৃদিপদ্ম (প্রবন্ধ সঞ্চয়ন), ২০০৬। প্রকাশক, তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা-১২১৬।
- ☞ হাদীসে রাসূল (সা) ও কাদিয়ানী আকিদা (২০০৭)। তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা।
- ☞ পূর্ববর্তী বুযর্গানে দ্বীনের দৃষ্টিতেও নবুওয়ত শেষ (২০০৭)। তাওহীদ প্রকাশনী।
- ☞ লা-তাক্বনাতু মির রাহমাতিল্লাহ (২০০৮)। তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা। ২০০৯ সালে মদীনা পাবলিকেশান্স কর্তৃক দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। (গ্রন্থে আল্লাহর মাগফিরাত, রহমত ও জান্নাত পাওয়ার উপায় বর্ণিত হয়েছে)।
- ☞ জীবনী সাহিত্য নির্মাণে 'মাসিক মদীনা'র অবদান (১৯৬১-২০০৮), ২০০৯ সালে তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।
- ☞ আল-বাক্বিয়াতুস সালিহাত (২০০৯)। প্রকাশক, তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা-১২১৬।
- ☞ কাদিয়ানী ধর্মমত (সার্বিক আলোকপাত)। (২০০৯)। প্রকাশক, মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা-১১০০।

প্রকাশিতব্য, (ক) মুফতীয়ে আ'যম দা'য়ী ইলাল্লাহ
(খ) 'আইনুন জারিয়া'।

ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রাহ)-এর কয়েকটি উপদেশ

১। বাজারে অনর্থক ঘোরাঘুরি করা, দোকানে বসে আড্ডা দেয়া এবং হেঁটে হেঁটে বা মসজিদে বসে কিছু পানাহার করা থেকে বিরত থাকবে।

২। যে কোন কাজ করতে গিয়ে ধীরে-সুস্থে এবং ভাব-গাম্ভীর্য বজায় রেখে করবে।

৩। সর্বাবস্থাতেই তোমার আচরণ এরূপ হওয়া উচিত যেন কারও প্রতি মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ না পায়। দারিদ্রে পতিত ব্যক্তির জন্যও এটা প্রযোজ্য।

৪। কোরআন তেলাওয়াত যেন কোন এক দিনও কাযা না হয়।

৫। কেবল দুনিয়ার ধান্দায় নিমগ্ন থেকো না। কোন কোন সময় কবরস্থানে হাজিরা দিয়ো।

৬। একেবারে অপারগ না হলে অন্যদের নামাযে ইমামতি করতে যেয়ো না।